বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

য় ভাগ]   পৌষ, ১৩০৭   [৩য় সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে,
বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে,
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ক মূল্য ১৲ টাকা।   এই সংখ্যার মূল্য ৶৹ আনা।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ]　　　　পৌষ।　　　　[৩য় সংখ্যা।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

৭। ঘনশ্যাম মিত্র।

মিত্র কুলে জন্ম মোর গোমতিতে বাস।
ঘনশ্যাম নাম ধরি শ্রীকরণের দাস॥
নিরাবিলের প্রাণ আমি ভঙ্গ কুলের ঐরি।
শ্রীকরণের করণকারণ তুল্য মূল্য করি॥

ঘনশ্যাম মিত্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া কুল বন্ধন করেন। যথা, সিংহের কুলীনঘর কান্দী, বেলে, জমুয়া; ঘোষের পাঁচথুপী, ঘজান, রসোড়া; মিত্রের বেলুন ইত্যাদি। ঘনশ্যামের পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের ঘটকের কর্ম্ম, কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী শুড্ডো নামক গ্রামের ব্রাহ্মণেরা করিতেন। প্রবাদ এই যে, উপরি উদ্ধৃত পরিচয় সূচক শ্লোক দুইটি ঘনশ্যামের রচনা।

পরিচয়—সিউড়ীর ছয় ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত গোমতি (গুমুতো) নামক গ্রামে ঘনশ্যমের আবাস ভূমি ছিল। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। কয়েকটি কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যার সহিত, কান্দীর নিকট বেলে নামক গ্রামের রাজারাম সিংহের বিবাহ হয়। এই রাজারাম সিংহের পুত্র শুকদেব সিংহ ঘটক, যশোহর জেলার অন্তর্গত পুরাপাড়া গ্রামের ঘটক বংশের পূর্ব্ব পুরুষ। এই ঘটকদিগের নিকট যে কুলজী গ্রন্থ আছে তাহাতে

ঘনশ্যাম ও শুকদেব উভয়েরই ভনিতা আছে। * ঘনশ্যামের বংশতালিকা, যথা—

উদয়কৃষ্ণ মিত্র
|
রামকৃষ্ণ মিত্র
|
ঘনশ্যাম মিত্র
|
কন্যা—রাজারাম সিংহ | শ্যামাদাসী
|
শুকদেব সিংহ
|
রাধাকৃষ্ণ সিংহ
|
গোবিন্দ চন্দ্র সিংহ
|
পঞ্চানন সিংহ
|
শ্রীবামনহরি সিংহ †

প্রবাদঃ—মাড়কলা গ্রামের কেনারাম দাস ও মোনারাম দাস লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতদুপক্ষে যে সমারোহ ‡ হইয়াছিল, তাহাতে ঘনশ্যামও উপস্থিত ছিলেন। ভোজনের সময় স্বশ্রেণীবর্গের মধ্যে কেহ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 'গোমতির মিত্র' বলিয়া চরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি বলেন, 'আমরা কি 'গু-মুত' ('গোমতির' অপভ্রংশ গুম্‌তো) লইয়া আহার করিতে আসিয়াছি'? এই রহস্যময় হুজুগে যোগদান করিবার লোকের অভাব হইল না এবং তজ্জন্য ঘণশ্যামকে বিশেষ বিড়ম্বিত হইতে হইল। যজানের উচিৎখাঁ উপাধিধারী গৌরীকান্ত ঘোষ এবং অপরাপর গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্বশ্রেণী কায়স্থ লইয়া একত্র ভোজন করা দোষাবহ নহে, একথা কোন ক্রমেই বুঝাইতে না পারিয়া, অগত্যা ঘনশ্যামকে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ঘনশ্যাম বলিলেন যে, যাঁহারা তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন তাঁহারা না কহিলে তিনি গাত্রোত্থান করিতে

---

* আমার নিকট কায়স্থদিগের কুলজীনামক একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত পু (খণ্ডিত) আছে, তাহাতে 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভসুত শ্যামদাসের' ভণিতা আছে।

† ইনিই অনুগ্রহ করিয়া আমার বংশতালিকাটী প্রদান করিয়াছেন।

‡ এই সমারোহ উপলক্ষে রচিত একটি সুদীর্ঘ 'ছড়া' এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

লেখক।

প্রস্তুত নহেন। অনন্যোপায় হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ সানুনয়ে তাঁহাকে বলিলেন "আপনার জন্য যখন এতগুলি 'স্বশ্রেণীর' আহার বন্ধ হয়, তখন অনুগ্রহ করিয়া আপনি স্বতন্ত্র স্থানে আপনার আহারের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু তিনি আর আহার না করিয়া 'আমার পরিতোষ হইয়াছে' এই বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন এবং এই প্রকারে উপেক্ষিত হইয়া কায়স্থদিগের কুলবন্ধনে প্রতিজ্ঞা করেন। অবশেষে শ্রীশ্রী৺ বৈদ্যনাথ ধামে কঠোর 'ধর্ম্না' দিয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলাচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হইবার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনেক স্বশ্রেণীবর্গের মনোহানি হইবে বলিয়া তাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহার কন্যার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হইবে। কান্দীর নিকট বেলে গ্রামের রাজারাম সিংহের পিতাকেও স্বীয় পুত্রের সহিত ঘনশ্যামের কন্যার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যও স্বপ্নাদেশ হয়। এই রাজারাম সিংহের পুত্র ও ঘনশ্যাম মিত্রের দৌহিত্র শুকদেব সিংহ ঘটক, বর্ত্তমান ঘটকদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বংশধরেরা এখনও ঘটকের ব্যবসা রক্ষা করিতেছে।

একটা কথা আছে।

থুঁচি নাই যাতে
কুল নাই তাতে।

অর্থাৎ যে কুলে ঘনশ্যাম হস্তক্ষেপ করেন নাই কিম্বা যে কুলের কোন উল্লেখ করেন নাই, তাহা কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যে গণ্যই নহে। এই সদর্প উক্তিতে ঘনশ্যামের, উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলবন্ধন কার্য্যে কতদূর প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামসুন্দর তর্কালঙ্কার।

~~পরিচয়ঃ~~—মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত দুনোবহড়া নামক পল্লীতে রামসুন্দর তর্কালঙ্কার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ~~স্বীয় প্রতিভাবলে~~ তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত ও বৈয়াকরণিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ~~কবিত্বশক্তি তাঁহার এত প্রবল ছিল~~ যে, তিনি যখন যে ছন্দ শ্রবণ করিতেন, ঠিক সেই ছন্দের অনুরূপ শ্লোকে

তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

বাল্যাবস্থায়, রামসুন্দর মুর্শীদাবাদের বাণীকণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ এবং লাভপুরের অন্তর্গত কোতল ঘোষা গ্রাম নিবাসী হরগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে নবদ্বীপে গিয়া পাঠ সমাপন করেন।

রামসুন্দর সর্ব্বকেশী ছিলেন এবং গৈরিক বসন পরিধান করিতেন। তিনি বীরাচারী শাক্ত ছিলেন, খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। তাঁহার একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করা অভ্যাস ছিল না; সন্ন্যাসীর মত কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন এবং তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও যথেষ্ট ছিল। কোন তোষামোদপ্রিয় ধনী ব্যক্তিকে তিনি নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়। রামসুন্দর ধনীব্যক্তির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া কহিলেন 'তুই আমার ভাই, সেই জন্য তোকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম—তুই লক্ষ্মীর বড় বেটা, আর আমি স্বরস্বতীর বড় বেটা।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তোষামোদপ্রিয় ধনী দ্রব হইয়া গেল।

~~প্রবাদ~~— রামসুন্দর অনেক বড় বড় পণ্ডিত সভায় জয় লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ~~এস্থলে~~ দুইটি মাত্র সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

(১) সোনারন্দীর রাজা রায়দানীশের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, তাঁহার চারি পুত্র কর্ত্তৃক বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইলে, এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। রুক্মিণীকান্ত সোনারন্দী রাজার সভাপণ্ডিত, ~~সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার প্রতিপত্তি অল্প নহে।~~ মুর্শীদাবাদে কোন সভায় ~~পূর্ব্বোক্ত~~ বাণী কণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ সভাপতি ছিলেন; বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে রুক্মিণীকান্ত তাঁহার উপর কিঞ্চিৎ রুষ্ট হন। এক্ষণ তিনি সুবিধা পাইয়া বাণীকণ্ঠকে অপদস্থ করিবার জন্য সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত একপক্ষ হইয়া তাহার সহিত বিচার করিবার জন্য চক্রান্ত করিলেন। বাণীকণ্ঠ অগ্রেই চক্রান্তের কথা জানিতে পারিয়া সভায় যাইতে অসম্মত হইলে, ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপন্ন ও ন্যায় শাস্ত্রে পারদর্শী কোন শিষ্য কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া কুণ্ঠিতভাবে, স্থলে আগমন করেন। বাণী~~কণ্ঠ স্বভাবতঃ অতিপ্রিয়ংবদ ছিলেন~~

সুন্দর, এই সময় কাটোয়ার সন্নিহিত কোন গ্রামে সন্ন্যাসী ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি এই চক্রান্তের কথা শ্রবণ করিয়া বিচারের সময়, সন্ন্যাসী বেশে সভাপ্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাণীকণ্ঠ অতিথি দর্শনে পাদবন্দনা জন্য তাহার নিকটস্থ হন; কারণ তিনি এ প্রকার বেশে স্বীয় শিষ্য রামসুন্দরকে চিনিতে পারেন নাই। রামসুন্দর বাহ্যতঃ কোন কথা প্রকাশ না করিয়া প্রতিপ্রণামের ছলে স্বকীয় পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার সহিত বিচারে যোগদান করিবার কথা বিজ্ঞাপিত করেম। রাজ-কুমার চতুষ্টয়কে অনুরোধের পর স্থিরীকৃত হইল যে বাণীকণ্ঠকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে যেন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হয়; তিনি অসমর্থ হইলে পর বাণীকণ্ঠকে প্রশ্ন করা হইবে। তদনুসারেই বিচার আরম্ভ হইল। দ্রাবীড়, পুনা, কাশী, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের কূট প্রশ্নের উত্তর রামসুন্দর অবলীলা ক্রমে সমাধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে বিচারে রামসুন্দর পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিলেন, সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে বাণীকণ্ঠ রামসুন্দরের হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজপুত্র চতুষ্টয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে আপন শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং ~~সমক্ষে~~ সভামণ্ডপে তারস্বরে এই কথা বলিলেন "যদি অনুমতি দেন তবে ~~এ সকল পণ্ডিত কি~~, রামসুন্দরকে লইয়া স্বর্গের বৃহস্পতির সহিত বিচার করিয়া আসিতে পারি!"

(২) বর্ত্তমান হেতমপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের পিতামহ বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া উপলক্ষে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের সমাগম হয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই সভায় সাংখ্যের বিচার হয়। রামসুন্দর ও তারানাথ এই সভার বিচারে যথা ক্রমে অধ্যক্ষ ও মধ্যস্থ বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র হইয়া রামসুন্দরের সহিত সাংখ্যের বিচার আরম্ভ করেন—তাঁহারা এই বিচারের জন্য বিশেষরূপ প্রস্তুতও হইয়া আসিয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ আপনাপন মত প্রবল করিবার জন্য প্রতিপোষক স্বরূপ নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণের অবতারণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামসুন্দর স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে তদনুরূপ ছন্দে (যথায় তিনি পুস্তক হইতে প্রমাণোদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইতেছিলেন) শ্লোক সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া কোন

অজ্ঞাত পুস্তকের ধ্বনি দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিচারে তিনিই জয়লাভ করিয়াছিলেন।

রাম সুন্দর ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; নৈষধ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং ন্যায়-কাব্য বলিয়া নৈষধ কাব্য তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সেই সময় নৈষধের এক টীকা প্রণয়ন করেন। এই সভার তৃতীয় অধিবেশনে প্রেমচাঁদ স্বরচিত টীকা অনুমোদন করাইবার জন্য রামসুন্দরের নিকট উপস্থিত করেন।

প্রেমচাঁদ তখন কলেজে চাকুরী করিতেন; এই জন্য দ্বিতীয় অবসরের প্রতীক্ষা না করিয়া রাম সুন্দরকে উক্ত টীকা দেখাইয়া লইবার জন্য বাসনা করিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে রামসুন্দরের সমকক্ষ ন্যায় ও শব্দ এই উভয় শাস্ত্রে সমভাবে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত দুর্লভ ছিল। নৈষধের টীকার বিচারে 'চৈতাননং কাময়তে' ইত্যাদি শ্লোকের টীকার কাব্য লইয়া তর্ক হয় এবং রামসুন্দর টীকা ভ্রমপূর্ণ বলিলে তৎকালে প্রেমচাঁদ যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ রামসুন্দর পূর্ব্বাবধি তাহাকে তরুণ বয়স্ক যুবক বলিয়া নৈষধের টীকা করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইলেও প্রেমচাঁদ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিপ্রচরণের পুত্র, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে স্নানাহারের জন্য আহ্বান করিলে, তিনি রামসুন্দরের সহিত পুনরায় দেখা না করিয়া উঠিবেন না, এই কথা বলিলেন; কারণ তাহা হইলে তাঁহার টীকার মান রহিবে না। বিশেষতঃ তিনি ভ্রান্ত নহেন, কেবলমাত্র সময়দোষে যথাযথ উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। পরে, রামসুন্দর আসিয়া বলিলেন, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তোমাকে জানিতে অবসর দিই নাই। এরূপ তরুণ বয়সে প্রেমচাঁদের শব্দ ও ন্যায় শাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপত্তি দর্শন করিয়া রামসুন্দর তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এবং ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করতঃ সমধিক সম্মানিত করিলেন।

প্রবাদ আছে, তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য বলে, শুভঙ্করের আর্য্যা "কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিখ্যে" ইত্যাদি শ্লোকের "ক্রূরা ক্রূরা ক্রূরা নিন্যে, কার্য্যায়াং ক্রূরা কার্য্যায়াং নিন্যে" এই ভাবে, কৃষ্ণকে অক্রূর লইয়া গিয়াছিলেন এইরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন।

মহেশপুর রাজবাটী হইতে তিনি নিয়মিতরূপ বৃত্তি পাইতেন। এই বৃত্তি পাইবার একটি গল্প প্রচলিত আছে। রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের বাল্যকালে সাজ্ঘা

তিক পীড়া হইলে অনেক পণ্ডিত যথারীতি যাগযজ্ঞাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য আহূত হন। রামসুন্দরও এই উপলক্ষে মহেশপুরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অপরাপর পণ্ডিতদিগের ন্যায় কোন কার্য্য না করিয়া কেবল মাত্র বসিয়া থাকিতেন। এদিকে পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইলে, রাজা স্বয়ং রামসুন্দরকে বাসা হইতে আহ্বান করিবার জন্য গমন করেন; রামসুন্দর তখন প্যাজ মুড়ী ভক্ষণ করিতেছিলেন। পীড়ার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 'যদি যথারীতি যাগযজ্ঞাদি হইতেছে, তবে কেন না আরাম হইবে,' এই কথা বলিয়াই উচ্ছিষ্ট হস্তেই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ শিলায় তুলসী প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পীড়িতা বস্থাতেই রাজকুমারকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করাইয়া তুলসী পত্র ভক্ষণ করাইলেন, রাজকুমার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। এই সময় হইতে রামসুন্দর মহেশপুরের রাজসংসার হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন।

রামসুন্দরের ধনস্পৃহা ছিল না; তিনি যাহা কিছু পাইতেন, তাহার অধিকাংশই বিতরণ করিয়া দিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাবু তাঁহাকে একবার এক তোরা টাকা প্রদান করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন রামসুন্দর কুল খাইয়া বীচি গুলি শিবালয়ের নিকট নিক্ষেপ করিতেছিলেন দেখিয়া কোন লোক তাঁহাকে উক্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করেন। তাহাকে তিনি বীচি ফেলিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'স্থান বিচার করিয়া দেখিতে গেলে চিরকাল মলমূত্র ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অষ্টমূর্ত্তি শিব সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই শিব।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বীরভূম জেলা স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিলাল কাব্যতীর্থ মহাশয় আমার অতি আগ্রহের সহিত এই প্রবাদটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বিধাতা ও মাতৃভূমি।

১

বিধাতা-অসীম রাজ্য থাকুক কুশলে ;
প্রশস্ত আকাশ বুকে
চন্দ্রমা ভাসুক সুখে,
হীরক তারকা মালা জ্বলুক গগন পটে,
ঝরুক নিঝররূপে বিধাতার কৃপাবারি
প্রান্তর পুলিন পার্শ্বে, বর্দ্ধিত বিটপী লতা
পুষ্পিত ফলিত হোক, প্রকাশি মহান দীপ্তি,-
মানব রাজত্ব হোক সাগরের জলে।

২

ভাসুক আকাশ মার্গে সঙ্গীত লহরী,
বনের কুসুম মালা
প্রকাশি তোমারি লীলা
বায়ুভরে নেচে নেচে তোমারি মহিমা গা'ক্
উড়ুক সুমেরু চূড়ে তোমারি করুণা ধ্বজা
কন্দরে কন্দরে দেশে, বিজনে বিপিনে বনে
তোমারি রাজত্বদর্প হোক্ সুপ্রকাশ, দেব,
প্রস্তরে প্রস্তরে নাম জ্বলুক্ তোমারি।

৩

গউক্ তোমারি নাম পক্ষী বনচর।
মন্ত্রে মন্ত্রে মুখে বুকে
তরুর পল্লব শাখে
তমঃময় অন্তহীন অতল সাগর তলে
তোমারি রহস্য প্রভু, হোক্ ব্যাপ্ত সর্ব্বময়,
দেবতা দানব মিলি পতঙ্গ মাতঙ্গ সহ
মানবের হিংসাভাব ছাড়ি হিংস্র বনচর
ঘোষণা করুক্ প্রভু মহিমা তোমার।

৪

তটিনী লহরীমালা রচি তব নাম,
চালি অঙ্গ অঙ্গ'পরি
অক্ষর রচনা করি
লিখুক তটিনী বক্ষে নামের মহিমা তব,
বেড়ি বেড়ি নভস্থল ব্যাপিয়া তারকাচয়
নদীবক্ষে মুক্তামালা হউক সজ্জিত, নাম
লিখিতে তোমারি, গ্রহে গ্রহে চন্দ্র সূর্য্য হোক্
দীপ্তিমান—সুখময় বিধাতার ধাম।

৫

রত্নের ভাণ্ডার হোক্ রাজত্ব বিশাল,
থাক সদা শূন্য' পরে
কল্পনার অগোচরে
গভীর জলদকোলে বিদ্যুতের বর্ণমালা
রচিয়ে তোমারি নাম হুঙ্কারি বজ্রস্বরে
কাঁপায়ে ধরণীধর অক্ষর লিখিয়া দিক,
শাসন তোমার ওহে জলে স্থলে শূন্যমার্গে
ঘুরুক সংসার তব চক্র চিরকাল।

৬

এই চাই——
আমার সে মাতৃভূমি সে ছায়াতলে
সেই কার্য্য ক্ষেত্র'পরি
সেই আশা বুকে ধরি
সুখময় রহে চিরকাল, সেই গান প্রেম,
সেই বাঁশী স্বরে মুগ্ধ, সহেনা কখন যেন
সবল তাড়নাভয় নাহি শিখে উৎপীড়ন ;
বহিছে জীবন যারা যপুক তোমারি গুণ;-
শান্তি দাও, প্রভু, যারা শায়িত ভূতলে।

শ্রীমহম্মদ আজিজউস সোভান

কাঠরার মসজিদ।

লেখকের একদিনের স্মৃতি।

এক দিন (১৩০৭ সালের) বৈশাখের শেষ ভাগে আমি, আমার পরমবন্ধু মুরশিদাবাদ হিতৈষীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রভূষণ সিংহ এবং আরো কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে, মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান দৃশ্য সমূহ দর্শন করিবার নিমিত্ত নৌকাযোগে বহরমপুর হইতে মুরশিদাবাদ সহরে গমন করিয়াছিলাম। তীর্থে গমন করিয়া তত্রত্য কাম্য দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি দর্শন ব্যতীত যেমন সে তীর্থের ফললাভ হয় না, সেইরূপ মুরশিদাবাদের দৃশ্য দর্শনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদে গমন করিয়া মুরশিদ কুলির সমাধি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ সন্দর্শন ভিন্ন দর্শকের আশা কখনই ফলবতী হইতে পারেনা। অনেক দিন হইতে আমার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকায় (যদিও "হাজার দুয়ারীর" ভারত-বিখ্যাত সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কয়েকবারই দর্শন করিয়া নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলাম, তথাপি) বন্ধুবর্গের সমভি-ব্যাহারে একবার হাজার দুয়ারীর মনোরম দৃশ্য সমূহ সন্দর্শন করিয়াই কাঠরার মসজিদাভিমুখে অবিলম্বে সকলেই গমন করিলাম। সে দিন আমার মনে যে কিরূপ আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পূর্ব্ব মুরশিদাবাদের অধিকাংশ স্থান সাধারণতঃ প্রকৃতিদেবীর মনোহর আবাস-ভূমি, কোন স্থান মানবরচিত আম্র, কাঁঠালাদির বৃক্ষে এবং কোন স্থান বা স্বভাবজ বৃক্ষলতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, কোন স্থানে বনমল্লিকা কুসুম সৌরভে অলিকুল বিমুগ্ধ করিয়া সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, কোথাও বা মলয়ানিল বহুবিধ বন্য পুষ্প গন্ধে উন্মত্ত হইয়া, কখন তরুপত্র কখনবা লতা পল্লবের সহিত আলাপন ও ক্রীড়া করিয়া সমাগত দর্শকের মন বিমোহিত করিতেছে। আমরা প্রকৃতি মাতার সেই বাসভূমির মধ্য দিয়া পক্ষীকুলের শ্রবণরঞ্জন কলসঙ্গীত, সমীরণের পান্থ বিমোহিনী শক্তি প্রভৃতির উপলব্ধি করিতে করিতে মুরশিদাবাদ সহরের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে কাঠরা নামক স্থানে উপনীত হইলাম। কাঠরারও অধিকাংশই এক্ষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। যেমন আমরা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম, অমনি আমাদের মনে দুঃখের

সঞ্চার হইল !!! কারণ কোথায় শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে নয়ন মন সার্থক করিব, না সেস্থানেও প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন প্রাণ শিহরিতে আরম্ভ হইল। যে স্থানে ভগ্নপ্রায় মসজিদটী অসংস্কৃতাবস্থায় অদ্যাপি নিজ গৌরব প্রকাশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার প্রায় চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুতরাং মসজিদবাটীও আজ ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে। যখনই যাও, তখনি শুনিতে পাইবে যে, চতুর্দ্দিকে শিবাগণ মধ্যে মধ্যে "হুকি" রবে বনভূমি প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

মসজিদটী পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত। তাহার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইতে হইলে প্রথমেই চতুর্দ্দশ সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ সোপানের সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়। এই সোপান সমূহের নিম্নেই সেই বিখ্যাত মুরশিদ কুলির সমাধিক্ষেত্র। আমরা এই সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী তোরণ দ্বারের মধ্য দিয়া কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, নাতিদীর্ঘ, নাতিবিস্তৃত পথের সাহায্যে মসজিদের সমীপস্থ হইলাম। মসজিদের সম্মুখস্থ একটী খোলা বারান্দার মধ্য দিয়াই প্রস্তর-নির্ম্মিত পথটী চলিয়া গিয়াছে এবং বৃহৎ বারেন্দাটীর মধ্যস্থলে দীর্ঘ আলবালের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মসজিদটী উজ্জ্বল ধাতুময় চূড়াযুক্ত পঞ্চ গম্বুজ সমন্বিত, অসংস্কৃতাবস্থায় দণ্ডায়মান। ইহার প্রবেশদ্বারের উপর পারস্যভাষায় খোদিত একখানি প্রস্তরফলক এবং ভিতরে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলেও আর একখানি (সম্ভবতঃ পারস্য ভাষায় লিখিত) ঐরূপ প্রস্তরখণ্ড প্রথিত রহিয়াছে। আমার একটী বন্ধুর (Domiciled Bihari) পারস্য ভাষায় কিঞ্চিৎ দখল ছিল। কিন্তু তিনিও তখন স্পষ্টভাবে, শীঘ্র প্রস্তরফলকে লিখিত অংশ সমূহের অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আমরা উহার অর্থের জন্য আর অধিক সময় নষ্ট না করিয়া মসজিদের অন্যান্য দৃশ্য দর্শনে মনোনিবেশ করিলাম। আমরা মসজিদ গৃহের প্রবেশপথে যে প্রস্তরময় চৌকাঠ আছে, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া মসজিদের ভিতরের দৃশ্য দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কারণ ক্রমশঃ মসজিদের যেরূপ ভগ্নদশা উপস্থিত, তাহাতে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বিপদ ঘটিবারই বিশেষ সম্ভব, এই ভাবিয়া এবং "সতর্কের বিনাশ নাই," এই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া বাহির হইতেই মসজিদের যথাসম্ভব সর্ব্বাংশ দর্শন করিলাম। এবং এক একবার ভাবিলাম, এই বিরাট ব্যাপারে কত অজস্র মুদ্রাই না ব্যয় হইয়াছে! কত লোকের পরিশ্রমে কত আ

সময়ের মধ্যেই যে এই সুবৃহৎ মসজিদবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও একবার চিন্তা করিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয় ও অর্থের অসাধ্য কিছুই নাই, একথাও অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হয়। মসজিদটীর দৈর্ঘ্য ন্যুনাধিক ৪২।৪৩ গজ এবং প্রস্থ ৮।৯ গজ বলিয়া বোধ হয়। গৃহের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী জানালা প্রাচীন কারুকার্য্য বিভূষিত হইয়া অধুনাপি মলিন বেশে জীবিত রহিয়াছে। এক্ষণ ভগ্ন মসজিদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি পাত করিলে স্বতঃই দর্শকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। হায়! কালের কুটীল চক্র কে ভেদ করিবে? মুরশিদ একদা যাহাকে ধর্ম্মশালার উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যেস্থান কোরাণপাঠার্থিগণের পদধূলিতে পবিত্র হইবে বলিয়া কত আশাই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, সেই মসজিদ আজ কেবল পারাবতের কলধ্বনিতে ও মধুচক্রে পরিশোভিত রহিয়াছে। এক্ষণ পারাবত, মধুমক্ষিকা এবং ষামঘোষেরাই এই প্রকাণ্ড মসজিদগৃহ অধিকার করিয়া বনের শোভা বৃদ্ধি ও নির্জ্জনের রমণীয়তা উপভোগ করিতেছে। আমরা এই মসজিদ গৃহের অধঃপতন সন্দর্শন করিয়া সজল নেত্রে জগতের অস্থায়িত্ব অনুভব করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আগমন কালে মুরশিদের সেই সোপান নিম্নস্থ সমাধি মন্দিরটী একবার মনোযোগের সহিত দর্শন করিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমার একটী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই মনের সহিত কাঠরার সেই ভগ্ন মসজিদ ভবনাদির দৃশ্য দর্শনেসময় নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কারণ প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য, সকল দর্শকের মনো-রঞ্জন করিতে পারে না। যেহেতু ভগ্নগৃহ, ইষ্টকস্তূপ, প্রস্তর ফলক প্রভৃতির উপরিভাগে আপাতরম্য নয়ন-মন-বিমোহন কোন দৃশ্যই বর্ত্তমান থাকেনা। আমরা যখন পুনারায় মুরশিদের সমাধিগৃহের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম, তখন কয়েকজন বন্ধু আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের দুই জনকে তথায় রাখিয়াই অন্য দৃশ্য দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। আমরা শীঘ্র শীঘ্র সেই সোপান নিম্নস্থ মুরশিদের সমাধিমন্দির দেখিয়া সঙ্গভ্রষ্ট বন্ধুবর্গের সহিত অর্দ্ধপথে একত্রিত হইয়াছিলাম।

সোপানতলস্থ গৃহের উত্তর দিকে একটী দ্বার আছে। সেই দ্বার পার হইয়া একটী প্রকোষ্ঠ, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই সমাধিক্ষেত্র। উভয় দ্বারে যাতায়াত জন্য একটী কপাটহীন প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ আমাদের ঘটিল না। বিশেষ বন্ধুবর্গের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া শীঘ্রই

আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্বেও কাঠরা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। স্থানীয় জনৈক মুসলমানের নিকট হইতে আমরা সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়াইয়াই অনেক কথা অবগত হইলাম। যেস্থানে মুরশিদ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, সেস্থানও বহুবিধ শিল্পনৈপুন্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রত্যহ যামিনী যোগে একটী মাত্র প্রদীপের মলিন আলোক সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মুরশিদাবদ-নির্ম্মাতা নবাব মুরশিদকুলির কারুকার্য্য বিজড়িত সমাধিভূমির ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনের সহায়তা করিয়া থাকে !!! হায় ! মুরশিদ, তুমি-এক্ষণ কোথায়, তোমার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য, বাঙ্গলার একাধিপত্য এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বোপার্জ্জিত অদ্বিতীয় সম্মান সকলই যে তোমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ ? সোপানতলবর্ত্তী সমাধিগৃহটী দেখিয়া বোধ হইল যে, মধ্যে মধ্যে ইহার সংস্কার হইয়া থাকে। পরে শুনিলাম, এই সমাধি মন্দিরের কার্য্যাদি সম্পাদন করিবার জন্য একজন লোকও নিযুক্ত আছে। অতঃপর আমরা মসজিদবাটী পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদের ক্রিয়া কলাপ স্মরণ করিতে করিতে বালুচরের জনৈক বিখ্যাত জৈন প্রতিষ্ঠিত "কাঠগোলার বাগান" নামক বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের অন্যতম বিখ্যাত দৃশ্য দর্শনার্থ গমন করিলাম। পথে আরও ভগ্ন-মস্‌জিদ আমাদের নয়নগোচর হইল। জনৈক পথিককে একটি মসজিদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, মহাশয় ! ইহার নাম "ফুটী মসজিদ" তৎপর বহরমপুরে আসিয়া জানিলাম যে, "ফৌতি মসজিদের" অপভ্রংশে স্থানীয় লোকেরা "ফুটী মসজিদ" কহিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা সে সকল মস্‌জিদের প্রতি আর তত্দুর মনোনিবেশ না করিয়াই চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম।

প্রিয় পাঠক ! যদি কখনও তীর্থযাত্রীর বেশে মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান দৃশ্য (হাজার দুয়ারী প্রভৃতি) দর্শনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদ সহরে পদার্পণ কর, তাহাহইলে যেন একবার কাঠরায় মুরশিদের স্মৃতিচিহ্নে নয়নার্পণ না করিয়া কদাচ পরিতৃপ্ত হইবে না। যাঁহার নামের সহিত মুরশিদাবাদের নামের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া একবার তাঁহার নাম না করিয়া, একবার তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ সন্দর্শনে নয়ন মন সার্থক না করিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া কি উচিত হয় ?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মৃগ।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা গোজাতি এবং মৃগ জাতি নামে দুইটি বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম বিভাগের নাম দিয়াছেন Bovine অর্থাৎ গোজাতি। দ্বিতীয় বিভাগের নাম দিয়াছেন Cervine অর্থাৎ মৃগজাতি।

পরন্তু এই দুইটী বিভাগ করিবার কতকগুলি কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন, নচেৎ শুধু শুধু শ্রেণীবিভাগ হয় নাই। কারণ গুলির মধ্যে যাহাদের লিভর, পাকস্থলী, শৃঙ্গ প্রভৃতি একরূপ, তাহারা এক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত, উহার তারতম্য হইলেই তাহাকে অপর শ্রেণীতে ধরা হইয়াছে। এই হিসাবে জিরেফা, উষ্ট্র, গো, মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি এক শ্রেণীতে অর্থাৎ Bovine বিভাগে পড়িয়া গিয়াছে। এবং হরিণ অপর শ্রেণীতে পড়িয়াছে। ইংরাজেরা কৃষ্ণসারকে অর্থাৎ (Antelope.) এণ্টিলোপকে হরিণ জাতি বলেন নাই; গো জাতি বলিয়া ধরিয়াছেন; তাঁহারা রেণ্ডিয়াকে যে হিসাবে হরিণের জাতি বলিয়াছেন, সেই হিসাবে এণ্টিলোপ বা কৃষ্ণসারকে হরিণ বলা চলিত। ইহাতে কোন কোন হিন্দু আপত্তি করেন ও তাঁহারা বলেন, "কৃষ্ণসার" হিন্দুমতে প্রকৃত হরিণ শ্রেণীভুক্ত। ফলে যাহাই হউক, কৃষ্ণসার আমরা হরিণের শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া যাইব। উপস্থিত আমরা এই বুঝাইতে চাই যে, যাহারা রোমন্থনকারী জীব, অর্থাৎ যে জন্তুরা জাবর কাটে; এবং যাহাদের শৃঙ্গ ফাঁপা, অথচ উহার পরিবর্ত্তন হয় না, এবং সাদা সিদে শিং, উহারাই গো জাতি বা Bovine শ্রেণীভুক্ত। এবং যাহাদের শিং নীরেট, প্রতি বৎসর উহা খসিয়া গিয়া নূতন শিং উঠে; তাহারাই মৃগ জাতি বা Cervine শ্রেণীভুক্ত।

পৃথিবীর প্রায় সমুদয় বনেই হরিণ পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আফ্রিকা খণ্ডেই কিছু অধিক। সমুদয় প্রাণী বৃত্তান্তেরই আফ্রিকা খণ্ডেই অধিক পরীক্ষার স্থল এবং তথায় প্রকার ভেদে এক প্রাণী বহুবিধ পাওয়া গিয়াছে, ইহা সকল প্রাণিতত্ত্ববিদেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। বানর, গরু, ভল্লুক, মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী আফ্রিকাতে নানাবিধ ভাবে পাওয়া গিয়াছে, এমনটি আর কোন মহাদেশে পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, যে হিসাবে পৃথিবীতে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহার কোনটি চূড়ান্ত ভাবে পাওয়া যায়

নাই, সেই হিসাবে মৃগ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহারও চূড়ান্ত পাওয়া হয় নাই, হরিণের বিষয় জানিবার এখনো অনেক অপূর্ণ আছে।

যাহা হউক, বসন্তকালে হরিণের কপোল দেশের দুই দিকে গুপারির মত যেন দুটি গুটি বা স্ফোটক বাহির হয়। এই স্ফোটকদ্বয় সুচিক্কণ চর্ম্মাবৃত এবং লোমাবলিতে আচ্ছাদিত থাকে। বোধ হয়, এই স্ফোটক নির্গমন জন্য উহাদের মস্তকে বেদনা হয়, এইজন্য উহারা ঐ সময় খুব সাবধানে থাকে; আততায়ী নিকটে আসিলেও কিছু বলে না। তৎপরে যখন সেই সুচিক্কণ চর্ম্ম ফাটিয়া শিং বাহির হয়, এবং সেই শিং ক্রমে পাকিয়া যখন বড় হয়, তখন উহারা শিং পাকিল কিনা, তাহার একটা পরীক্ষা করে অর্থাৎ অপর হরিণের পাকা শিঙ্গের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করিয়া যখন বুঝে, যে আর ভাঙ্গিবার নহে, তখন উহারা ইচ্ছামত স্থানে গমনাগমন এবং ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর হরিণের শিং বদলাইয়া নূতন শিং হয়।

ইহাদের অনেকের শিং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। এবং কোন কোন হরিণের আদৌ শিং নাই। যবদ্বীপ এবং চীনদেশে এক জাতীয় হরিণের আদৌ শিং নাই। পরন্তু শিঙ্গের বাহার প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তবে রেণ্ডিয়া এবং এল্ক জাতীয় হরিণের শিং উৎকৃষ্ট ঝাড়বিশিষ্ট এবং গুচ্ছাকার। তৎপরে লাঙ্গল ফেলো এবং শুক্রো জাতীয় হরিণের শিং যদিও ঝাড়াল এবং এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বটে, কিন্তু পুর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয় অপেক্ষা ইহাদের শিং অনেক ছোট। ওয়াপিতী জাতীয় হরিণের শিং বেশি ঝাড়াল না হইলেও উহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট খুব লম্বা। যোয়াক জাতীয় হরিণের শিং অনেক ছোট, আন্দাজ গো শৃঙ্গের অর্দ্ধেক; কিন্তু উহা বাঁকান নয়,—মস্তকের উপর খাড়া ভাবে দাঁড় করান। ইহা ভিন্ন হরিণীর এবং হরিণের শিঙ্গের অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে; তাহা প্রত্যেক হরিণের বিবরণের মধ্যে বলিয়া যাইব।

হরিণেরা শস্য এবং লতা-পাতা-ভোজী প্রাণী এবং শুদ্ধাচারী। অসভ্য শুওরের মত দিবারাত্রি কর্দ্দমে পড়িয়া থাকে না। অনেক হরিণ অক্টোবর মাসে সঙ্গম করে। ইহাদের সঙ্গম সময় সুদীর্ঘ—তিন সপ্তাহ ক্রমাগত সঙ্গম করে। সঙ্গমের পর ইহারা শুদ্ধাচারে থাকে, অর্থাৎ যে, সে লতা পাতা ভক্ষণ করে না। এইজন্য এই সময় হরিণী কিছু কৃশ হইয়া পড়ে। সঙ্গম করিবার জন্য ইহাদের সঙ্গী খুঁজিয়া লইতে হয়; ছাগলের মত স্বগোত্রে

ইহাদের সঙ্গম হয় না। অক্টোবরের সঙ্গমে গর্ভ হইলে, জুন মাসে ইহারা সন্তান প্রসব করে। বার বৎসর বয়স হইলে ইহারা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। এবং কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। সমুদয় হরিণের চক্ষুই মানুষের নিকট অতি সুন্দর। এবং কোন কোন হরিণ আদৌ জল পান করে না। কেহ বা জলের ধারে থাকে এবং জল পান করে।

কৃষ্ণসার জাতীয় হরিণের পরিচয় এইবার আরম্ভ করা যাউক।

(১)

গাজেলী জাতি।

এই জাতীয় কৃষ্ণসার পৃথিবীর চারি খণ্ডেই পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কুড়ি প্রকারের গাজেলীর দেখা পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকা, মধ্য এসিয়া, আরব এবং পারস্যে ইহাদের অনেক পাওয়া যায়। ভারতেও গাজেলী আছে। এই জাতীয় হরিণ দুই ফুট হইতে তিন ফুট পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। সিরিয়া, মিশর এবং আরবের গাজেলী খুব ছোট। মুখ মেষের মত; বর্ণ উজ্জ্বল তাম্র। শিং বাঁকিয়া বাঁশির মত হয়। ইহারা লতা, পাতা এবং তৃণ ভক্ষণ করে। ইহাদের আদৌ তৃষ্ণা নাই—বারি পান করে না। বর্ণ চিরকাল এক প্রকারের থাকে। নক্ষত্র বেগে দৌড়ায়।

(২)

স্যায়গা জাতি।

এই জাতীয় কৃষ্ণসার ২৪ প্রকারের পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মুখ লম্বা, শিং খাড়াল; এবং এক ফুট উচ্চ। গ্রীষ্মকালে ইহাদের বর্ণ পিঙ্গল, এবং শীতকালে বর্ণ ধূসর হয়। ইহাদের নাসারন্ধ্রের প্রসরতা বশতঃ আহার কালে নাকের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করে বলিয়া ইহারা খাইতে খাইতে পশ্চাৎ হটিতে থাকে। ইহাদের নারীজাতির শিং নাই। ইহারা দ্রুত দৌড়ায় বটে, কিন্তু ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহারা দীর্ঘে প্রস্থে বেশ লম্বা হইয়া থাকে। পারস্যের লাঙ্গল ফলা হরিণের মত দেখিতে। ভারতের চিতি হরিণও এই স্যায়গা জাতি কৃষ্ণসারের অনুরূপ।

(৩)

চাইরু জাতি।

ইহাদের বর্ণ লাল ছিটে; শিং ২ ফুট লম্বা; ইহাদের নারীগুলিরও শিং হয়। শিঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। চাইরু জাতি পর্ব্বতেই অধিক থাকে।

আকারে ইহারা খুব ছোট বা খুব বড় নহে। আমেরিকা এবং যবদ্বীপের হরিণগুকে এই কৃষ্ণসার জাতিতে ধরা চলে।

(৪)

ইম্পালা জাতি।

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আড়াই শত প্রকারের ইম্পালা জাতি কৃষ্ণসার পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের পায়ের থাবা জিরেফার মত। চক্ষু বৃহৎ এবং সজল। মেয়েদের শিং নাই। পুরুষদের শিং কুড়ি ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের অধিকাংশের লাল রং; লোম কোমল; গলা সরু; মুখ লম্বা; উচ্চে এদেশীয় গরুর মত।

(৫)

ব্ল্যাক বাক জাতি।

এই কৃষ্ণসার কেবল ভারতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্ণ তামাটে কাল। পুরুষের শৃঙ্গ ৩০ ইঞ্চির অধিক লম্বা, এবং পাকান পাকান ভাবে স্ক্রূপের মত। মেয়েদের শিং নাই। ইহারা দেখিতে প্রকাণ্ড! মেয়েগুলা পুরুষাপেক্ষা ছোট। সচরাচর ইহারা আড়াই ফিট উচ্চ হয়। ইহাদের কাহারও চোক এবং কাহারও নাক বেড়িয়া একটা সাদা চক্র আছে। ইহাদের নাকলেজ খাট এবং নিম্নে কিঞ্চিৎ সাদা। ইহারা বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়িতে পারে। ব্যাঘ্র ভিন্ন অপর কেহই ইহাদের দৌড়িয়া ধরিতে পারে না। ইহাদের মাংস হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র। ইহাদের চর্ম্মেই উপনয়নের উপবীত প্রস্তুত হয়। মুনি ঋষিরা ইহারই উপবীত সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। মনুসংহিতা মতে ইহার মাংস শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে লাগিয়া থাকে।

"কৃষ্ণ সারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃ পরঃ॥

অর্থাৎ যতদূর কৃষ্ণসার স্বভাবতঃ চরে; ততদূরাবধিই যাজ্ঞিক দেশ, তাহার পর ম্লেচ্ছ ভূমি; কেননা, তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে পারে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক মতামত আছে। তাহা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তবে "মতামত" আছে; এবং এই কৃষ্ণসার লইয়া সংস্কৃত শ্লোক আছে, ইহা বলাই এ ক্ষেত্রের কার্য্য।

(৬)

ওয়াটার বাক জাতি।

ইহাদের ভারতে এবং তির্ব্বতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের ঝরণার নিকট অধিক দেখা যায়। পুষিতে হইলে, খালে বা বিলের ধারে রাখিতে হয়। ইহারা জল পান করে। ইহাদের কপালে দুই যোড়া করিয়া শৃঙ্গ। ইহাদের নারীগুলির আদৌ শিং নাই। পুরুষগুলির শিং একযোড়া ৫ ইঞ্চি করিয়া এবং ছোট শিং যোড়া দেড় ইঞ্চি পরিমাণ। তাম্র বর্ণ। ইহাদের আর দুই জাতি পাওয়া গিয়াছে। সে জাতিদ্বয়ের নাম "সিং সিং" এবং "নাগর"। দেখিতে বেশী বড় নয়। ইহারা বড়ই চতুর কৃষ্ণসার।

(৭)

ইল্যাণ্ড জাতি।

ইহাদের দেখিতে এক একটি বলদের মত। ৬।৭ ফিট উচ্চ। কেবল আফ্রিকায় পাওয়া যায়; ইহারা বেশ স্থূলকায় বলিয়া আজ কাল ইংলণ্ডের সাহেবেরা ইহাদের পুষিয়াছেন, অবশ্য মাংস খাইবার জন্য। ইহারা লম্বায় ১৯।২০ হস্ত; এবং ওজনে ৩০।৪০ মণ মাংস পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ধূসর। জল খায় না। চক্ষু সজলী, দীর্ঘ এবং চাহনি সুন্দর।

(৮)

কুডু জাতি।

ইহাদের আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। এই জাতির মত সুন্দর কৃষ্ণসার জগতে নাই। ইহারা স্বর্ণ বর্ণের। গাত্র অতীব মসৃণ। শিং ৪ ফিট লম্বা। ইহাদের নারীগুলিরও শিং আছে।

"হরিণ লোচনে।"

যেন ইহাদের সুন্দর চক্ষু দেখিয়া কবি ঐ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষে ইহাদের চক্ষু দেখিলে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে অনুমান করেন, ইহা ভারতেও ছিল। রাবণ রাজার সুবর্ণ মৃগ-মায়া দ্বারা যাহা সীতাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই জাতীয় কৃষ্ণসার।

(৯)

ব্লেস বাক জাতি।

ইহাদের আফ্রিকা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহারাও দেখিতে সুন্দর। মনোমুগ্ধকর। ইহারা প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বনভূমি আলোকিত করিয়া

বেড়ায়। ইহাদের শিং গুলি চারু চিক্কণ বাঁশরীর মত। দেখিতে এক একটি বাছুরের মত। স্বর্ণ বর্ণে চিত্রিত। চিচ্চণ রোমাবলী। পরন্তু ইহাদের চর্ম্ম হইতে অতি উপাদেয় পুষ্প সৌরভ বিশিষ্ট ওষধি-গন্ধ বহির্গত হইয়া, পথিকের মনপ্রাণ হরণ করে। ইহাদের আর দুইটি "বণ্টিবক" এবং "ছাহাবি" নামক জাতি বাহির হইয়াছে। বোধ হয়, কিছু দিন মধ্যে ইহাদের চর্ম্ম হইতে সুগন্ধি আতর আবিষ্কার হইবে।

(১০)

নু (Gnu) জাতি।

ইহাদের আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের আকার কিছু অদ্ভুত ধরণের! যেমন অপরূপ রূপ, তেমনি লাবণ্যময় শৃঙ্গ। শিং বাঁকান এবং সুচিক্কণ। অশ্বের মত মুখ, তদুপরে মহিষের মত শিং। শূকরের মত দন্ত। অশ্বের মত পুচ্ছ। কেশরীর মত গ্রীবা বাঁকান। তুরঙ্গের মত চরণ। অনেক দিনের কথা, একবার কলিকাতায় চিরণী সাহেবের সার্কাসে একটা "নু" আনা হইয়াছিল। ঐ জন্তটী যিনি দেখিয়াছিলেন, তিনিই হাসিয়াছিলেন; বস্তুতঃ ইহা হাস্যকর প্রাণী বটে! ইহাদের আর একটি "কোয়্যাপ" নামক জাতি বাহির হইয়াছে; কোয়্যাপ নু'র মত দেখিতে বটে, কিন্তু নুর বর্ণ কৃষ্ণাভ লোহিত; কোয়্যাপ সাদা বর্ণের, এই যাহা প্রভেদ।

(১১)

কামিং ওঠান জাতি।

ইহা ভারতীয় কৃষ্ণসার বটে; কিন্তু দেখিতে অনেকটা নু'র মত। ইহারা পাহাড়ে চরে! খুব বলবান। ছাগলের মত শিং। কাণ বৃহৎ। লেজ ক্ষুদ্র। গাধার মত গ্রীবা। গরু, গাধা, শূকর এবং ছাগল ভাঙ্গিয়া যেন ইহা সৃজিত হইয়াছে। ইহাদের ভারতবর্ষীয় নাম "গোরাল।" এবং সুমাত্রায় এই জাতীয় কৃষ্ণসার যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের "কামিং ওঠান" জাতি কহে।

(১২)

অরিক্স জাতি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় কৃষ্ণসার যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে "অরিক্স" কহে। ভারতে ইহাদের নাম "নীলগো।" অরিক্স এবং নীলগো

দেখিতে এক প্রকারের বটে ; কিন্তু কামেহিলা দেখিতে ছাগলের মত, ইহা ইয়োরোপ খণ্ডে পাওয়া যায়। এই কামেহিলা নীল গো'র জাতিতে ধরা হইয়া থাকে।

নীল গো ৪ ফুটের অধিক উচ্চ হয়। বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। ইহাদের এক অঙ্গুলি পরিমিত শিং। কিন্তু নীল গাই'য়ের শিং নাই। ইহারা জিরেফার মত জিহ্বা দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। ওষ্ঠ দিয়া ধরে না। ইহার চর্ম্মে উৎকৃষ্ট চাম্‌ড়া হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণসারের এক যোড়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব সর্ব্ব প্রথমে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যান ; নচেৎ তথায় পূর্ব্বে ছাগলের মত নীল গো ছিল। কৃষ্ণসার জাতির পরিচয় সংক্ষেপে শেষ হইল। এইবার হরিণ জাতির বিষয় বলা হইতেছে।

(১৩)

মস্তজাক জাতি।

বঙ্গীয় বনভূমিতে এই হরিণ অনেক পাওয়া যায়। ইহাদের অপর নাম " কিদাঙ্গ " ইহাদের লোকালয়ে পুষিলে বেশ পোষ মানে। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ তাম্র—শৃগালের মত আকার। এদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, শকুন্তলার পালিত হরিণটি এই মস্তজাক জাতি ছিল। ইহারা ২০ ইঞ্চি পরিমিত উচ্চ হইয়া থাকে। কর্ণ দীর্ঘ। লাঙ্গুল নাই বলিলেই হয়। নামে মাত্র আছে,—খুব ক্ষুদ্র বেড়ে লেজ অল্প টিকির মত। হিমালয় পর্ব্বত হইতে চীন পিকিন পর্য্যন্ত ইহারা চরিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে ৮ হাজার ফুট উচ্চে ইহাদের আবাস দেখা গিয়াছে। ইহাদের চর্ম্ম খুব উষ্ণ বলিয়া, তুষাররাশির মধ্যে ইহারা বিচরণ করিতে পারে। এই মৃগের নাভির নিম্ন স্থলে, তলপেটের বহির্ভাগে প্রথমে একটি স্ফোটকের মত হয়, পরে ঐ স্ফোটক ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একটা কমলানেবুর মত গোলাকার "আব্‌" হয়। ইহার অভ্যন্তর প্রদেশে মূল্যবান সুগন্ধি কস্তুরা সঞ্চিত থাকে। নারী মৃগের মৃগনাভি বা কস্তুরী হয় না ; কেবল পুং মৃগের হইয়া থাকে। মৃগের কস্তুরী হইলে, সে সময় মস্তজ স্থির থাকে না, বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে ; এজন্য সে সময় ইহাদের ধরা বা স্বীকার করা বড়ই কষ্টকর। অনেক কৌশলে ধরা হয়। এবং তাহাদের কক্ষ-লুক্কায়িত অমূল্যনিধি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া লওয়া হয়, এই ছেদনের জন্য মৃগ উপস্থিত কষ্ট পাইলেও তাহার জীবন নষ্ট হয় না এবং আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, এই মৃগ গৃহপালিত হইলে, তাহার কস্তরী প্রকাশিত হইতে প্রায় দেখা যায় না। যখন কস্তরী ছেদন করা হয়, তখন ছেদনকারী নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া উহা ছেদন করে, নচেৎ প্রবাদ এই যে, তীব্র গন্ধে রক্ত বমন হইবার সম্ভাবনা। ইহাদের দন্ত দীর্ঘ।

(১৪)

এল্কজাতি।

ইহাদের অপর নাম মুজ। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং উত্তর আসিয়া খণ্ডে ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। ইহারা শীত প্রধান দেশে বাস করে। আট ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের বর্ণ কালচিটের উপর তামাটে। ঘাড় ছোট। লেজ খাট। ইহাদের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। ইহাদের লাফ ভয়ানক। শিং ভয়ানক ঝাড়াল—শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। লোম দীর্ঘ দীর্ঘ। মুখ মহিষের মত।

(১৫)

ওয়াপ্টা জাতি।

মিসর, পারস্য এবং কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। বর্ণ লোহিত। শীতকালে ইহাদের লোম বাড়ে। কাশ্মীরের উপত্যকাভ্যন্তর প্রদেশস্থ বনভূমি এই হরিণে পূর্ণ। মহিসুরেও ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। ১৩।১৪ হস্ত লম্বা হয়। সেপ্টেম্বরে ইহাদের শিং সুপক্ক হয়। ইহাদের বহুবিধ জাতি বাহির হইয়াছে। মুখ গর্দ্দভের মত। লেজ নাই বলিলেই হয়। গলায় লোম বেশী। ইহাদের অপর নাম লাল হরিণ। জাপান, ফোরমোসা, এবং মাঞ্চুরিয়ায় লাল হরিণ অনেক পাওয়া যায়।

(১৬)

রোবাক জাতি।

ইহাদের ঘাড় এবং গলা অনেকটা উটের মত। পা ছোট। ইহাদের শিং খুব ছোট। দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত আছে। যে হরিণের দন্ত দীর্ঘ, তাহাদেরই মৃগনাভি হয়, মস্তজের দন্তদীর্ঘ বলিয়া এইরূপ অনুমান করা হয়। কিন্তু রোবাক জাতির মৃগনাভি পাওয়া গিয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই। ইহাদের চীন এবং ইউরোপের অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এমন কি ইহাদের বিলাতী হরিণ বলা চলে। চীনে ইহার নাম "ইলাফুর।" ইহাদের বর্ণ লোহিত, বেশ উজ্জ্বল।

(১৭)

রেণ্ডিয়া জাতি।

পৃথিবীর সকল দেশেই পাওয়া যায়, তবে শীতপ্রধান তুষারময় দেশেই ইহারা ভাল থাকে। এই জন্য লাপল্যাণ্ড এবং ফিনল্যাণ্ডে ইহাদের বেশী দেখা যায় বস্তুতঃ এই হরিণ উক্ত মহাদেশদ্বয়ের জীবন স্বরূপ। ইহারা প্রকাণ্ড হরিণ। ইহাদের বড় বড় মোটা মোটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট শিং দেখিতে যেন বৃক্ষ বিশেষ। ইহাদের নরনারী উভয়েই শৃঙ্গ-বতী। সচরাচর ইহাদের ঘোরাল লোহিত বর্ণের দেখা যায়, কিন্তু শ্বেত বর্ণের রেণ্ডিয়াও পাওয়া যায়। ইহাদের পদপল্লবে কৃত্রিম খুর আছে।

(১৮)

লাঙ্গলফেলো জাতি।

ইহাদের শৃঙ্গাগ্রভাগ লাঙ্গলের ফলার মত দেখিতে বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে "লাঙ্গলফেলো।' ভারতে এবং পারস্যে পাওয়া যায়। ইহার অপর নাম চিতা হরিণ। সর্ব্বাঙ্গ সুদৃশ্য চিতি চিহ্ন—যেন বেনারসি চেলী। ইহারা প্রকাণ্ড হরিণ। নিশাচর। ইংলণ্ডে ইহাদের পোষা হইয়াছে।

(১৯)

বিবিধ হরিণের কথা।

আফ্রিকায় অনেক রকম হরিণ আছে, তাহাদের বিশেষত্ব কোন গুণাদি না পাইয়া, উহাদের প্রত্যেক জাতি ধরিয়া বলা হইল না। "ক্লিপ্" "স্প্রীঙ্গার" "ঔরবি" "ষ্টৈনবক" এবং "গ্রাইস্‌বক্'দেখিতে সুন্দর, এবং মাংসল। ইহারা ইংরাজপছন্দ হরিণ "বুসবাক" এবং "বেয় সার" ইহারা দেখিতে ছোট ছোট, নাসাগ্র গরুর মত। সর্ব্বদা সজল নয়ন। আমেরিকায় প্রায়ই ছোট মৃগ দেখা যায় এবং পাওয়া যায়; এজন্য সচরাচর উহাদের decrlet অর্থাৎ হরিণা বা হরিণাণু বলা হয়। যবদ্বীপেও প্রায় ঐরূপ হরিণ পাওয়া যায়। এজন্য উহাদেরও হরিণামু বলা হয়। নীলগো এবং লাল হরিণ দেখিতে প্রায় একরূপ। হরিণের চর্ম্মে অনেক শিল্প কার্য্য হয়। হরিণের চর্ম্মে আসন হয়। লাল হরিণের লোমযুক্ত চর্ম্মে সুন্দর ইংলিশ কোর্ট হয়। হরিণ চর্ম্মের পাদুকা অতি পবিত্র!! রেণ্ডি-

য়ার চর্ম্মে জামা কাপড় প্রস্তুত হয়। হরিণ মাংস কেবল বৈষ্ণব ছাড়া পৃথিবীশুদ্ধ লোকে আহার করে; হিন্দুর নিকট হরিণ মাংস অতি পবিত্র।

বৃন্দাবনে বানর, ময়ূর এবং হরিণ স্বীকার করা হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। একজাতি হরিণ বিশেষ সঙ্গীত প্রিয়। উহাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া শিস্ দিলে, উহারা তোমার নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়! আহা! ঐ সময় লোকে বর্ষা দিয়া উহাদের খোচাইয়া মারে!

তুমি চক্ষের চাহনী যেমন হরিণকে দিয়াছ! এমন চাহনি আর কাহাকেও দিয়াছ কি?

ফুলের শত্রুকর নাই, তেমনি হরিণের চাহনির প্রতিবাদ করে, এমন কাহাকেও সৃজন কর নাই কেন?

সুশ্রুত সংহিতায় হরিণ মাংস সম্বন্ধে এই কথা লিখিত আছে।

"হরিণ মাংস পাকে মধুর, দোষঘ্ন, অগ্নিবৃদ্ধিকর, শীতল, মল-মূত্র-রোধক, সুগন্ধি এবং লঘুপাক।

আর্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ হরিণকে "এণ" এবং তাম্রবর্ণ মৃগকে "হরিণ" ও যে মৃগ কৃষ্ণ এবং তাম্রবর্ণ নহে, তাহাকে "কুরঙ্গ' বলিতেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

জনপদোদ্ধ্বংসে স্বাস্থ্য।

বাত বিকৃতির জন্য—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তান বিপর্য্যয় সম্বন্ধে ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন;—

বাতমেবংবিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতি চলমতি পরুষমতি শীতমত্যুষ্ণ মতি রুক্ষমত্যভিষ্যন্দিন মতিভৈরবারাবমতি প্রতিহত পরস্পর গতিমতি কুণ্ডলিনমসহ্য গন্ধ বাষ্প-সিকত পাংশু ধূমাপহতমিতি।

ঋতু গুণের বিপরীত ভাবাপন্ন, অতিশয় জলসিক্ত, অতি বেগ, অতি পুরুষ, অতি শীত, অত্যুষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বেগবাহী, অতি ভীষণ শব্দ যুক্ত, অতি কুণ্ডলিত, এবং অত্যন্ত অসুখাবহ গন্ধযুক্ত, বাষ্প, বালুক

পাংশু, ধূমাদি দ্বারা দূষিত হইলে, বায়ু রোগকর হয়, এবং তদ্বায়ু সেবী-দিগের শরীরও রোগপ্রবণ হইয়া থাকে।

জল বিকৃতি জন্য—

ভাব বিপর্য্যের সম্বন্ধে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

উদকন্তু খলু অত্যর্থ বিকৃতি গন্ধবর্ণ রসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্ত জলচর বিহঙ্গমুপক্ষীণ জলাশয়মপ্রীতিকরমপগত গুণং বিদ্যাৎ।

জল অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ, বিবর্ণ, বিকৃতি রস, বিকৃত স্পর্শ, ক্লেদ বহুল, জলাশয়, জলচর পক্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, শুষ্ক, অপ্রীতিকর,—জল, সাধারণতঃ স্বগুণ বর্জ্জিত হয়।

দেশ বিকৃতি জন্য—

ভাব বিপর্য্যের লক্ষণ হইতেছে,

দেশং পুনঃ প্রকৃতি বিকৃতি বর্ণ গন্ধরস সংস্পর্শং ক্লেদবহুলমুপসৃষ্টং সরীসৃপ ব্যাল মশক শলভ মক্ষিকা মূষিকালূক শ্মশানিক শকুনি জম্বুকাদিভিস্তৃণোলূপো পবনবন্তং প্রতানাদি বহুলমপূর্ব্ববদব পতিতং শুষ্ক নষ্ট শস্যং ধূম্র পবনং, প্রধ্মাত পতত্রিগণমুৎক্রুষ্ট শ্বগণমুদ্ভ্রান্ত কথিত বিবিধ মৃগপক্ষি সংঘমুৎসৃষ্ট নষ্ট ধর্ম্ম সত্য লজ্জাচারগুণ জন পদং শশ্বৎ ক্ষুভিতোদীর্ণ সলিলাশয়ং প্রততোল্কাপাত নির্ঘাত ভূমিকম্পঞ্চ প্রতিভয়া রাবরূপং রুক্ষ তাম্ররুণসিতাভ্রজাল সংবৃতার্ক চন্দ্রতারত মভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব স ত্রাস রুদিতমিব সতমস্কমিব গুহ্যকা চরিতমিবা ক্রন্দিত শব্দ বহুলঞ্চাহি তং বিদ্যাৎ।

দেশ বা ভূমির অর্থ (তদাত্মকগুণ) হইতেছে, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বলিয়া ভূমির বিকারে পূর্ব্বোক্ত গুণ পঞ্চকের বিকার ও দেশের বাহ্যতঃ বিবর্ণত্ব, ক্লেদ ও নিগ্রহ সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, শলভ, মক্ষিকা, মূষিক, উলূক, শ্মশানচারীপক্ষী ও জম্বুকাদির মরণ বৃদ্ধি, দেশে নানাবিধ তৃণ ও উলূপের উৎপত্তি বিবিধ লতার প্রসার বৃদ্ধি,—পূর্ব্ব হইতে দেশের আকার প্রকারগত পরিবর্ত্তন, ভূমির অকৃষ্ট পতিত দগ্ধ বা তাহার তদ্ভাব শস্য সমূহ শুষ্ক ও নষ্ট, ধূমযুক্ত বায়ুর কুজ্ঝটিকার ন্যায় বোধ, অনুভব পক্ষীদিগের নিরন্তর বিকৃত কূজন, কুকুরের রোদন, মৃগ পক্ষিগণের উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথিচরণ বা ব্যথিতভাবে রোদন, মানব সমূহের সত্য ধর্ম্ম লজ্জা আচার ও গুণ হইতে বিচ্যুতি, জলাশয়ের জল কখনও ক্ষুভিত, কখনও উদীর্ণ হইয়া ক্ষণে শূন্য ক্ষণে পরিপূর্ণ হয়। উল্কাপাত ও নির্ঘাত ও ভূমিকম্প হয়। দেশের দিক্ সমূহ ভয়াবহ

শব্দে শব্দিত হইতে থাকে। আর চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাবলী কখনও কৃষ্ণ তাম্রবর্ণ কখন শ্বেত স্নিগ্ধবর্ণ বা মেঘাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণের হৃদয় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত জন্য উদ্বেগের উদ্রেক বা ভয় ক্রমে রোদন, চক্ষে অন্ধকার দর্শন, যক্ষ বিচরণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহার অনুকূল বচন তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসংগ্রহ সুগণোক্ত বচনের উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে। এতৎ সম্বন্ধে তাহাই নির্দ্দেশে কেমন সামঞ্জস্য সুরক্ষিত—

সোম সূর্য্য বিকৃতিশ্চ গন্ধবর্ণ ব্যতিক্রমঃ
ধূম্র বায়ুশ্চতীব্রোগ্রঃ ক্ষুভিতোদীর্ণ পল্বলঃ ॥
উল্কাপাতো ধরাকম্পোদিঙ্‌মালা নির্হতা সদা।
জলাভাবঃশস্য হানি রীতিনাং সমুপদ্রবঃ।
হীনচারা জনাঃ সর্ব্বে ভয়ারাবৈশ্চ শঙ্কিতাঃ।
ব্যালপ্লবঙ্গমূষিকা বিসৃজন্তি কালরবম্ ॥
ভবন্তি দুর্লক্ষণানি যত্র জনপদে যদা।
বিধবংস স্তস্য সম্ভাব্যো নিশ্চিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥

এই শ্লোকের সহিত চরকোক্ত বচনের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত। ব্যাল-প্লবঙ্গ, মূষিকাদির মৃত্যু সম্বন্ধে নির্দ্দেশ থাকায়, বোধ হয় ভূমি দূষিত হইলে, ভৌম বিকার ভূমি সংস্থিত জীবগণের অন্তর্ভূমিচর মূষিকগণের বিশেষতঃ শীঘ্র রোগপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্লবঙ্গ শব্দে কেহ ভেক বা উল্লম্ফনশীল জন্তু, কেহ বা শাখামৃগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাই হউক, সুগণ কথিত বাক্যের সহিত চরকোক্ত বাক্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কালবিকার জন্য—

ভাব বিপর্য্যয় লক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপ—

কালস্তু খলু যথর্ত্তু লিঙ্গাদ্বিপরীত লিঙ্গমতি লিঙ্গহ্বাহিতঃ ব্যবসোৎ।

যে ঋতুতে যেরূপ লক্ষণ স্বাভাবিক, তাহার বিপরীত লক্ষণ বা ঋতুগত লক্ষণের আধিক্য বা হীনতা ঘটে।

সে যাহা হউক, জল বায়ু দেশ কাল দূষিত বা বিকৃত লক্ষণ হইলে তদাশ্রিত জীবের শরীরগত ভাবেরও বিকার ঘটে। সুতরাং রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। এই রোগপ্রবণ শরীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায় একের রোগ অন্যের শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে, অনুকূল স্থান আশ্রয় করিতে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন পায় না। ইহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য যে, প্লেগ একটী সংক্রামক রোগের

প্রবল প্রসারের সময় বিশিষ্ট সামর্থ্যময় শরীরেও রোগের সংক্রমণ ঘটিয়াছে, হয়ত তাহাতেই তাহার ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং সংক্রামক রোগের প্রসারের সময় সাবধানে নিয়ত সংযত ভাবে থাকিলে, রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত না হইয়া বিশুদ্ধভাবে সদ্‌বৃত্তে ব্রতী হইলে, নিরাতঙ্ক নিরাময় থাকার আশা হয় সত্য, কিন্তু স্থান ত্যাগ তাহার অপেক্ষা নিরাপদ। চরকের অনুশাসন হইতেছে।

হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥

দেশ দূষিত হইয়া রোগপ্রবণতার অনুকূল ক্ষেত্র হইলে, তাহার ত্যাগ করিয়া মঙ্গলকর জনপদের আশ্রয় গ্রহণ হিতকর, ব্রহ্মচর্য্যের ও ব্রহ্মচারিগণের সেবাও বিহিত। এই ব্যাপারের বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিলে, স্পষ্টই অনুমিত হয়, কোন সংক্রামক রোগের প্রবল প্রসারের প্রাক্‌কালে স্থান ত্যাগ সঙ্গত; কিন্তু প্রবল প্রসারের পর লোকের শরীর রোগপ্রবণ হইয়া রোগের আশ্রয় হইলে, রোগাশ্রয় হইলেও, যাহার কতিপয় দিবসের পর এমন কি পক্ষান্তেও বিকাশ পাইতে পায়, তাহাদের স্থান ত্যাগ করিতে দিয়া রোগের দেশান্তর সংক্রমণের সুযোগ করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। তৎসম্বন্ধে বোধ হয়, রোগাক্রান্ত দেশে গণ্ডী দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দেহান্তর সংক্রমণ সমর্থ রোগের বীজাণু যাহাতে দেহান্তর আশ্রয় করিতে না পারে, তাহার বিধান করা একান্ত উচিত বলিয়া সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গাদ্ গাত্র সংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

মৈথুন, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, রোগীর পৃষ্ট বস্ত্র মাল্য অনুলেপনাদির ব্যবহার, এই সকল করিলে, কুষ্ঠ, জ্বর, রাজযক্ষ্মা চোক্ উঠা, এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজ রোগ সকল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সকল সংক্রামক রোগে বা ইহাদের আংশিক লক্ষণ বিশিষ্ট কোন সঙ্কর ব্যাধিতে রোগীর সহিত কথিত মৈথুনাদির সংঘটন নিষিদ্ধ। অপর জনপদবিধ্বংসী রোগ সকল প্রায়ই জ্বরাদির কথঞ্চিৎ লক্ষণ বিশিষ্ট কোন রূপ সঙ্কর ব্যাধির আবির্ভাব হয়;

আর তজ্জন্যই প্রাগুক্ত উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষণ একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রান্তর নিদেশানুসারে কথিতরূপ কোন রোগীর প্রথম রোগের সময় দেবার্চ্চনাদি মাঙ্গল্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সেই নির্দ্দেশ মতে আরও দেখা যায়, মৃতের অবস্থান গৃহে হোমাদির অনুষ্ঠান করাও বিহিত। গৃহের রোগীর শয্যাতলস্থ ভূমির উৎখাত করিতে লৌহ শলাকার রোপণ করিতেও যে উপদেশ আছে, তাহার সম্বন্ধে আর্য্য বাক্য শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সর্ব্বভুক্ অগ্নিও সংক্রামক রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সমর্থ। অগ্নিতে আহুত ঘৃতাদির সৌরভও ব্যাধিনাশক ও স্বাস্থ্যরক্ষক। সুতরাং হিন্দুদিগের এই আর্য্য উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম যে একান্ত হিতকর, তাহার অপলাপ করিবার শক্তি কাহারই নাই। সূর্য্যরশ্মিও আমাদিগের আরোগ্য বিধানের উপযোগী, আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ, এই অনুশাসনও আরোগ্যপ্রদ সবিতার অর্চ্চন সংক্রান্ত উপদেশ। আরও সুশ্রুতে কথিত আছে:—শীতাংশুঃ ক্লেদয়ত্যুর্ব্বীং বিবস্বান্ শোষয়ত্যপঃ। তাবুভাবপি সংশ্রিত্য বায়ুঃ পালয়তি প্রজাঃ ॥

চন্দ্র, পৃথিবীকে রসে আপ্লুত বা ক্লিন্ন, সূর্য্য পৃথিবীর রস শোষ ও বায়ু এতদুভয়ের আশ্রয়ে প্রজারক্ষণ করিতেছেন। সূর্য্য রস শোষ করেন, এবং বর্ত্তমান জনপদ বিধ্বংসী নগরোৎসেধকর ব্যাধি প্লেগ, ত্রিদোষজ বিকার বিশেষ হইলেও গ্রন্থি স্ফীতিতে শ্লৈষ্মিক প্রকোপের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, শোষক তেজের আশ্রয় গ্রহণ সঙ্গত। চরকে কথিত হইয়াছে:—

শীতেনোষ্ণ কৃতান্ রোগান্ শময়ন্তি ভিষগ্বিদঃ। যেতু শীতকৃতা রোগা তেষাঞ্চোষ্ণং ভিষগ্ জিতম্ ॥

বৈদ্যগণ শীতল দ্বারা উষ্ণকৃত রোগের ও শীতকৃত রোগের উষ্ণদ্রব্য দ্বারা প্রশমন করিয়া থাকেন। আর কলিকাতায় প্রায়ই বসন্তকালেই প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। আর ঋতুর বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, "হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা বসন্তে কফ রোগকৃৎ"। এই সূত্রানুসারে বোধ হয়, প্লেগে শ্লেষ্মার প্রকোপেরই প্রাধান্য প্রধানতঃ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং কফজ ব্যাধির উষ্ণ ক্রিয়া প্রশমনকর বলিয়া, সূর্য্যরশ্মি প্লেগের প্রতিষেধ পক্ষে প্রকৃষ্ট উপযোগী। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশের একটী বিশিষ্ট বিধির পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যেমন আবাসস্থান নির্ম্মল পরিষ্কৃত না হইলে আবর্জ্জনার পচনাদি জন্য পুতিগন্ধে অধিবাসিগণের

রোগপ্রবণতা অবশম্ভাবিনী। তেমনি সেই ব্যষ্টিভাবের প্রত্যেক গৃহের পরিষ্কার করার ন্যায়, সমস্ত ভাবে বহু গৃহের সমাহার রূপ নগরেরও পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। আবার গৃহের বা নগরের পরিষ্কার বা নির্ম্মলতা সাধনের চেষ্টার ন্যায় আত্ম পুরুষের আশ্রয়স্থান দেহের পরিষ্কৃতি বা নির্ম্মলতা বিধানের উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

পাখীর গান।

কিগান গাহিয়া
কোথায় যাস!
কার লাগি প্রাণ
এত উদাস!
কোন্ সুর তোর
গানেতে ঝরে,
কেন সে আমারে
পাগল করে!
আমার কত কি
পূরাণ স্মৃতি,
উগারিছে যে
ও গান নিতি!
তোর ওই গানে
মরম দেশে,
একখানি সুর
আসিছে ভেসে।
কেন তোর গানে
এমন হই,
আমি যেন আর
আমাতে নই।

বলরে এগান
পেলি কোথায়,—
আমারে পাগল
করিলি যায়।
পরাণ বাঁধিতে
পারিনা আর,
বল্‌রে ও গান
হরিলি কার!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
বড়াললেন, হুগলী।

——:():——

সংবাদ ও নানা কথা।

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর, কীর্ণহার শিবচন্দ্র ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বীরভূমের মাজিষ্টেট্। শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়া বালকগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব প্রায় এক ঘণ্টা কাল সুললিত ভাষায় বালকগণকে উপদেশ দেন। সকলেই তাঁহার মধুর আলাপে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। আমেদ সাহেবের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট্ পাইয়া আমরা সৌভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই।

কীর্ণহারের সন্নিকট ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের একটি স্ত্রীলোক, বিষপ্রয়োগে অপর কয়েক জনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছে। পুলিশ সেই স্ত্রীলোকটিকে চালান দিয়াছে।

বীরভূম জেলায় ত এ সকল উৎপাত পূর্ব্বে ছিল না। কেন এমন হইল?

———

নানা কারণে পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। সকল কথা আজ বলিতে পারিব না। আজ কেবল স্বাস্থ্যের কথাই বলিব। ইংরাজী চাল্ বচন, ডাক্তারি ঔষধ, অনুপযুক্ত আহার, ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা কারণে গ্রাম গুলিত ব্যাধির আকর হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া লোকে অজ্ঞতা বশতঃ অনেক ব্যাধিকে ডাকিয়া আনিতেছে। এখনও বীরভূমে

বিশেষত কীর্ণহার অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ লোকই প্রায়ই নিরক্ষর, অর্দ্ধ শিক্ষিত বা পুরাতন ধরণে শিক্ষিত। আধুনিক শিক্ষায় লোকের ধর্ম্মভাব হৃদয় হইতে দূর হয়, একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী মোটের উপর মন্দ জানেন না। কিন্তু যাহারা একেবারেই শিক্ষার কোন ধারই ধারে না, তাহাদের না আছে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, না আছে স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি। শাস্ত্রকারগণ সকল বিষয়েরই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থ্যের কথাটাও তাঁহারা ধর্ম্মের মধ্যে ধরিয়া গিয়াছেন। কাজেই যখন লোকের ধর্ম্মভয় ছিল, তখন, সকলেই জলকে নারায়ণ জ্ঞানে অতি পবিত্র রাখিত, ছায়া ও জলদানের জন্য বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী খনন করিত। এসব করিত ধর্ম্মের টানে; স্বাস্থ্যের টানে নহে। কিন্তু দুঃসময় আসিল; ধর্ম্মভাব লোকের মন হইতে প্রায় বিদূরিত হইল। সুতরাং লোকে অবাধে পানীয় জলে শৌচ প্রস্রাবাদি করিতে লাগিল, বৃক্ষপূর্ণ প্রান্তরকে মরুভূমি করিয়া ফেলিল, জলাশয় খনন করা দূরের কথা, পুষ্করিণী ভরাইয়া জমি করিতে লাগিল। অবস্থাত এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখন উপায়? আবার সেই প্রাচীন কালের মুনি-ঋষির সংস্কৃত শ্লোকে যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহাত বোধ হয় না। অথচ আর কিছু পাই আর না পাই, পানীয় জলটা একটু ভাল খাইতে পাইব না কেন? পানীয় জলে বা জলের ধারে মল মূত্র ত্যাগ না করিলে কি লোকের সুখ হয় না? তাহা ছাড়া কাপড় পরিষ্কার ও অন্যান্য শত প্রকার উপায়ে জল নষ্ট করার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। যদি বলেন, গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে ত এ সকল নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা হয় না। অনেক লোকের এ সব বিষয়ে ততটা নজর নাই। আর এক কথা, অনেক গ্রামে কেহ প্রধান নাই। ইংরাজী হাওয়া বহায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়াছে। কেহ কাহাকে মানে না। কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় লইতে চায়। এরূপ যখন ব্যাপার, তখন কি করা উচিত? আমরা যতটুকু বুঝি, যত দিন অধিকাংশ লোক শিক্ষিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত। আরও একটা কথা আছে। পূর্ব্বে লোকে ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য পুষ্করিণী খনন করিত। এখনত ধর্ম্মের কথা কাহারও মনে নাই; অর্থের কথাই কিছু বেশী পরিমাণে দেখিতে পাই। কাজেই কেহ যে পরোপকারের জন্য টাকা খরচ করিয়া জলা-

শয় খনন করাইবে, ইহা সম্ভব নয়। আর লোকে কত খরচই বা করিবে? জিনিস পত্র সমস্ত অক্রেয়; তাহা ছাড়া নানা প্রকারে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। পোষাকের খরচ, মোকদ্দমার খরচ, বিবাহের খরচ, ট্যাক্সের, চাঁদার খরচ নানা খরচ আছে। জলাশয় খননের খরচ কেমন করিয়া কুলাইবে? সুতরাং রাজাই এখন একমাত্র সহায়। গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন পুষ্করিণী খননের আর উপায় নাই।

রাস্তা সম্বন্ধেও দু চারি কথা বলা আবশ্যক। গ্রামের রাস্তা গুলিত অতি কদর্য্য হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান লোকেরা গ্রাম্য দেবতার দোহাই দিয়া সকলকে আপন আপন বাটীর সিমানার রাস্তা বাঁধাইতে বলিত। সকলেই গ্রাম্য দেবতার ভয়েই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, আপন আপন সিমানাস্থিত রাস্তা মেরামৎ করিত। এখন এই আইন কানুনের দিনে কেহ ত আর কাহারও হুকুম মানিবে না, কাজেই গ্রাম্য রাস্তাগুলি অতি কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথ! তাহা ত আর নাই বলিলেই চলে। সে সব গুলি এখন ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া উত্তম শস্য প্রসব করিতেছে। যাতায়াত ত একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যাহারা একটু আধটুকু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা ত দরখাস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌কে জালাতন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টে কিছু সেলামী না দিলে, অর্থাৎ ষ্ট্যাম্প দিয়া নালিশ না করিলে কোন ফলইত হয় না দেখিতেছি। এখন উপায়? উপায়ের মধ্যেত একটী দেখিতেছি। কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রাম্য সমিতি (Village Union) স্থাপন করা। আজকাল চাপরাশ ভিন্ন কোন কাজ হয় না। সুতরাং গ্রাম্য-সমিতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা যে অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত আমেদ সাহেব গত ১৮ই ডিসেম্বর, যখন কীর্ণহারে আসেন, তখন কেহ কেহ পানীয় জলের প্রতি অত্যাচারের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। তাহাতে তাঁহার ধারণা হয় যে, এতদঞ্চলে পানীয় জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্য তিনি শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়কে কীর্ণহারে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন। সৌরেশ বাবুও আপনার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও পরোপকারিতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, মাজিষ্ট্রেটের নিকট গ্রাম্য সমিতি স্থাপনের এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। এখন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কৃপাদৃষ্টি করিলে

আমাদের অনেক উপকার হয়। আর গ্রাম্য-সমিতি সৌরেশ বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইলে যে সুফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হিন্দু জাতির অধঃপতনের চূড়ান্ত হইয়াছে। সুতরাং এখন চারি দিকেই শাস্ত্রের অবমাননা দেখিতে হইতেছে। যে সকল মহা পাপের জন্য হিন্দু জাতির এই বর্ত্তমান দুরবস্থা, গোজাতির প্রতি দুর্ব্ব্যবহার তাহাদের অন্যতম। গোচর ত আর কোথাও নাই। গরুগুলি ত জীর্ণ শীর্ণ, মৃতকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবিতাবস্থায় গরুগুলি ত এইরূপ অনাহারে থাকিয়া মহাকষ্টে মনুষ্যের উপকার করে। কিন্তু অনেক মানুষ আবার এরূপ কৃতজ্ঞ যে, সেই গরু যখন বৃদ্ধ হইয়া বা অপর কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোক সেই সকল অকর্ম্মণ্য জীবগণকে নিষ্ঠুর কসাইগণের হস্তে অর্পণ করে। হিন্দুর দেশে ইহা বড়ই বিসদৃশ্য। কোন্ হিন্দু ইহা দেখিয়া ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে? যে পারে, তাহার চক্ষু নাই, হৃদয় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বীরভূম, বড়রা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণবল্লভ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় একটা পিঁজরা পোল স্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। অজয় নদের তীরে কোন স্থানে উহা স্থাপিত হইবে। তথায় অকর্ম্মণ্য গরুগুলিকে আশ্রয় দেওয়া হইবে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, প্রাণবল্লভ বাবু ও মন্মথ বাবুর চেষ্টা যেন সফল হয়। আর বীরভূমবাসী হিন্দু সন্তানদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য দ্বারা উক্ত মহোদয়দ্বয়কে উক্ত পুণ্য কার্য্যে সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

কীর্ণহারের নিকটস্থ সুরপুর গ্রামের তিন জন লোক আবার একজনকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। তাহারা সেসনে সোপরর্দ্দ হইয়াছে। এবার বীরভূম জেলায় বড় বেশী খুন হইতেছে।

কলিকাতা, ১/৩ শঙ্কর ঘোষের লেন, নবভারত-প্রেসে

লাম, সম্রাটের বিরাগ উৎপাদন করায় আপনার প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু বিরাগের কারণ কি, তাহা জানিতে পারি নাই।"

"আলাউদ্দিন আমার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিল। প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতেই এই আদেশ হইয়াছে।"

"আমরা ইহার প্রতিশোধ লইব।"

"কিরূপে?"

"আমি দিল্লীর সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য এখানে আসি নাই। আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলেই আপনার কারামুক্তি হইবে।"

"কিন্তু একাকী অসহায়াবস্থায় তুমি কি আলাউদ্দিনের বিনাশ করিতে পারিবে? কেননা, শত শত রক্ষিবর্গ সর্ব্বদা তাহার শরীর রক্ষা করিতেছে।"

"শত শত কেন, সহস্র সহস্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইলেও দূর হইতে নিক্ষিপ্ত সায়কে তাহার হৃদয়স্থল ভেদ করিতে পারে।"

[illegible]দাসভাবে রতনসিংহ বলিলেন, "যে কোন প্রকারে আমার কারামুক্তি হ[illegible] হইল। যদি অন্য উপায় না থাকে, [illegible]দা আমাকে যবনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে।"

ক্রোধে এবং অপমানে অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জয়পাল উত্তর করিলেন "কখনই না"।

এই বলিয়া তিনি বেগে কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কারারক্ষক তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ করিল এবং ভবিষ্যতের জন্য অধিকতর সতর্ক হইল।

রতনসিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়পাল অতীব চিন্তিত হইলেন এবং কি উপায়ে জয়াকে রক্ষা করিবেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের দেবী পাপিষ্ঠ যবনের অঙ্কশায়িনী হইবে, এ চিন্তা তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি আলাউদ্দিনের বিনাশ সাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইহার দুই চারিদিন পরে আলাউদ্দিন বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে বার ক্রোশ দূরে একটি বৃহৎ অরণ্যে মৃগয়া করিবার জন্য গমন করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান [illegible]মাত্যগণও তাঁহার সঙ্গে চলিল। [illegible]

ধরিয়া বহুসংখ্যক পশু হনন হইল। তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে আলাউদ্দিন একটি হরিণের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া একাকী অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। হরিণটি তাঁহার লক্ষ্যপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতে পথের সন্ধান করিতে পারিলেন না। এদিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়; তাঁহার ঘোটকও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং একটি উচ্চ ভূমির উপর আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটি তীর আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিল। আলাউদ্দিন পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে দ্বিতীয় তীর আসিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিল। তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

এদিকে আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইল। তাহারা সমস্ত রাত্রি অরণ্যের নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিল এবং পরিশেষে কাননপ্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরিশেষে যখন তাহারা আরোহীশূন্য তাঁহার ঘোটকটিকে দেখিতে পাইল, তখন সকলে স্থির করিল যে, সম্রাট্ কোনও হিংস্র পশুর কবলে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং সকলে বিমর্ষ চিত্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যগণ আলাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র রুকুনুদ্দিনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এদিকে চেতনা সঞ্চার হইলে আলাউদ্দিন দেখিলেন যে, তাঁহার ক্ষতস্থান উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকজন ভীল তাঁহার শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি তাহাদের নিকট আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিলেন এবং আপনাকে সম্রাটের অনুচর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রায় পক্ষাধিককাল শয্যাগত থাকিয়া দিল্লীশ্বর বনবাসী ভীলগণের যত্নে ও পরিচর্য্যায় আরোগ্য লাভ করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম হইতে অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার পরিচয় পাইয়া দলে দলে সৈন্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। তিনি এইরূপে ৫০০ পাঁচশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য আসিয়া তদীয় পতকা মূলে সমবেত হইল। সকলেরই সন্দেহ হইল, রুকুনুদ্দিনই সিংহাসন লাভের আশায় গুপ্ত-

ভাবে সম্রাটের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। রুকুনুদ্দিন আফগানপুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও নিহত হইলেন।

সিংহাসন সর্ব্বতোভাবে সুদৃঢ় করিয়া আলাউদ্দিন পুনরায় রতনসিংহকে আপন সমীপে আনয়ন করিয়া কহিলেন, চিতোররাজ! প্রবল প্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের পাণিগ্রহণে তোমার কন্যার কোম অবমাননা হইবে না। অতএব যদ্যপি স্বাধীনতা বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে তোমার কন্যাকে দিল্লীতে আনয়ন কর, নচেৎ অপরাধীর ন্যায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। কাপুরুষ রতনসিংহ ধীরভাবে কেবল মাত্র উত্তর করিলেন— "আমাকে স্বজাতি মধ্যে কলঙ্কিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে।"

আলউদ্দিন কহিলেন "পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান পদে উন্নীত হইবে।"

রাজপুতরাজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু তাঁহার কন্যাকে দিল্লীতে আনয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং আলাউদ্দিনের নিকট বিদায় লইয়া তদুদ্দেশ্যে যশল্মীরে লোক প্রেরণ করিলেন।

দেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ।

প্রার্থনা

১

হরি!
কি আছে আমারে আর,
তোমায় করিতে দান,
আমারি তুমি যে সব,
জানি সার ভগবান।

২

আমারি তরেতে তুমি
নিয়ত ভাবিয়া সারা,
আমারি সুখের তরে,
তুমি যে আপনাহারা!

৩

ডাকিনা তোমারে কভু
রহ তবু কাছে কাছে;
অপূর্ব্ব এ ভালবাসা
কোথা কি এমন আছে?

৪

ভালবাসা নারি দিতে,
তবু তুমি ভালবাস;
আঁধার এ হৃদি মাঝে,
নিরন্তর সুপ্রকাশ;

৫

অতি দীন দুঃখী আমি
জগতে মিলেনা ঠাই!
তোমারে দেখিনা তবু
তব কোলে সুখ পাই।

৬

দুরবল যবে হিয়া
অবসন্ন হয় প্রাণ,
তোমারি অনন্ত শক্তি
আনন্দে করহ দান!

৭

জগতে চেনেনা কেহ,
কেহ নাহি ভালবাসে,
তুমি কি ভুলিতে পার
চিনিয়া রেখেছ দাসে !

৮

যখন যেখানে যাই,
শত নদী ব্যবধান,
রহ তুমি কাছে কাছে,
বিপদে করিতে ত্রাণ !

৯

ব্যথিতেরে শান্তি দিতে,
মুছাইতে অশ্রুধার,
তোমা বিনা এ জগতে,
কেবা প্রভু আছে আর ?

১০

তুমিত রেখেছ চোখে,
তবু বলি চোখে রেখ,
তুমিত দেখিছ নীতি
তবু বলি দে'খ দে'খ।

১১

ভালবাস যেই রূপে,
শিখাইয়া দেও তাই,
তোমারে (ও) এমনি করে,
যেন বাসিবারে পাই !

১২

তুমিত পৃথক নহ,—
যেন এক হ'য়ে রই,
বারে কও যেন মনে
নাহি হয় "তুমি কই ?"

১৩

তোমার প্রেমের নদী
এ হৃদয়ে যেন বয়,
তোমারি অনন্ত ছায়া
হেরি যেন বিশ্বময়!

১৪

কাঁদিলে তোমারি পায়
হাসিলে তোমারি হাসি ;
এক হয়ে তুমি আমি
যেন প্রভু ভালবাসি !

শ্রীকৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী,
যশাই।

সমালোচনা।

জন্মভূমি—৯ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

অনেক দিন হইল আমরা এই এক খানি মাত্র জন্মভূমি সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলিলাম। অনবধান বশতঃ এত দিন ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। "জন্মভূমি" এখন আর "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয় না। নূতন স্থান হইতে, নূতন উৎসাহে, নূতন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। এই সংখ্যায় অনেক

সুবিজ্ঞ লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভরসা করি "জন্মভূমি" ইহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এ সংখ্যা দেখিয়াত আমাদের অনেকটা আশা হইয়াছে।

প্রয়াস—২য় বর্ষ, ডিসেম্বর।

পূর্ব্বের ন্যায় এ সংখ্যার প্রয়াসের প্রবন্ধগুলি সুলিখিত ও সুমিষ্ট। তবে এ সংখ্যার "অধিকারতত্ত্ব" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শ্রীযুক্ত ধীরাজকৃষ্ণ সোম এই প্রবন্ধ তাঁহার নিজের লেখা বলিয়া "প্রয়াস" সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্পাদকও তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, ঐ প্রবন্ধ ধীরাজ বাবুর আদৌ লেখা নহে। "বীরভূমির" বর্ত্তমান সম্পাদক কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে সাওতাল পরগণা মলুটী গ্রাম হইতে প্রকাশিত "ধরণী" নামক মাসিক পত্রে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ধীরাজ বাবু হয়ত মনে করিয়াছিলেন, লোকে হয়ত ঐ প্রবন্ধের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি নিজের নাম দিয়া প্রয়াসে উহা প্রকাশিত করেন। যাহা হউক, সাহিত্যে এরূপ জুয়াচুরি বড়ই নিন্দার্হ। এরূপ ়ের ডাকাইত কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার অনেক ক্ষতি হইতেছে। পাঠকগণ, লোকটিকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া এত কথা বলিলাম। তবে লোকটি চোরের মধ্যে সাধু বটে, তিনি প্রবন্ধটি অবিকল নকল করিয়াছেন। এমন কি, যেখানে মুদ্রাকরের দোষে অর্থ দুর্ব্বোধ হইয়াছে, সেখানেও কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হন নাই। "বঙ্গভূমি" সম্পাদক, সেদিন সাহিত্য চোর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি এমন সাধু চোরের কথা কখন শুনিয়াছেন কি?

প্রয়াস—২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে "প্রয়াস" "সাহিত্য-সেবক সমিতির" হস্ত হইতে "প্রয়াস সমিতির" হস্তে আসিয়াছে। এ দুই সংখ্যা কিন্তু পূর্ব্বের মত হয় নাই। ভরসা করি, নূতন পরিচালকগণ "প্রয়াসের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইবেন। প্রয়াস বেশ কাগজ ছিল।

নবপ্রভা—প্রথমখণ্ড, ১ম সংখ্যা।

সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র বাবু বহুদর্শী, সুবিদ্বান ও সুলেখক। সুতরাং আশা-

করা যাইতে পারে যে, "নব্‌প্রভা সাহিত্য-জগতে নবপ্রভা বিকীরণ করিবে। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি মন্দ না হইলে ও কোন কোনটি এত ক্ষুদ্র যে, পাঠ করিয়া কিছু মাত্র তৃপ্তি হয় না। ইহা একটা দোষ। প্রবন্ধগুলি অন্ততঃ এত বড় হওয়া উচিত, যাহাতে একমাস কাল পাঠকের মনে আকাঙ্ক্ষা বজায় থাকে। এক সংখ্যা দেখিয়া বিচার করা যায় না। সেই জন্য আমরা আশা করিতেছি যে, "নবপ্রভা" স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।

মহাজন বন্ধু। মাসিক পত্র। কলিকাতা, বড়বাজার, ১নং চিনি পটী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাহিত্যালোচনার জন্য অনেক মাসিক পত্র আছে। কিন্তু ব্যবসায়িগণের কোনরূপ পত্রিকা ছিল না। আমাদের বীরভূমির পাঠকবর্গের সুপরিচিত রাজকৃষ্ণ বাবু সেই অভাব দূর করিবার জন্য এই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে ব্যাবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এই পত্রের তাহাই উদ্দেশ্য। বলিতে দুঃখ হয়, আমরা ব্যবসা আদৌ বুঝি না। ব্যবসায় কেমন করিয়া অর্থের নিয়োগ করিতে হয়, আমরা তাহা জানি না। আবার স্বদেশজাত দ্রব্যের কেমন করিয়া প্রচার করিতে হয়, সে কৌশলও আমাদের অজ্ঞাত। এই দেখুন না, এখনও ত অনেক শিল্পজাত দেশীয় দ্রব্য রহিয়াছে; আবার নিব, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যও ত আমরা প্রস্তুত করিতেছি, কিন্তু বাজারে কয়টা দেশী নিব পাওয়া যায়, বা দেশীয় কলের কাপড় কয় খান দেখিতে পাওয়া যায়? "মহাজানবন্ধু" যদি ব্যবসায়িগণের মধ্যে একটা একতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি ও দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন করিতে পারেন, তবে বড় উপকার হয়। প্রথম দুই সংখ্যা "মহাজনবন্ধু" দেখিয়া অনেকটা আশা হইয়াছে। লেখা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও মধুর। সহজ কথায় কঠিন বিষয় বুঝাইতে রাজকৃষ্ণ বাবু সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য ভরসা হইতেছে, রাজকৃষ্ণ বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা "মহাজনবন্ধু" দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে।

অমৃত তুসনিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এবে সুন যুনিত যুক্ম পদ্ম কোঠার সিমা।
ক্রমে ২ কহি যেই সভার মহিমা॥
ভবভয়ভঞ্জন ভুগ যে করে ভজন।
সাধকসিদ্ধ সেই জন জিনে ত্রিভুবন॥
পূর্ব্বে কহিঞাছি পদ্ম কুঠা লয় হয়।
যুনিত যুক্ম দুই তাহে সদা বিলসয়॥
বৈনিক যুসন্মা নাড়ী সম গুণ ধরে।
যুসন্মাতে যুনিত পদ্ম বৈনিকে যুক্ম তেজকরে॥
একৈস হাত সতর য়ঙ্গুলি প্রমান নাড়ি যুন।
পাকে পাকে দেহ মধ্যে ইহার ভ্রমণ॥
দুই পাক মুল স্থানে গুহ্য দেস হয়।
পরে পাক বাম ভিতে ত[illegible]দ্ধ যায়॥
কুমদ বৈনিক.কংকা নামে নামে নাড়ি।
ইড়া পিঙ্গল দুই উঠে মুল পদ্ম ছাড়ি॥
এই পঞ্চ নাড়ি পিষ্টগত উদ্ধ যায়।
বৈনিক বেষ্টিত পঞ্চ জানহ নিশ্চয়॥
একান্ন গিরাতে বৈনিক পিষ্টগত উঠে।
এক চল্লিস গিরা তার কক্ষ্যমূল হেটে॥
দুই বাহু দুই গিরা ললিতে পাক তিন।
কুন্তলেজে দুই দুই ললাটে প্রবিন॥
এই নাড়িগত যুক্ম ব্যাপে সর্ব্বস্থান।
স্বরির মস্তক আর পাদ নিরূপন॥
এবে কহি স্থিতি গতি তাহার জেমন।
বিস্তারিঞা কহি এবে যুন দিয়া মন॥
বাম কক্ষ্য হেটে এক কুমুদ কীলকা।
যুসম্মা নাড়ির দেখ[illegible]সে তাহা সিকা॥

সেই কলি মধ্যে স্থিতি বিন্দু বাস করে।
যুনিত আশ্রয় করি সর্ব্বস্থাণ ফেরে ॥
কখন মস্তকে জায় কখন গুহ্য দেশ।
কখন পায়েতে জায় কখন পদ্মেতে প্রবেশ ॥
এই মত সর্ব্বাঙ্গেতে ফিরএ ব্যপিঞা।
মস্তকে কর[illegible]াস পদ্ম মধ্যে জাঞা ॥
ছয় দণ্ড স্থিতি করি নামে ভুরু দেসে।
পাঁচ দণ্ড তোথা থাকি জায় চক্ষু পাসে ॥
তথা তিন দণ্ড থাকি পুণরুপি চলে।
তিন দণ্ড স্থিতি করে জাঞা কর্ন্ন মুলে ॥
তদপরে অধরেতে গুণমন্ত্র হঞা।
সেতপদ্ম পাসে রহে তিন দণ্ড জাঞা ॥
তদপরে নামে মন্দ ২ গতি করি।
মুলপদ্ম পিষ্টে রহে দুই দণ্ড ধরি ॥
সেই স্থান ছাড়ি পুন চলে য়ধমুখে।
উরু দেসে করি [illegible] তিন দণ্ড থাকে ॥
তবে চলে মন্দগতি শিঘ্র গতি হঞা।
দুই দণ্ড বাস বিন্ধ অঙ্গুলিতে জাঞা ॥
পুণ এই মত উদ্ধ উঠে পুনর্ব্বার ॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত হয় লোমে লোমে আর ॥
এই মত যুনিত পদ্ম মধ্যে করে স্থিতি।
দণ্ড পল পদ্ম কুঠা জাঞা করে স্থিতি ॥
সেই দুই পুরুষ নারি জ্যুতির্ম্ময় হয়।
কাম কিড়া রসে দুহে নিরন্তর রয় ॥
এই দুই নির্ত্ত দেহে কিসর কিসরি।
মনের গোচর নহে অন্যে কিবা করি ॥
চন্দ্র যুর্য্যের গতি নাহি না চলে পবণ।
ব্রাহ্মণ গোচর নহে এহি নিরুপণ ॥

ক্রমশঃ

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ]　　মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৭　　[৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার-
মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে
বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে,
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা　　　এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা ।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] মাঘ। [৪র্থ সংখ্যা।

রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

অর্দ্ধ ধরিত্রীর অধীশ্বরী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া, এই নশ্বর জগতের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সুখময় নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে সমগ্র পৃথিবী ঘোর বিষাদ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে; তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের সামান্য কুটীরবাসী প্রজা হইতে, ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি পর্য্যন্ত সকলেই মাতৃহীন হইয়া রোদন করিতেছে। কত মহামহিমান্বিত সম্রাট্ অলৌকিক প্রতিভাবলে, কত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, জগতের ইতিহাসে স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার ন্যায়, কেহই প্রজার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কেহই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইবার সময় তাঁহার ন্যায় সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে কাঁদাইয়া যাইতে পারেন নাই। যতদিন এ জগতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন মানব সমাজে রাজা প্রজা সম্বন্ধ আদৃত হইবে, ততদিন ভিক্টোরিয়া প্রজার হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন। অলৌকিক গুণের অধিকারী না হইলে কাহারও এমন সৌভাগ্য হয় না।

ভিক্টোরিয়া অলৌকিক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। পূতসলিলা জাহ্নবী যেমন ভগবানের শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া ধরাধামে অমৃতপ্রবাহ ঢালিয়া দিতেছেন, রাজরাজেশ্বরীর স্নেহ-জাহ্নবীও সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া অগণ্য নরনারীর প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। হিমগিরি যেরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভূধ্বংসকারী কম্পন নীরবে সহ্য করিয়া, অচল অটলভাবে স্বীয় তুঙ্গ শৃঙ্গ

উত্তোলন করিয়া মানদণ্ডের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, রাজরাজেশ্বরীও তদ্রূপ, কত রাজনৈতিক ঝটিকার প্রবল আঘাতে অবিচলিত থাকিয়া, কত দৈবী ও মানুষী আপদের নির্ম্মম কম্পনে স্থির থাকিয়া, তাঁহার এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের মানদণ্ডরূপে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে রাজোচিত গুণাবলীর সহিত রমণীসুলভ কোমলতার মধুর সম্মিলন হইয়াছিল। যিনি রাজপদ গ্রহণ করিয়া একজন অপরাধীরও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন নাই, তাঁহারা মহনীয় চরিত্র পৃথিবীর প্রত্যেক নৃপতির হৃদয়কে মহিমান্বিত করিবে; যিনি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও সর্ব্বদা দাসীভাবে স্বামী পরিচর্য্যায় শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন, তাঁহার এই পতিভক্তি পাশ্চাত্য নারীগণের হৃদয়ে পবিত্র জ্যোঃতি প্রদান করিবে; যিনি দুর্ব্বোধ্য নিয়তি প্রভাবে স্বামিধনে বঞ্চিতা হইয়া, আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে চিরদিনই পূজা করিবে; এবং যাঁহার ঈশ্বরপ্রেম জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে অন্তঃপ্রবাহিত, তিনি অপ্সরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া অনন্তকাল পবিত্র সুখের লীলাভূমি অমরাবতীতে বিহার করিবেন।

আর আমরা ভারতবাসী, মহারাণীর স্বর্গারোহণে আমাদের যে দুঃখ, তাহা অপরে বুঝিবে না।

ভারতবাসী যাঁহাকে চিরদিন দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, 'ভারত-মাতা' বলিয়া যাঁহার প্রতি চিরদিনই মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে, যাঁহার শাসনে বিপ্লবক্ষুব্ধ ভারত নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, ভারত-সন্তান যাঁহার রাজত্বে সর্ব্বাপদ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহার বিয়োগে যে দুঃখ, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

তবে ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, যে যতদিন ভারতবাসী ভগবান রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজারূপে হৃদয়সিংহাসনে পূজা করিবে, ততদিন ভিক্টোরিয়াও সেই সিংহাসনের এক পার্শ্বে স্থান পাইবেন; যতদিন আর্য্য সন্তান সীতা সাবিত্রীর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ততদিন ভিক্টোরিয়ার নামও এই দুই রমণী রত্নের নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে।

আমরা ক্রমে এই অলোকসামান্তা মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

ঐতিহাসিক ছড়া-সংগ্রহ।

গ্রাম্য কবির গ্রাম্য ভাষায় বিরচিত ছড়াগুলির স্বভাবতঃই এমনই একটী মোহিনীশক্তি আছে,যাহাতে আমরা সকলেই সেই গুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকি এবং অতি আগ্রহের সহিত উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। কৃত্রিম অপেক্ষা স্বাভাবিকের প্রতি চিরদিনই মনের এমনই প্রিয় আকর্ষণ ও নিত্য-লালসা।

পাখী, অসম্বৃত ভাবে আপন প্রাণে আকাশে গাহিয়া চলিয়া যায়, কাহারও অপেক্ষা করে না, অথচ তাহাতেই সকলেই মুগ্ধ ও প্রফুল্লিত। ছড়া, কবির সরল প্রাণের খোলা গান—সকলকে মুগ্ধ না করিয়া ছাড়ে না।

সুনিপুন চিত্রকরের, প্রতি বর্ণ-সম্পাতে ও তুলিকা সঞ্চালনে যেমন চিত্রটি স্ফুটতর হইয়া ক্রমশঃ সজীব হইয়া উঠে, তেমনই ছড়ার প্রতি ছত্রে সহজ ও সলীল বর্ণনামাধুর্য্যে, বর্ণিত বিষয়ের সমগ্র ছবিটি যেন আমাদের সমক্ষে যথাযথ, গতিশীল, সুচঞ্চল ও জীবন্তস্বরূপ উপনীত করিয়া দেয়। ছড়া মাত্রেরই ইহা সাধারণ গুণ।

এই গুণ আছে বলিয়াই ইহা কাব্যামোদী ব্যতীত ঐতিহাসিকগণেরও পরম আদরের বস্তু—আরাধ্য ধন। প্রবাদ, ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতায়ন হইয়া এমনই অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, সে বর্ণনায় ঐতিহাসিকের কিছু খুজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই ছড়া গুলি, অধিকাংশ স্থলেই, কবির প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের নিখুৎ ফটো। পাঠকগণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছড়াগুলি পাঠ করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

এই সুদীর্ঘ ছড়াগুলি আবার প্রায়ই লোকমুখে রক্ষিত আছে—স্মৃতির উপর একমাত্র নির্ভর। সুতরাং এ বিষয়ে লোকের আর আগ্রহাতিশয্য না থাকিলে যে, অচিরে এই সকল ছড়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, সে ক্ষতি আর পূরণ হইবে কি করিয়া?

এই নিমিত্ত আমরা মূল ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের সৌকর্য্যার্থ, 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' প্রভৃতি প্রবন্ধের ন্যায় এই "ঐতিহাসিক ছড়া-সংগ্রহ" প্রবন্ধের অবতারণা

করিলাম। ইহাতে এতদঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী বন্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে বিরচিত, অপ্রকাশিত, ছড়া সকল সংগৃহীত হইতে থাকিবে। একই বিষয়ে দুইজন কবির ছড়া প্রচলিত রহিলে আমরা উভয়ই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব। ছড়াগুলির অধিকাংশ স্থলেই ছন্দের অক্ষর সংখ্যার অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে। অক্ষর সংখ্যা অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য বেশী। আমরা কিন্তু যথাযথ প্রকাশিত করিলাম, বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি নাই। কারণ, এই ছড়াগুলি যে প্রাদেশিক শব্দ সঙ্কলনে বিশেষ উপকারে লাগিবে, তাহা বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। *

এই ছড়া-সংগ্রহ কার্য্য সামান্য হইলেও আয়াসসাধ্য—বিশেষতঃ ক্ষুদ্রশক্তি আমার পক্ষে। সাধারণের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে আরব্ধ কার্য্যে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারি। কেহ কি দয়া করিবেন না?

১২৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে লিখিত,

ছড়া।

রচয়িতা :—শ্রীরাইকৃষ্ণ দাস।

শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে
সুভ বাবুর (১) হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে।
বেটারা কোক্ ছাড়িল জড় হইল হাজার হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হ'ল ভার।
হল সব দুর্ভাবনা রাড় কান্দনা সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।
বলে ভাই, রাখব কোথা হেথা সেথা এই কথা শুনি
রাখতে মুলুক সলা সুলুক ভাবতেছে কোম্পানি।

---

* আমরা এতদঞ্চলে প্রচলিত বহুসংখ্যক (চারিশতেরও অধিক) প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি, হয়ত ভবিষ্যতে আরও করিতে পারিব। এই সকল বিষয়, ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের "ভাষাতত্ত্বে" আলোচ্য।

(১) 'সুভবাবু' বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের নেতা; (সুবাদারের অপভ্রংশ)।

বেটাদের শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীরে
জিনীষ ছেড়ে পলাওনা ভাই সবাই থেক ঘরে।
আমাদের আছে গোরা সঙ্গীন চড়া জামা জোড়া গায়
বন্দুকেতে গুলি পোরা তুড়ুক্ সোয়ার তায়।
বেটারা থাকে কোথা সত্যকথা সুধায় তোমাদেরে
কেহ বলে দেখে এলাম ময়ুরাক্ষীর ধারে।
আছে সব জড় হয়ে পূর্ব্ব মুয়ে তীর মারিছে গাছে
কত শত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তীরে ফলা বনাতে বরাত মতে যখন যেমন কয়
হাতে হাতে যোগায় ফলি পাছে টান হয়।
বেটাদের পোষাক চড়া কপ্নী পরা লইতে (২) বেড়া বুকে
ভাড়ের উপর পূজা করে কোক্ ছাড়িছে মুখে।
আগেতে লাগরা পিটে কাটে ছাটে মদে মাসে ভরা
প্রথড়ে বাঁসকুলি দিয়ে পাড়লো গায়ে ডেরা।
দেখে সব লোক পলাছে টোকাপোছে উয়ে লটাই খান
কেহ বলে রাহ্মা রইল বড় মাছের থান।
বলে ভাই পালা পালা একি জ্বালা করে কলরব
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্ত মুখো সব।
আর কি হাকিম মানে বনে বনে রাস্তা পেলে সোজা
সাদিপুরে লুট্‌লে গিয়ে কাপড়ের বোজা
যথা উচিত, বোচ্‌কাবেন্ধে লিল কান্দে যত মনে ছিল
রাতারাতি হাতাহাতি কালিষ্টেকে গেল।
সকলি এম্নিধারা দেয় লাগরা অহর্নিশি পিটে
খাবার বেলায় সাঁওতালদের মেয়ে ছেলে ষোটে।
বলে ভাই রাজা হব টাকা পাব করিয়া মন্ত্রণা
দুদিন বাদে পোড়াইল গিয়া নাঙ্গলের থানা।
এই কথাশুনে সিপাইগণে বন্দুক নিল হাতে
দারগা মুন্সীর সহিত দেখা হইল পথে।

(২) 'লইতে —দেশীয় সুত্রে নির্ম্মিত মোটা কাপড়: 'ঘর বোনা কাপড়'।

মনেতে ভয় পেয়ে পশ্চিম মুখে অমি গেল ফিরে
পড়ের পুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে।
জত সব জেলের গোলা ভাঙ্গি তালা সব বা'র করিল
মড়াপেটে চড়া দিয়া খিচুন বে লইল।
তখন সিপাইয়েরা সঙ্গীনচড়া কাপ্তান সহিত
নদীর উপান্তে আসি হইল উপনীত।
জত সব সিপাইগণে ভাবে মনে হায় সার সার
দেখে শুনে ময়ুরাক্ষী উভয়ে না হয় পার।
তীর বর্শা তৈয়ার আছে আপন সাজে রণ নাইথ বাজে
নদীরধারে সাঁওতালেরা নাগরা বাজায় নাচে।
সেখানে সাধ্য কি পারাবার দুকুল বহে বান
হাতেতে কিরিচ ধরে দেখিছে কাপ্তান।
দেখিয়া বহুত সেনা কি মন্ত্রণা করে দুই জনে
বন্দুক তৈয়ার রাখ কহে সিপাইগণে।
দণ্ড ৪।৬ পরে কয় হাবিলদারে সুবাদারেব প্রতি
নির্ণয় করিতে দুরবীন্ আন শীঘ্র গতি।
বলে উঠলো গয়ে হাওদা মাঝে নয়নে দুরবীন্
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সাঁওতাল ক্রোশ দুই তিন।
কিছু দূর পিছে হাট্ ব'লে ঝাট্ সাহেব গেল চ'লে
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পালায় পালায় ব'লে।
করিয়া বহু দম্ফ দিল ঝম্ফ পড়িল নদীর জলে
সাঁতারিয়া পার হৈল হাজার সাঁওতালে।
বলে সব মার মার ধর ধর এই মাত্র রব
আজ সিউড়ী জেলা লুটবোগিয়ে করে পরাভব।
আব সব জেহালখানা দিব থানা মুক্ত করবো চোরে
সুভো বাবু রাজা হবেন জজ সাহেবকে মেরে।
আমরা ঘুচবো মাঝি কাজের কাজি মহর করবো বসে
কৃষ্ণগৌর দোকান ভেঙ্গে সরাপ্ খাব ক'সে।
বলে শীঘ্রতর আগুধর আর বিলম্ব কেনে
কর্ণ্ণ ফাঁকে পড়লো সাঁওতাল সিপায়ের মাঝখানে।

বেটারা তুচ্ছজাতি নাইখ বুদ্ধি কিবা জানে টের
আচম্বিত হুকুম হইল বলিয়া ‘কায়ের’।
আলি হুকুম পেয়ে সিপাই যেয়ে বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাশ পঞ্চাশ গোলি মারে এক কালে।
যেমন তারা খসে আসেপাশে তেমনি গোলি ছুটে
পৃষ্ঠেতে বাজিয়া কারু পার হৈল পেটে।
অন্য সাঁওতাল যত কত শত পলাইয়া গেল
কুড়ি আট নয় সাঁওতাল তারা সেই দিনেতে মোল।
তখন পলায় সাঁওতাল করিয়া বিকল পিছে নাহি চায়
স’নাথ পাহাড়ে গিয়া সুভকে জানায়।
শুনে সব দুঃখমনে পয় দিমে কৈল একাকার
জঙ্গি হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার।
নাহিক মৃত্যুভয় সদা বয় ধেনুকেতে চড়া
নগর মোকামে গিয়ে বাজায় নাগেড়া।
শুনে সব লোক পালাল বিষম হল ভাবলি পোদ্দার
সৎগোপ গোয়ালা পলায় কান্দে লয়ে ভার।
পলায় সব বুড়া বুড়ি দৌড়াদৌড়ি হাতে লয়ে নড়ি
মুসলমান ফকির পলায় মুখে পাকা দাড়ী।
মুখেতে বলে আল্লা বিস্‌মাল্লা একি বেটাদের তীর
এ বিপদে রক্ষা কর হে সত্যপীর।
বলে প্রাণ জায় হায় হায় কি বিপদ হইল
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মুরগী কোথা গেল।
জত সব মাথায় ঝুড়ি কেঁথা ধুকুড়ী ঊর্দ্ধমুখে ধায়
হোঁজট্‌ খেয়ে পড়ে কেহ গড়াগড়ি যায়।
ঐ সাঁওতাল এল সাঁওতাল কাটলেরে সাঁওতালে
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে।
তখন হর্ষমনে সাঁওতালগণে রাজবাড়ী সেন্দায়
মানুষকাটা পড়লো সে দিন কুড়ি দু আড়াই।
পরে সাঁওতালগণ হৃষ্টমন দেয় টাঙ্গিতে সান
লাও জোড়ে নাড়াবেটাকে দিল বলিদান।

গেল কুম্‌ড়োবাদে সকল কাদে হইল:একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা করিল ছারখার ।
পোড়াইল ধানের গোলা তিল জোল্লা (৩) সরিষা আদি জত
গরু মহিষ ছাগল ভেঁড়া পুড়লো কত শত ।
পূর্ব্ব হনুমান লঙ্কাখান যেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায় ।
ঐ গ্রাম নিবাস সাধুদাস তার সঙ্গে জনা চারি
সিউড়ী আসি জজের কাছে বল্‌ছে বিনয় করি ।
আবৃত প্রাণ বাঁচে না কি মন্ত্রণা কর্‌ছেন হুজুর বসে
ঘরকন্না পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাট্‌লে শেষে ।
শীঘ্র উপায় কর সাঁওতাল ঘরে রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গীর বোটে মুলুক কেটে পতিত করলে বন ।
সাহেব ও সাম্‌লে সিপাইগণে বলয়ে বচন
অতি শীঘ্র যাও তোমরা কর গিয়ে রণ ।
কথা শুনে তখন যত সিপাইগণ বন্দুক হাতে নিল
রাতারাতি সিপাইগণ কুম্‌ড়ো বাদ্‌কে গেল ।
যুদ্ধ যেই মতে বিস্তারিতে হবে বহুক্ষণ
আকাশের চান্দ কোথা ধরয়ে বামন ।
বেটারা ধনুক ধরে তীর মারে করে মার মার
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার
সাহেব হুকুম দিলে 'ফয়ের' বলে শুনে সিপাইগণ
হাজারে হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ ।
অম্‌নি ভাগেড়া হায় পূর্ব্বমুলয় পলাইয়া যায়
পাট্‌জোড় মোকামে আসি নাগেড়া বাজায় ।
নাগেড়ার শব্দ শুনে সর্ব্বজনে পলায় সত্বরে
জনাদশ বাগিড়ে গোয়াল সেই দিনেতে মারে ।
লোকে কি যন্ত্রণা কি লাঞ্ছনা করলেরে সাঁওতালে
কত গর্ভবতী রাস্তায় প্রসবিল ছেলে ।

৩ 'জোলা' জোনারী ; ভুট্টা ।

এমনি সর্ব্বত্তরে লোট করে বেড়ায় সাঁওতাল
মনুষ্য কা কথা দেবতা পলান গোপাল।
ভাণ্ডিরবন ছেড়ে পলান দৌড়ে পূজুরির মাথায়
বীরসিংহরের কালিমায়ের বলিহারি যাই।
বারশ বাষট্টি সাল বর্ষাকাল বানের বড় বৃদ্ধি
আন্ধারপুরে মানুষ কেটে কল্লে গাদা গাদী।
কাট্‌লে বিষ্ণুপুরে হারা তাঁতিরে প্রিয়গুলার মাঠে
বিপন গোপকে তিরিয়ে মার্‌লে পখুরের ঘাটে।
লোটিলে কুলকুড়ী দৌড়াদৌড়ি নাগড়া দেয় শেষে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্লে আখবাড়ীতে এসে।
পুঙ্গাতে দেয় বাড়ী বস্ত্র কাড়ি উলঙ্গ করিয়ে
যাদুমাঝি বেনাপ্‌ ছিল তাই দিল ছাড়িয়ে।
ধরে চল্যা মাঠে পখুর কাটে দাসী গোয়ালিনি
কাটের ভিতরে মাগি হারাল পরাণি।
যত সব সাঁওতালগণে কাটের মোহানে যত মাটী ছিল
ওথাড়িয়া সকল মাটী চাপাইয়া দিল।
পরে ধেনুক ধরে তার উপরে নাচিতে লাগিল
কুল্যাইপুরের ভাঙ্গালেতে সিপাই দেখতে পেল।
অগ্নি কোক্‌ ছাড়িয়ে পশ্চিম মু'য়ে পলাইয়া গেল
আলান চকের নন্দদাসের গরু ঘেরে নিল।
তখন নন্দদাস করে হুতাশ মাথায় ঘা মারে
বলে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আস্‌ব ফিরে।
তখন বস্ত্র ছাড়ি কপ্নি পরি সাঁওতাল সাজিল
চুন গুখান পাতে ভরি কড়্‌ছে গোঁজিল।
হাতে ধনুর্ব্বাণ টাঙ্গীখান কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতালের বুলি জানি এই সাহস করিয়ে।
সাঁওতালের সঙ্গে নানা রঙ্গে কথায় ভুলিয়ে
জল খাওয়ার ছল করি আনিল ছাড়িয়ে।
রাইকৃষ্ণদাসে ভনে সংক্ষেপনে কিছু লেখা হলো
বিস্তার লিখিতে হলে অনেক বাহুল্য।

কায়স্থ কুলে জন্ম মোর রাইকৃষ্ণদাস
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় যে নিবাস।
জেলা বীরভূম তাহে ননী পরগণা
লাটরাম তাহে লাঙ্গলের থানা।
আমি ভাবি মনে সাঁওতালগণে রাখিল যে সুখ্যাতি
যে কিছু লিখিলাম আমি সকলিত সত্যি। ১৬০
কথা মিথ্যা নয় সত্য হয় এই যে বিবরণ
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ।
১২৬২ সাল এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হায় ২৩ শে শ্রাবণে। ১৬৪

শ্রীশিবরতন মিত্র

আমারে ভুলালে কে?

কি ছবি দেখায়ে ভুলালে আমায়,
(শুধু দেখি বদন) চাহিল পরাণ মোর ;
আপনা ভাবিয়ে তুলে দিনু হাতে,
কে জানে সে জন চোর।
এ যে কার মন আমারে দিয়েছে,
চলে না আপন বশে ;
এ যে শুধু কয় আপন কাহিনী,
দুঃখ সুখ নাহি বাসে।
এ পরাণে দেখি কলঙ্কের রেখা,
আমার নির্মল প্রাণ—
অতি যতনেতে পুষিয়া রেখেছি—
আমারে করেছে দান।
আমারে ভুলায়ে বাসায়েছে ভাল,
আপনি বেসেছে বুঝে,
রজত আশায়— ফুলাহার দিয়ে—
পাথরে রহিনু মজে।

জলের পরশে　　শিলা হয় ক্ষয়
মনেতে ধারণা ছিল,
স্নেহের নির্ঝর　　পাশেতে পুষিনু—
পাথর পড়িয়ে গেল।
কণা বালুকায়　　বাড়িবে পাথর,
কে জানে এমন রীতি ;
স্নেহের লিখনি　　বৃথায় সাধিনু
লিখিতে বরণ পাঁতি।
পাষাণের গায়　　লোহার লিখনি
লিখিয়াছে কার নাম ;
এ যে তারি নামে　　বিকাবে পাথর—
আমিও যে বিকালাম।
আমার কোমল　　ফুলের পরাণ
তপত নিশ্বাসে দহে ;
ফুলের লতিকা　　পাষাণে রোপিনু,
সে যে অধরচাপ্ না সহে।
আমার সে ফুলে　　কেবল পড়েছে
আশার চাহনি রেখা ;
আমার হাসিতে　　যে জন হেসেছে,
তারি হাসি আছে লেখা।
তারি হাসি দিয়ে　　তাহারি আশায়
সঁপিব তাহারি করে ;
(এ যে) আপন ভবিয়ে　　তারে না চিনিয়ে
সঁপিয়ে দিয়েছি পরে।
শত কোহিনুরে　　সে হিয়া দিব না,
আমার আনিয়া দে
সেও মোর নয়　　পরের পরাণ
(মিছে) আমারে ভুলালে কে ?

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।

ঘুমের ঘোর।

(১)

যাঁরে ভালবাসি ব'লে
কত লোকে কত বলে,
সুখের স্বপনে তাঁরি রহিয়াছি আজি ভোর।
জাগাওনা কেহ মোরে ভেঙ্গনা ঘুমের ঘোর।

(২)

যাঁহার বাঁশীর স্বরে
যমুনা উথলি প'ড়ে,
উর্ম্মিরূপী-প্রেম-বাহু করেছিল উত্তোলন;
তাঁহারি প্রেমেতে ডু'বে ঘুমে আছি অচেতন।

(৩)

সপ্তমে উঠায়ে তান,
গাহিয়ে বাঁশীর গান,
প্রেমে মাতোয়ারা যে গো করেছিল গোপীগণ,
তাঁহারি বাঁশীর স্বরে কেড়ে নিছে প্রাণ মন।

(৪)

যাঁহার প্রণয় আশে
চাঁদ হাসে, রবি হাসে,
গগনের কোলে তারা, হাসিয়ে হাসিয়ে ভোর,
সুখের স্বপনে তাঁরি, ভেঙ্গনা ঘুমের ঘোর।

(৫)

যাঁর মৃদু-প্রেম-শ্বাসে
ফুল ফোটে চারি পাশে,
শিশিরে নোলক প'রি, পাতায় পাতায় কত,
প্রণয়ে হতাশ হ'য়ে ফেলে অশ্রুবারি শত;

(৬)
কুসুমে উলঙ্গ করি
বসন তুলিয়ে ধরি,
রসিক পবন তার লুটিয়ে সৌরভ-ভার,
যাঁর প্রেমে দশ দিকে বিতরে অমৃতধার।

(৭)
অযুত কুসুম পরে,
মধুপ মধুর স্বরে
যাঁর প্রেম গীত গায় গুণ্‌গুণ্‌ রব করি,
ঘুমিয়ে রয়েছি তাঁরি প্রেমডালি বুকে ভরি।

(৮)
বসন্তের সনে পিক
যাঁর প্রেমে দশ দিক্
প্রেমের তুফান তোলে সুমধুর কলস্বরে,
ঘুমিয়ে রয়েছি তাঁরি প্রেমসিন্ধু বুকে ভ'রে।

(৯)
যাঁহার প্রেমের গীতি,
গায় দিন, গায় রাতি,
সুখের স্বপনে তাঁ'রি রহিয়াছি আজি ভোর,
জাগাও না কেহ কেহ মোরে, ভেঙ্গ না ঘুমের ঘোর।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

জীবনী সংগ্রহ।

(৬)

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই মহাপুরুষ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুড়া নামক স্থানে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বেলা ৮॥০ টার সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যু হয়, সন ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ, রবিবার, রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতাস্থ ৮ নং মাণিকতলার বাটীতে। এই ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান মহাপুরুষের নিকট বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সাহিত্য অনেকাংশে ঋণী।

ইনি পারস্য, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ইংরেজি ভাষা খুব ভালরকম জানিতেন, ইহা ভিন্ন গ্রীক্, লাটিন, ফরাসী এবং জার্ম্মণ ভাষাতেও কতকটা তাঁহার বুৎপত্তি ছিল। ইহা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে। এরূপ ভাষা জানা লোক আজ কাল বাঙ্গালীর মধ্যে আরো পাওয়া যায় বটে এবং পরিণামে আরো পাওয়া যাইবে বটে; কিন্তু রাজেন্দ্রলাল কেবল ভাষাগুলি "ভাসা" "ভাসা" ভাবে শিক্ষা করেন নাই। তিনি যে সকল ভাষা আয়ত্ব করিয়াছিলেন, সেই সকল ভাষাতে বক্তৃতা এবং পুস্তক পত্রিকা লিখিয়া গিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল একজন জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ইহা ইয়োরোপখণ্ডের বিদ্যাভিমানী বিদেশী পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের জীবনী যিনি শুনিবেন বা আলোচনা করিবেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে। যিনি রাজা রাজেন্দ্রলালের জীবনী অনুকরণ করিবেন, তাঁহার জীবন অমরত্ব লাভ করিবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, এহেন মহাপুরুষের একখানি বৃহৎ জীবনবৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে কেহই বাহির করিলেন না। কয়েক বৎসর হইল, শুনিয়াছিলাম, তাঁহার কোন আত্মীয় এ কার্য্যের ভার লইয়াছেন। "রাজা রাজেন্দ্রলালের সুবিস্তৃত জীবনী সমালোচনা" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু কৈ আর ত তাহার কিছুই দেখি না।

যাহা হউক, আমাদের যাহা ক্ষমতা, সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। তিনি নিজে যে বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই,—

বংশাবলী।

কালিদাস মিত্রের এক পুত্র, নাম শ্রীধর। শ্রীধরের পুত্র সুক্তি। সুক্তিরও এক পুত্র, নাম সৌভরি। সৌভরির পুত্রের নাম হরি। হরির এক পুত্রের নাম সোম। সোমের পুত্র কেশব। কেশবের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের দুই পুত্র, ধুঁই ও গুঁই। তন্মধ্যে গুঁয়ের বংশের অনুসন্ধান হয় নাই। ধুঁয়ের তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তিন পুত্রের নাম যথা, নিশাপতি, মকরন্দ এবং চক্রপাণি।

চক্রপাণির পুত্র বিভাকর। বিভাকরের পুত্র কুবির। কুবিরের

পুত্র লক্ষ্মীপতি ; লক্ষ্মীপতির পুত্রের নাম শ্রীরাম ; শ্রীরামের তিন পুত্র, কিন্তু দুইটীর নাম পাওয়া যায় নাই, অপরটীর নাম সত্যবান।

সত্যবানের তিন পুত্র যথা, বল্লভ, হৃদয় এবং রাজীব। রাজীবের পাঁচ পুত্র যথা, শিব, ভবানী (ইনি দিগম্বর মিত্রের পূর্ব্ব পুরুষ) রূপ, গৌরী এবং বিষ্ণু। ইহাঁদের মধ্যে অন্যান্যের বংশ পরিত্যাগ করিয়া, শিবচন্দ্রের বংশ হইতে রাজা রাজেন্দ্রলালের পূর্ব্বপুরুষগণ আসিতেছেন।

শিবচন্দ্রের তিন পুত্র, তাঁহাদের নাম রামচন্দ্র, রামেশ্বর এবং রামভদ্র। রামচন্দ্রের আট পুত্র, তন্মধ্যে অপরগুলির নাম অপ্রকাশিত, কেবল এক পুত্রের নাম আছে, অযোধ্যারাম।

অযোধ্যারামের পুত্র কৃপারাম। কৃপারামের চারি পুত্র যথা, পীতাম্বর, কৃষ্ণচন্দ্র, গোরাচাঁদ এবং লালচাঁদ। ইহাঁর মধ্যে পীতাম্বরের সাত পুত্র, যথা, বৃন্দাবন, হরলাল, গোপীমোহন, হরিমোহন; ধরণীধর, বৈদ্যনাথ এবং বনমালী।

তৎপরে, বৃন্দাবনের একপুত্র নাম জনমেজয়। জনমেজয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতার নাম। জনমেজয়ের ছয় পুত্র অর্থাৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুরেরা ছয় ভ্রাতা ছিলেন।

বংশাবলীর নিবাস নির্ণয়।

প্রবাদ এইরূপ যে, বঙ্গের রাজা আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচটী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বা আনিয়াছিলেন, কালিদাস তাঁহাদের অন্যতম অনুচর ছিলেন। অর্থাৎ সেই পাঁচটী ব্রাহ্মণের পাঁচটী কায়স্থ ভৃত্যের মধ্যে কালিদাস একটি ভৃত্য ছিলেন।

৺কালিদাসের নিবাস যে কোথায় ছিল, তাহার সন্ধান হয় নাই। কালিদাসের পোনের পুরুষ পরে সত্যবান মিত্রের নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে ছিল, তাহা জানা গিয়াছে।

বরিসা গ্রামে মিত্রবংশ সত্যবান মিত্র হইতে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন, এই জন্য "বরিসার মিত্র গোষ্ঠী" চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তৎপরে বরিসা হইতে ইহাঁদের কেহ কেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে আসিয়া বাস করেন। পরন্তু এ স্থলেও ইহাঁদের বংশাবলী রাবণের বংশের মত হইয়া উঠে। তাঁহারা "কোন্নগরের মিত্র" বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছেন, তৎপরে কোন্নগরের মিত্র-পরিবারের

মধ্যে অনেকে কলিকাতার অন্তর্গত গোবিন্দপুর (এখন এস্থানে কেল্লা) তাহার পর মেছুয়া বাজার, এবং সর্ব্বশেষে কেহ কেহ সহরতলী সুড়ায় গিয়া বাস করেন, পরন্তু ইহঁাদের মধ্যে কেহ কেহ ঝামাপুকুরেও বাস করিয়াছিলেন, ৺ রাজা দিগম্বের মিত্রের পরিবারেরাত ঝামাপুকুরের মিত্রদিগের কীর্ত্তিমান বংশধর।

বংশাবলীর মর্য্যাদা নির্ণয়।

৺কালিদাস মিত্রের আঠারো পুরুষ পরে ৺রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে দাওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু ইহঁার পুত্র অযোধ্যারাম মিত্র মহাশয়ও পিতার কার্য্য পাইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর, অযোধ্যারামকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। অযোধ্যারামের পুত্র,—

৺ পীতাম্বর মিত্র।

এই মহাপুরুষ ১৬৬৯ শকের ৩১ শে আষাঢ়, মঙ্গলবার দিবস জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি দিল্লিসম্রাটের সেনাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম ভাগ্যের কথা নহে। যঁাহারা বলেন, বাঙ্গালীর মধ্যে যোদ্ধা নাই, তাঁহারা এই মহাবীরের বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া দেখুন। একে দিল্লীর সম্রাট, তাহাতে সে সময়ের কত মুসলমান বীরের সেনানায়ক হওয়া, বাঙ্গালীর ভাগ্যে কম কথা কি? ইহঁার অধিনায়কত্বে দশ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। পরন্তু ইনি সম্রাটের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং দোয়ারের অন্তর্গত কড়া জেলা জাইগীর প্রাপ্ত হয়েন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ৺ বারাণসী ধামে চেতসিংহের সময়ে যখন লর্ড পামার রামনগর আক্রমণ করেন, তখন রাজা পীতাম্বর উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ইহঁার সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের খুব আলাপ ছিল। রাজা পিতাম্বর তাঁহার কাছে ৯ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছিলেন। ইনি ১৭৮৭ কিম্বা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট হইতে সামরিক কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শেষ জীবনে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

কাটাকাটির কার্য্য যুদ্ধবিদ্যা যে জীবনের এক মহাব্রত ছিল, সেই জীবন কি যাদুমন্ত্র বলে, (বলিতে পারি না, কাটাকাটির সংস্কার গিয়াছিল কি না!) শেষকালে, কাটাকাটি শক্তি ছাড়িয়া, বৈষ্ণব "বানাইয়া" গেল!!

মিত্র-পরিবারেরা কলিকাতার মেছুয়াবাজারে ছিলেন। ইনি সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, প্রথম মেছুয়াবাজারে উপনীত হয়েন। তখন মেছুয়াবাজারে মিত্রদের বাড়ীর নাম ছিল "মিত্র পারিবারিক বাড়ী।" এই বাটী তাঁহাকে বৈষ্ণব হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। এখন যেমন ব্রাহ্ম হইলে হিন্দুর জাতি যায়। তখন তেমনি বৈষ্ণব হইলে হিন্দুর জাতি যাইত। অবশ্য, এ বৈষ্ণব আমাদের শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব নহেন! ইহা দল বিশেষের ধর্ম্ম। যাহা হউক, ইনি বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সুড়ার বাগানে বাস করেন, এবং ক্রমে তথায় বাড়ী ঘর করিয়া "সুড়ার রাজা" হইলেন। ইঁহার পুত্রের নাম,—

৺ বৃন্দাবন মিত্র।

রাজা পীতাম্বর মিত্রের সময়, সুড়ার রাজবাটীর যে শ্রী হইয়াছিল, ইহার দ্বারা রাজবাটীর সেই শ্রী থাকিলেও কিন্তু ইনি কতকগুলি বিষয় নষ্ট করিয়াছিলেন, পরের জন্য জামিন হইতে গিয়া দুইবার ইহাকে প্রায় ১৮।১৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইনি মিতব্যয়ী ছিলেন না। পরন্তু ইহাঁর সময় মহারাষ্ট্রের যুদ্ধে সম্রাট প্রদত্ত কড়ার জায়গীর নষ্ট হইয়া যায়। কড়ার জায়গীরের বাৎসরিক আয় ছিল ২লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ইহাও রাজা বৃন্দাবনের গ্রহবৈগুণ্যে নষ্ট হয়। ইনি সাহিত্যপ্রিয় লোক ছিলেন। রাজা পীতাম্বরের সময়ে যুদ্ধবিদ্যা ছিল, ইহঁার সময় কেবল বিদ্যা আসিল, যুদ্ধকার্য্য এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রাজা বৃন্দাবনের সময় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হয়। এই সকল পুঁথির মধ্যে এখনও কতক কতক সুড়ার রাজবাড়ীতে পাওয়া যায়।

গোলাপ ফুলের কুড়ীটী একটী সবুজ বর্ণের ঠুলীর মধ্যে লুক্কাইত থাকে, ঐ ঠুলীকে ভাল কথায় বলে "ফুলের বৃত্তি"। উহার ভিতর পুষ্পের রঞ্জিত পত্র বা পাপড়ী প্রথম লুক্কাইত থাকে, তৎপরে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, উক্ত বৃত্তি রঞ্জিত পত্র বা পাপড়ীর নিম্নে লাগিয়া থাকে। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজা বৃন্দাবন হইলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ এবং ইহাঁর সময় হইতেই রাজসংসারে লক্ষ্মী গিয়া সরস্বতীর আগমন হয়।

অতএব রাজা বৃন্দাবনের বিদ্যানুরাগ যেন মিত্র-পরিবারের বিদ্যার বৃন্ত-স্বরূপ। ইহাঁর পুত্র রাজা জনমেজয় যেন বিদ্যার রঞ্জিত পত্র বা পাপ্‌ড়ী। পরন্তু পাপড়ী খসিয়া গেলেই "ফল।" অতএব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেন মিত্র-পরিবারের বিদ্যার ফল! ইনি টাকার জন্য কটকের কালেক্টরীতে দাওয়ান হইয়াছিলেন।

রাজা জনমেজয়।

ইনি পারস্য এবং সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত ভাষার গল্প এবং পারস্য ভাষার পদ্য বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণের সূচী এবং বর্ণানুসারে ভাগবত পুরাণের নির্ঘণ্ট বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইনিই আমাদের রাজা রাজেন্দ্রলালের পিতা।

রাজা রাজেন্দ্রলাল ইহাঁর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। রাজা জনমেজয়ের সময় শুড়ার রাজাদের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ ইহাঁর দ্বারা ধনক্ষয় বা প্রচুর আয় বৃদ্ধি হয় নাই। যাহা হউক, এইবার, রাজা রাজেন্দ্রলালের,—

বাল্যশিক্ষার

পরিচয় কথা, বালক রাজেন্দ্রলাল পঞ্চম বৎসরে হস্তে খড়ি দিয়া, কলিকাতার বড়বাজারে রাজা বৈদ্যনাথের বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া বাঙ্গালা এবং পারস্য ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে, পাথুরেঘাটাস্থ ক্ষেম বসুর ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। এ স্কুলের অস্তিত্ব এখন নাই। একাদশ বর্ষ বয়সে ইনি শঙ্কর মিত্রের বাড়ীতে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে ভর্ত্তি হন। তৎপরে ম্যালেরিয়া জ্বরের শিবর প্লীহার রোগ-যন্ত্রণা এক বৎসর ভোগ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার ডাক্তারী শিখিতে ইচ্ছা হয়।

তৎপরে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, ইনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু ইনি ডাক্তারি পড়িয়া উক্ত বিদ্যায় পরীক্ষায় ফেল হন বলিয়া ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দেন। এই সময় ইনি ১ম বিবাহ করেন। তৎপরে ইনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, ইহাতেও রাজা রাজেন্দ্রলাল পাস দিতে পারেন নাই। কাজেই আইন পড়া ছাড়িয়া দেন।

এইবার রাজা রাজেন্দ্রলাল উর্দ্দু এবং হিন্দি পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বাড়ীতে পণ্ডিত রাখিয়া ইহা শিখিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর য়্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটরী এবং লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ পাইয়া ইহাঁর পুস্তক পাঠের প্রবল পিপাসা অনেকটা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে ইনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডের ডাইরেক্টরের পদে অভিষিক্ত হয়েন।

এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রবেশ করিয়া ইনি উক্ত সোসাইটী হইতে প্রকাশিত "জর্ণাল অব এসিয়াটিক সোসাইটী" নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকাতেই ইহাঁর প্রথম রচনা বাহির হয়।

তৎপরে ইনি সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করেন। এই সময় হইতে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে উক্ত ভাষায় কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সস্কৃত ভাষায় "কামন্দকী" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তৎপরে "নীতিসার" নামক আর একখানি সংস্কৃত পত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ইহাঁর সংস্কৃত এবং ইংরাজী লিখিয়া তৃপ্তি হয় নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক বাঙ্গালা ভাষায় মাসিক পত্র সম্পাদিত করেন। এই মাসিকপত্রই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান রহস্যের পথ প্রদর্শক। উহা হইতেই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রথম প্রাপ্ত হয়। তৎপরে "রহস্য সন্দর্ভ" নামক বাঙ্গালাভাষায় আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর মাসিকপত্রে এবং বহুবিধ ভাষার সংবাদপত্রে ইনি দুই সহস্রের অধিক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। নিজে, ১২৮ খানা পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইখানি ইংরাজী পুস্তকের যথেষ্ঠ সুখ্যাতি ইউরোপখণ্ডে হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকদ্বয়ের নাম "বুদ্ধগয়া" এবং উড়িষ্যার প্রত্নতত্ব'। ইহা ভিন্ন নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পুস্তক এবং পত্রিকাগুলি অদ্যাপিও বোধ হয় পাওয়া যায়।

(১) বিবিধার্থ সংগ্রহ (২) রহস্য সন্দর্ভ (৩) প্রকৃতি ভূগোল (৪) পত্র কৌমুদী (৫) ব্যাকরণ প্রবেশ (৬) শিল্পিকা দর্শন (৭) শিবজীর জীবনী (৮) মিবারের ইতিহাস। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত ১২৮ খানি পুস্তকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় ১৩ খানি এবং বাঙ্গালা ভাষায় ১০ খানি ভিন্ন অপরাপর গুলি অন্যান্য

ভাষায় লিখিত। ইনি "হিন্দু পেট্রিয়টের" আত্মাস্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল ইঁহারই ছাত্র বিশেষ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েন। বাঙ্গালীকে এই পদ ইনি প্রথম দেখাইয়া যান। পরন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন নামক এক স্কুল ৮নং মাণিকতলা রোডে স্থাপিত করেন। এই স্কুলে কেবল জমীদারদিগের নাবালক পুত্র-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই স্কুল হইতে ইনি মাসিক ৫০০্ শত টাকা পাইতেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উক্ত স্কুল উঠিয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি উক্ত স্কুলবাটীকে বসতবাটী করিয়া লইয়া সপরি-বারে বাস করিতেছিলেন। পরন্তু এখনো তাঁহার দুই পুত্র এই বাটীতেই বাস করিতেছেন। ইহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এক কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া মারা যান। তৎপরে ইনি ভবানীপুর নিবাসী ৺ কালীধন সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহাঁরই গর্ব্ভোদ্ভব দুই পুত্ররত্ন—বিশেষ শিক্ষিত পুত্রদ্বয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

ইনি নিম্নলিখিত উপাধিগুলি লাভ করিয়াছিলেন "ডাক্তার অব ল," সি, আই, ই, "রায় বাহাদুর," "রাজা" ইত্যাদি।

"ব্ল্যাক এক্ট" নামক আইন যখন পাস হইবে, ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল, টাউনহলে এক সভা হয়। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই ছিল যে, দেওয়ানী আদালতে সাহেবের বিচার এদেশী জজে করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে সাহেবেরা খুব প্রতিবাদ করেন, ইংলিসমান প্রভৃতি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন, উহাঁরাই অবজ্ঞা করিয়া উক্ত আইনকে ব্ল্যাক এক্ট" নাম দিয়া-ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল স্বজাতির পক্ষ সমর্থন করিয়া টাউনহলে, সেই সাহেবী সভাতে বিশেষতঃ উক্ত আইনের বিপক্ষদলের মধ্যে সাহেবী ভাষায় এক সুদীর্ঘ সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সে যুক্তির খণ্ডন করিতে না পারিয়া শেষে সাহেবেরা রাগান্বিত হইয়া রাজেন্দ্রলালকে প্রহারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু ইহাঁর এক বন্ধুর কৃপায় সে যাত্রায় বড়ই কৌশলে লুকাইয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী আইসেন।

তখনকার এমন সভাসমিতি ছিল না যে, রাজা রাজেন্দ্রলাল তাহার সম্বন্ধে ছিলেন না। সকল সভাতেই ইহাঁর যোগ ছিল। ইনি খুব রসিক ছিলেন।

আশা করি, এখনকার "সাহিত্য-সভা" এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সভা" ইহাঁর স্মৃতিস্বরূপ, এই মহাপুরুষের ছবি স্ব স্ব সভা গৃহে রাখিয়া দিবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

জল প্লাবন। *

("ভুবনমোহিনী প্রতিভার" সুপ্রসিদ্ধ কবি কর্ত্তৃক রচিত)

"কে'রে বীরনারী, নভঃপট যুড়ি,
মহামেঘ মালা চিকুর বিস্তারি
নিবিড় তিমিরে ভুবন আঁধারি,
ঝলকে ঝলকে উগার বিদ্যুৎ?
নিশ্বাস প্রশ্বাসে বহিছে পবন।
মহাঘোর রাব শন্ শন্ শন্।
বজ্র হুহুঙ্কার করিয়া ভীষণ,
সমস্ত ভুবনে ভ্রমিছ অদ্ভুত?

২

প্রলয়ের তরে লয়ে জলধরে?
সাজিয়াছ সৃষ্টি সংহারের তরে?
হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি বিধাত্রী সংসারে
কেন এ দারুণ বাসনা তোমার!
দয়াময়ি! তোর এই কি দয়া মা।
জগত প্রসূতি তুই যে গো শ্যামা,
প্রসবিতে বিশ্ব কত ব্যথা উমা,
সে সব কি মনে নাহিক তোমার?

৩

এক এক করি প্রকৃতি পুঞ্জেরে—
প্রসবিয়া স্নেহে পালিলা সাদরে।
ভাসালে জগতে অমৃত পাথারে
তাহাই নাশিতে হয়েছ উদ্যত?
অহো মহামায়ে। তোমার প্রকৃতি
বুঝিব এমন কি আছে শকতি?
সম্বর চণ্ডিকে প্রচণ্ড মুরতি,
প্রসীদ জননি! প্রসীদ প্রসীদ!"

৪

এরূপ প্রকারে কাতর অন্তরে
সিদ্ধ মুনি ঋষি মহাত্মাদিকরে।
বিবিধ বিধানে দেবী স্তব করে,
কেহবা সত্রাসে পলায় গগনে।
কোথা কে পলায় স্থির নাই তার,
মানবমণ্ডল করে হাহাকার;
পশু পক্ষী আদি করিছে চীৎকার।
হেরি এ ভীষণ দর্শন নয়নে!

৫

মহামেঘ পরে চপলা সঞ্চারে,
ঘোর হুহুঙ্কার ঘন ঘন ছাড়ে,
ঢালে বারি রাশি অবনী উপরে,
দিবা কি রজনী না হয় নির্ণয়।
ঘোর দম্ভে বহে প্রমত্ত-পবন।
হতেছে অগ্রজ অশনি পতন।
ভাঙ্গে তুঙ্গ শৃঙ্গ বন মহাবন,
জনপদ সব হইল বিলয়।

৬

বায়ু শন্ শন্ গরজে ভীষণ,
ঘোর ঘনজালে আন্ধার ভুবন।
ঘোরতর বৃষ্টি না যায় কথন।
ভাসিল অবনী সলিলতরঙ্গে।
অবিরাম বৃষ্টি ঢালে মেঘদল।
অবনীতে আর নাহি ধরে জল,

* গত আশ্বিন মাসের দুর্য্যোগ দৃষ্টে এই কবিতা লিখিত হইয়াছে।

একাকার সব হল জলস্থল
ভাবিতেও চিত্ত শিহরে আতঙ্কে।

৭

অবনীর যত জীব জন্তুগণ,
সহ জনপদ পর্ব্বত কানন,
সমস্ত সলিলে হল নিমগন,
সমস্ত ভুবন একাকার জলে!
হিমাদ্রি প্রভৃতি মহাদ্রি সকল।
আশ্রয় করিলা গভীর অতল!
আকাশ ভেদিয়া প্রবাহ সকল,
ছুটে অবিরাম বিকট কল্লোলে!

৮

দারুণ প্লাবনে প্রলয় তুফানে।
বিশাল বসুধা গেল কোন্ স্থানে?
এখনো জলদ বরষে সঘনে,
এখনো পবন হুঙ্কারে গম্ভীরে।
মানব হইতে পতঙ্গ অবধি,
আচ্ছন্ন করিয়া প্রলয় জলধি,
(দুর্দ্দশার আর নাহিক অবধি)
ভাসিয়া যেতেছে কাতারে কাতারে!

৯

ভীষণ দর্শন এ জলপ্লাবন,
হেরিয়া নয়নে যত দেবগণ,
বশিষ্ঠ, নারদ আদি তপোধন
অবনীর দশা দেখিয়া, দুঃখেতে
ব্যাকুল অন্তরে ডাকিছে চণ্ডীরে,
বিবিধ বিধানে স্তব স্তুতি করে,
কহিছে "কালিকে" রাখ মা সংসারে,
এ দারুণ দৃশ্য পারি না দেখিতে।

১০

হয়ে গো আপনি, ত্রিলোক জননী
বিশ্বময়ী বিশ্ব জীবনরূপিনী
শান্তি দয়ারূপা ত্রিতাপ তারিণী,
"বিপদ বারিণী অভয়া সংসারে,
কেন এ সংহার বাসনা তোমার?
ভুলেছ এ সব রচনা কাহার?
নিজেই সৃজেছ এ বিশ্ব সংসার,
নিজ হাতে তাহা ভাঙ্গিছ কি করে

১১

"তুমি শক্তি বিশ্বপ্রকৃতি মণ্ডলে,
তুমিই চালাও, তাই বিশ্ব চলে,
তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা শূন্যে জলেস্থলে,
তোমার মায়ার ছলনা এমনি;
দেবাসুরনর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
পশুপক্ষী আদি, মুগ্ধ চরাচর।
তোমার মহিমা কি বুঝিবে নর?
প্রসীদ, প্রসীদ, প্রসীদ জননি!

১২

"পূর্ণ কর মাতঃ আমাদের আশ,
পুনর্ব্বার কর সৃষ্টি অভিলাষ,
সম্বর জলদ কৃষ্ণ কেশ-পাশ,
প্রসন্ন নয়নে নিরখ জগতে।
অমৃতরূপিণী! মৃত অবনীরে,
অতল হইতে তুলিয়া সত্বরে
বাঁচাও করুণ করস্পর্শ ক'রে,
আর জলরাশি পারি না দেখিতে।"

১৩

এইরূপে যত দেবতা সকলে
স্তব করে, আর ভাসে নেত্রজলে,
হেরি দয়াময়ী হৃদয়-কমলে,
উপজিল আশি করুণা অমৃত।
প্রলয়ের রূপ করি সম্বরণ,
সে অমৃতধারা করিয়া বর্ষণ,
কহিলেন দেবী, "হে অমরগণ।
আমার এ কার্য্যে হও না দুঃখিত।

১৪

ঘোর পাপতাপে জরাজীর্ণ ধরা,
তাই ডুবাইনু এপাপের ভরা।

ইহাতে বিস্মিত হওনা তোমরা,
উপাদান হেতু আমি এজগতে,
আমি সৃষ্টি আমি সংহার সংসারে,
আমি নিত্য সুজাগ্রত চরাচরে।
আমার অভাব না হইলে পরে,
সংসার বিলয় হবে কিরূপেতে ?

১৫

প্রতি মন্বন্তরে ঘটেছে এমন,
জগতপাবন জল-হুতাশন,
ইহাতে সংসারে করিয়া শোধন,
করি অভিনব রচনা সুন্দর।
ইহাই আমার চিরন্তন রীতি
কালে পুনর্ব্বার হবে সৃষ্টিস্থিতি,
সৃষ্টির প্রবাহ রাখিতে সম্প্রতি,
বেদ রক্ষা করা কার্য্য গুরুতর।

১৬

বেদ সনাতন হইলে মগন
মানবসমাজ করিয়া গঠন
কি ফল হইবে ? তিমিরে মগন,
থাকিবে অবনী, জ্ঞান প্রভাকর।
ভাতিবেনা ধরা হৃদয় দর্পণে।
বিবেক চন্দ্রমা মানস গগনে,
উদিবেনা, লোক পশু আচরণে
বহিবে ক্লেশেতে জীবন দুর্ভর।

১৭

তাহা কেন হবে, বলি মহেশ্বরী,
কহেন বিষ্ণুরে "মীনরূপ ধরি
রক্ষা কর বেদ মুকুন্দ মুরারী,।
রক্ষা কর সৃষ্টিপ্রবাহ আমার।'
"যে আজ্ঞা' বলিয়া দয়াময় হরি,
প্রবেশিলা জলে মীনরূপ ধরি,
ভাসমান মহাগ্রন্থে ওষ্ঠে করি,
সনাতন বেদ করিলা উদ্ধার।

১৮

বহুদিন রাত্রি প্রচণ্ড ভাবেতে
প্রলয় দুর্য্যোগ রহিল ভবেতে
শান্তি সমীরণ বহিল ক্রমেতে
সমস্ত বিপ্লব করিয়া বিলয়।
মেঘজাল মুক্ত হইল গগন,
ভেদিয়া অনন্ত সলিল দর্পণ,
হাসিয়া উঠিল জ্বলন্ত তপন,
ছড়ায়ে আলোক ত্রিভুবনময়।

১৯

থামিল বিপদ শান্তি সমুদিত,
কিন্তু চরাচর জলে নিমজ্জিত,
অচেতন ধরা অতলে শায়িত,
কে বুঝিবে আর সুখশান্তি কথা ?
বহুশতবর্ষ ধরা জলময়
রহিল না জল স্থলের উদয়,
জলজন্তু পূর্ণ হ'ল সমুদয় ;
"কেমন অবনী, ছিলই বা কোথা ?"

২০

অগ্নলোকবাসী ভুলিল ক্রমেতে,
অহো। কি বিস্ময় পারিনা ভাবিতে।
পৃথিবী মিলাল জল মণ্ডলেতে,
অনন্ত সিন্ধুতে জলবিম্ব প্রায়।
আদ্যশক্তি বাক্যে দয়াময় হরি,
জীবহিত তরে মীনরূপ ধরি
বহুশতবর্ষ সলিল উপরি,
ভাসিলেন, বেদ রক্ষা হ'ল তায়।

২১

হইলেন হরি মৎস্য অবতার,
করিলেন জীব প্রবাহ বিস্তার,
কূর্ম্ম বরাহাদি দশ অবস্থার
দশ অবতারে সম্পূর্ণ স্বভাব।
এইরূপে কত শত শত বার,
হইল প্রলয়, দশ অবতার
হইল, হইবে সংখ্যা নাই তার।
ইহাই বিশ্বের নিত্য সিদ্ধভাব।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় জীবন।

যাবতীয় সৃষ্ট জীবের অন্তরেই নানা সময় নানা প্রকার ভাবতরঙ্গের উদয় হইয়া থাকে। এই জগতে জীব যতদিন বাস করে, ততদিন অহর্নিশ নানা-

রূপ অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া তাহাকে গতায়াত করিতে হয়, এসব সময় অবস্থানুসারে নানারূপ ভাব বৈচিত্র্যও যে তাহাদের মনোমধ্যে উদিত না হয়, তাহা নহে। ইতর প্রাণীগণেরও কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে, যে গুলির ক্রিয়ার ফলে তাহাদের মনেও, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, ভয় উল্লাস প্রভৃতি নানারূপ ভাবান্তরের সমাবেশ হয় এবং তাহারা বাক্‌শক্তি বিরহিত হইলেও প্রকৃতিসিদ্ধ নানা প্রকার স্বাভাবিক উপায়ে তাহারা সেই সেই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের, মুখভঙ্গী, অঙ্গ সঞ্চালন, অব্যক্ত স্বর ইত্যাদিই সেই সব ভাব বাহিরে প্রকটিত করিয়া থাকে। সুতরাং এগুলিকে তাহাদের ভাষা বলা যাইতে পারে। আমরা মানুষ, আমাদের বাক্‌শক্তি আছে বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি; তাই বলিয়া ভাষাটা যে কেবল আমাদেরই একচেটীয়া সম্পত্তি, তাহা নহে। ভাষা কি? মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার একটা উপায় ও অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যে যে ভাবে সেই মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সেই ভাবকেই আমরা তাহার ভাষা বলিতে পারি। পশুগণের নানাবিধ স্বর আমরা বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই যে, তাহাদের ভাষা নাই, ইহা যদি বলা যায়, তবে পশুগণও আমাদের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া আমাদের ভাষা নাই এইরূপ স্থির করিতে পারে। অথবা আমাদের নিজেদের কথাই দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে যে, ইংরাজি কি লাটিন বা জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সমস্ত ভাষাভাষীগণের উক্তির এক বর্ণও বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার নিকট শাখা মৃগকুলের কিচিমিচির সঙ্গে ঐ স্বরের কোন পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহার ধারণা হইবে না। নিজ ভারতবর্ষেই মহারাষ্ট্রীয় বা তৈলঙ্গীয় বা উড়িষ্যাবাসীর ভাষা বঙ্গীয়েরা বুঝিতে অক্ষম হইবেন। নিজ-বঙ্গেরও চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথা পশ্চিমবঙ্গীয়েরা বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং বুঝিতে না পারিলেই যে ভাষা হয় না, ইহার কোন যুক্তি নাই। এই জন্যই পৃথিবীতে নানা ভাষার সৃষ্টি। এক এক দেশীয় লোক নিজেদের মধ্যে একটা নিয়ম করিয়া কতকগুলি কথা স্থির করিয়া লইয়াছে, সেই গুলি দ্বারা তাহারা প্রয়োজনীয় বক্তব্য বলিয়া থাকে; সেই তাহাদের ভাষা। ইতর জাতীয় পশুগণের মধ্যেও সে বাঁধাবাঁধি আছে এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে সে সব বেশ বুঝিতেও পারে। গাভীর হুঙ্কার বৎস বেশ বুঝে, বিড়ালীর আহ্বান বিড়াল শাবকের বোধগম্য হইতে কষ্ট হয় না।

শাবকের কাতর ভাষা পক্ষিনীকে দূর হইতে আকর্ষণ করে। তারপর যে সমস্ত জন্তু গৃহপালিত, তাহারা সর্ব্বদা আমাদের সংসর্গে আসায় আমাদের অনেক কথা তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের অনেক ভাবও আমরা বুঝিতে পারি। তাহা না পারিলে তাহাদিগকে লইয়া কাজ করা আমাদের দুর্ঘট হইত।

কৃষকের গরু তাহার কথা মত বাম দক্ষিণ চিনিয়া চলে, 'তু' বলিয়া ডাকিলে শত হস্ত ব্যবধানস্থিত কুক্কুরও ছুটিয়া আইসে, 'পুস্ পুস্' আহ্বানে পুসি মেনী লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া গা ফুলাইয়া ঘুরিতে থাকে; কুকুরকে 'ধর ধর' বলিয়া কিছুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে ছুটিয়া যায়, বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ ভাবে 'যা' বলিলে কুকুর, বিড়াল আদি দূরে পলায়ন করে, আদর করিয়া ডাকিলে তাহারা কাছে আসিয়া লেজ নাড়ে বা ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ করে, ইত্যাদি শত ব্যাপার প্রত্যেকেই প্রত্যহ দেখিতেছেন। তাহাদের ডাকে, বা অঙ্গভঙ্গীতেও যে আমরা তাহাদের শোক, দুঃখ, কি আনন্দ বুঝিতে পারি, তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ পরস্পরের কতকগুলি ভাব ও ভাষার আদান প্রদান হইয়া যাওয়ায় আমরাও তাহাদের দ্বারা কাজ করিতে পারিতেছি আর তাহারাও আমাদের আশ্রয়ে থাকিতে পারিতেছে; এক্ষণে তাহাদের লইয়া বসবাস করিতে আমাদের কিছুই বিশেষ অসুবিধা হয় না; কিন্তু যদি এমন একজন মনুষ্যকে লইয়া আমাদের থাকিতে হয়,যাহার ভাষা আমরা জানিনা, তাহা হইলে এতদপেক্ষা কত বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যাঁহাদের বাসায় উত্তর পশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানী চাকর আছে, (অথচ বাড়ার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা হিন্দি জানেন না) তাঁহারা বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই।

সুতরাং ভাষা যাহার যাহাই হউক না কেন, বুঝিতে পারিলেই কাজ চলিতে পারে, না বুঝিতে পারিলে কিছুতেই কিছু হয় না। ইতর প্রাণীগণ লইয়া যাঁহারা বেশী সময় যাপন করেন, তাঁহারা তাহাদের অনেক বিষয় তাহাদের স্বর হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের তাহা ভাবিতে গেলেও অসম্ভব ও আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইয়ুরোপীয় অনেক মনীষিগণ মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া এত অধিক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন যে,তাঁহারা তাহাদের সেই সব অস্পষ্ট বাহ্য শ্রুতিতে একবৎপ্রতীয়মান ধ্বনি হইতেই

তাহাদের সুখ দুঃখ ঝগড়া দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সেই সব অবলম্বন করিয়া উহাদের সম্বন্ধে সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। এ সব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থই আছে, যাঁহারা কৌতুহলী হন, তাঁহারা অন্নের মধ্যে লবক্ সাহেবের (Dr. Lubbock) প্রণীত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন (Wasps and Bees Insects) এইরূপ এক সাহেব বানরের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া বানরের প্রধান আড্ডা আফ্রিকা দেশের বনে বাস করিয়াছেন এবং অনেকটা শিক্ষাও করিয়াছেন।

সুতরাং ইতর জন্তুগণের ভাষা নাই কে বলিবে? এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভাষা আছে, আমরা বুঝি না। আমাদের দেশের গৃহ-পালিত পশু পক্ষিগণ আমাদের কথা বুঝিতে পারে, ইংরাজদের পালিত পশু পক্ষিগণের তাহাদের কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বোধ হয় যে, আমাদের পশু পক্ষিগণকে ইংরাজদিগকে দিয়া তাহাদের পশু পক্ষিগুলি যদি আমরা বদলাইয়া লই, তাহা হইলে কিছুদিন উভয় পক্ষেরই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তারপর ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেলে আর সে অসুবিধা থাকে না।

অনেকে বলেন, শুক, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি বিহঙ্গগণ মানবের আশ্রয়ে থাকিয়া যে সব কথা শিক্ষা করে, তাহারা তাহার অর্থ বুঝে না; কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে, সুতরাং সে শিক্ষায় কোন ফল হয় না। আমি এ বিষয় যতদূর অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে একথাও অনেকটা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। দেখুন, শিশুগণ যে কথা বলিতে শিক্ষা করে, তাহাও শুনিয়া ভিন্ন অন্য উপায়ে নহে। যদি একদল বাক্‌শক্তি বিহীন লোকের মধ্যে একটি শিশু অতি বাল্যকাল হইতে পালিত হয়, তাহা হইলে সে কখন কথা কহিতে সক্ষম হইবে না। কারণ সে কাহাকেও বাক্‌স্ফূর্ত্তি করিতে দেখিবে না বা শুনিবে না। অতএব পাঁচ জনে একটা জিনিসকে যাহা বলে, সেও তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া সেই বস্তুকে তাই বলিতে শিক্ষা করে। এজন্য অনেক পরিবারে প্রথমজাত সন্তান স্বীয় মাতাকে 'বৌ' বলিয়া থাকে, কারণ তাই বলিয়াই তাহার মাতাকে সে সর্ব্বদা আহুতা হইতে শুনিতে পায়, মাতুলালয়ে থাকিলে অনেক সময় 'মা'কে 'দিদি' বলে। পিতাকে অনেক শিশু নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে, বাটীর পাঁচ জনে তাহার

ভ্রম সংশোধন করাইয়া যাহাকে যাহা বলিতে হইবে শিখাইয়া দেন। এইরূপে তাহার অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে সে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক বস্তুর ও ব্যক্তির প্রকৃত নামকরণে অভ্যস্ত হয় এবং তদনুসারে সে সেই সব কথা ব্যবহার করে। সেই সব কথা বলিতে তত্তদ্বাচক বস্তু ভিন্ন আর কি সে বুঝিয়া থাকে? 'কাগজ' বলিলে এইরূপ জিনিস বুঝায়, ইহা ব্যতীত আর কি অর্থের আবশ্যক? সুতরাং একটা কথা শিখিয়া তাহার প্রকৃত ব্যবহার যদি করিতে পারা গেল, তাহা হইলেই তাহা শিক্ষার কাজ হইল; তাহার অর্থ বোধ হইল! 'মানব' বলিতে হাত পা যুক্ত লাঙ্গুলহীন, ইত্যাদি বিশেষণ সম্পন্ন একটা জীব বুঝায়,ইহা বুঝিয়া মানুষকে 'মানব' বলিয়া জানা হইলেই 'মানব' কথাটার কাজ হইল! এইরূপ সিংহ, 'ব্যাঘ্র' প্রভৃতি নামেও তত্তৎ আখ্যাধারী জীবকে ঠিক বুঝাইতে পারিলেই সে গুলি জানার কার্য্য হইয়া থাকে। নতুবা 'মনোরপত্যং পুমান্' মানব, হিনস্তীতি সিংহ, জিঘ্রতীতি ব্যাঘ্র ইত্যাদি অর্থ কয়জনে জানেন বলুন দেখি?

ময়না প্রভৃতি পক্ষিগণের সম্বন্ধেও আমি দেখিয়াছি, তাহারা অনেক স্থলেই জ্ঞাত বাক্যগুলির যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। ঝুলি কাঁদে ফকীর দাঁড়াইলেই সে ভিক্ষা চায়, বাড়ীর পাঁচ জনেও হয়ত ভিক্ষা দাও বলিয়া দিতে বলেন, ময়না তাহা শিখিয়া ফকীর বা বৈষ্ণব দেখিলেই 'ভিক্ষা দাও' বলিয়া চিৎকার করে। একজন ভদ্রলোক আসিয়াছে দেখিলেই সে 'বস্‌তে দাও' বলিয়া চেঁচায়। নিজের খাদ্যস্থানীতে খাদ্য না থাকি[illegible] 'খাবার দাও' বলিয়া খাবার চায়। বাটীর লোকদিগকে 'বাবা', 'দাদ[illegible] ডাকে, অনেক স্থলে বাটীর চাকরটিকে পর্য্যন্ত নাম ধরিয়া ডাকে। গোরু বাছুর বাড়ীর উপর আসিলে 'দূর দূর' করিয়া তাড়ায়, ইত্যাদি কত বলিব? এ সব দেখিয়া কি বোধ হয়, যে তাহারা শিক্ষিত কথার ব্যবহারে অক্ষম? আমার তো বোধ হয় যে, তাহারা এই কথায় এই বস্তু বুঝায়, এ বিষয় বেশ বুঝিতে পারে বলিয়াই উহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে। প্রথম প্রথম শিশুগণের ন্যায় তাহাদেরও ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্রমে ঠিক হইয়া যায়। এইরূপে তাহারাও মানুষের ভাষায় নিজ মনোভাব বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রকাশে সক্ষম হইয়া থাকে।

অতএব কি ইতর প্রাণী কি মানব সকলেরই ভাষা আছে এবং সকলেই তদ্দ্বারা মনের ভাব প্রকটিত করিয়া থাকে। শিক্ষা দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা বিভিন্ন

জাতীয় জীবজন্তুদিগের স্বেতর জাতীয়গণের ভাষায় অধিকার জন্মিয়া থাকে। এ বিষয় মানুষও ইতর জন্তুগণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছু নাই। আবশ্যক অনুসারে ভাষার বা কথার সৃষ্টি হয়। পশুপক্ষীগণের আবশ্যকের বিশেষ তারতম্য নাই বলিয়া তাহাদের নূতন শব্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন এবং ক্ষমতাও নাই। তবে বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া বোধ হয়।

মানুষ আবশ্যক মত ভাষা সৃষ্টি বা ধার করিয়া লইয়া থাকে। যে জাতীয় মনুষ্যের যে বিষয় বেশী প্রয়োজন, যাহার মধ্যে তাহাদের সর্ব্বদা বাস করিতে হয় বা যাহা লইয়া সর্ব্বদা তাহাদের কারবার করিতে হয়, সেই সব বিষয়ে তাহাদের ভাষায় অধিক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম জাতীয় বনবাসীগণের ভাষায় যত কথার প্রয়োজন, সুসভ্যগণের ভাষায় তদপেক্ষা অনেক অধিক কথার আবশ্যক হয়; কারণ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। মানুষ এজন্য সর্ব্বদাই আবশ্যক মত শব্দের সৃজন বা আহরণ করিতেছে। আর ইতর জীব হইতে আর এক বিষয়ে মানুষের পার্থক্য আছে—সেটা লিখিত ভাষা। এই লিখন প্রণালীও মনোভাব ব্যক্ত করিবার আর একটি সঙ্কেত। যে সব বাক্য আমরা মুখে ব্যবহার করি, তাহা মুখে ব্যবহার না করিয়া এই উপায়ে কতকগুলি অক্ষর উদ্ভাবন পূর্ব্বক তৎ সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়। এই সব অক্ষরও এক নহে, দেশ ভেদে সহস্র প্রকারের রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল প্রকার অক্ষর বা সঙ্কেত একজনের জীবনে আয়ত্ব করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই লিখন সঙ্কেত ইতর প্রাণী বা আদিম মানবগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, এখনও অনেক স্থলে নাই। তাহাদের অন্য সঙ্কেত আছে; সেও একপ্রকার ভাষা। জাহাজীয় ভাষা নিশান সম্মিলনে ব্যক্ত হয়, মুকুরে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া সামরিক ভাষা ব্যক্ত করা হয়, পূর্ব্বে আফ্রিকার মিশর দেশে চিত্রাঙ্কন সঙ্কেতে মনের ভাব প্রকাশও প্রচলিত ছিল। যতই প্রকার ভেদ থাকুক না কেন, সকলকেই অক্ষর বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ যে কোন উপায়েই হউক, লিখিত ভাষায় মানুষ নিজ মনোভাব প্রকাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে; এবং প্রত্যেক জাতীয় মনীষিগণই নিজ নিজ মনোভাব ঐ উপায়ে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, রাখিতেছেন ও রাখিবেন। এইগুলিকে আমরা গ্রন্থ বা পুস্তক আখ্যা দিয়া থাকি। এবং এইগুলির সম্মিলনই সাহিত্য। (ক্রমশঃ) শ্রীযদুনাথচক্রবর্ত্তী, বি, এ।

জয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজি জয়া নিরাশ্রয়া। তাঁহার পিতা দিল্লীর সিংহাসনে বন্দী। তাই আশ্রয় লাভের আশায় পিতার আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইতেছেন। সঙ্গে কতিপয় সহচরী ও বহুসংখ্যক শরীররক্ষক। জয়ার হৃদয় চিন্তাপূর্ণ, বদন বিষণ্ণ, নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত। কিন্তু সে অশ্রুজল শতদলগত হিমানীকণার ন্যায় তাহার নয়নকমলের সীমা অতিক্রম করে নাই। জয়া তেজস্বিনী রাজপুত কন্যা। অপরের নিকট স্বীয় হৃদয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে অপমান বোধ করেন। তজ্জন্য আশৈশবসঙ্গিনী সমদুঃখভাগিনী সহচরীগণেরও নিকট নিজ হৃদয়ভাব গোপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেবল মধ্যে মধ্যে হৃদয়ভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁহার উন্নত বক্ষঃস্থলকে অধিকতর স্ফীত করিতেছিল।

জয়ার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। কিন্তু দেখিতে পূর্ণ যুবতীর ন্যায়। জয়া সুন্দরী ক্ষীণাঙ্গী। হস্তপদাদি সুগোল, সুগঠিত ও দেহের অনুরূপ। নিবিড় আকুঞ্চিত কেশদাম বেণীবদ্ধ হইয়া আনিতম্ব বিস্তৃত। কপোলপ্রদেশ আরক্তিম। ওষ্ঠাধর সুলোহিত। ইন্দিবর বিনিন্দিত নয়নযুগল ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয় পরিবেষ্টিত। জয়া অসামান্য রূপলাবণ্যবতী। ললনাকুল নন্দনকাননের পারিজাত। এ স্বর্গীয় কুসুমের সৌন্দর্য্যসুরভি দিল্লীর পাঠান সম্রাটের সিংহাসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। জয়া মাতা পিতার এক মাত্র সন্তান। শৈশবে মাতৃহীনা, আজন্ম পিতার স্নেহে পালিতা। হায়! অভাগিনী সেই স্নেহময় পিতাকে হারাইয়া সংসার অন্ধকারময় দেখিতেছে। এই আবর্ত্তমান সংসারচক্রে একাকিনী সরলা বালিকাকে না জানি কতই নিষ্পেষিত হইতে হইবে। জয়ার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাকাশ দুঃখের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। জানি না সে মেঘ কখন অন্তরিত হইবে কিনা?

দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া, অনুযাত্রিকগণ সহ জয়ার শকট একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলে গগনমণ্ডল সহসা নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল ও পরক্ষণেই মুষলধারে বৃষ্টি

পড়িতে লাগিল। ক্ষণপ্রভা ক্ষণেক হাঁসিয়া মানব-মনের আশার ন্যায়, পরক্ষণেই বিলুপ্ত হইল ও পথিকের নয়ন ঝলসিত করিয়া দিয়া অন্ধকারকে দ্বিগুণ বাড়াইতে লাগিল। বজ্রের ভীষণ নিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে। ঘোর অন্ধকারে নিকটের লোক দেখা যাইতেছেনা। আর অগ্রসর হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িল। এই সময়ে মেঘের গর্জ্জন অতীব ভয়ানক হইয়া উঠিল ও বাতাসের শব্দের সহিত মিশিয়া এরূপ প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল যে, পার্শ্বস্থ লোকের অতুচ্চ চীৎকার পর্য্যন্তও শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। জয়ার হৃদয়ে শোকের প্রবল ঝড় বহিতেছিল, তজ্জন্য এই তুমুল ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই। তাঁহার বিষণ্ণ ও নিস্তব্ধ ভাব দর্শনে সহচরীগণও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে নাই। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সহসা জয়ার নেত্র রোরুদ্যমানা সঙ্গিনীগণের উপর নিপতিত হইলে তাঁহার চেতনা হইল। বিদ্যুতালোকে দেখিলেন, সমস্ত প্রান্তর জলে প্লাবিত হইয়াছে। এদিকে বৃষ্টির জল শকটের আবরণ ভেদ করিয়া স্রোতের আকারে ভিতরে পড়িতে লাগিল। পাদচারী সৈন্যগণের ও শকটবাহী পশু সকলের পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। উপায়ান্তর রহিত হইয়া জয়া সৈন্যগণকে গমনে বিরত হইতে ও আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিতে আদেশ করিলেন। অনতিদূরে একটি পর্ব্বতগুহা ছিল। সেই গুহা নানাপ্রকার সরীসৃপ পরিপূর্ণ ও ভয়াল-শ্বাপদ-সঙ্কুল। মধ্যে মধ্যে তদপেক্ষাও ভয়ানক নরশোণিত-পিপাসী দস্যু-তস্করাদি ঐস্থানে অবস্থান করিয়া স্বকীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। সৌভাগ্যক্রমে একজন সৈনিক উক্ত গুহার বিষয় অবগত ছিল। সেই ব্যক্তি পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকলকে তথায় লইয়া গেল। কয়েকজন সাহস করিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ও কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিল। অগ্নির আলোকে গুহার অভ্যন্তর উদ্ভাসিত হইলে অসংখ্য যতুকা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কেহ ধরিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের হস্তে বা মুখে দংশন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল।

গুহার বহির্দেশ ভগ্নাবস্থ হইলেও উহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য্য একেবার বিনষ্ট হয় নাই। এবং উহার প্রত্যেক অংশ বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ভারতের স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। গুহার অভ্য-

স্তর সমচুতষ্কোণ ও প্রশস্ত। ভিতরে একটি বস্ত্রের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া জয়া ও তাহার সঙ্গিনীগণ শয়ন করিলেন। সৈনিকগণ সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির চতুঃপার্শ্বে শয়ন করিল। কিন্তু হায়! হতভাগ্যদিগের অদৃষ্টে বিধাতা বিশ্রামসুখ লেখেন নাই!

বিরামদায়িনী নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত হইবার পূর্ব্বেই একজন অপরিচিত ব্যক্তি গুহার দ্বারে প্রবেশ করিল ও ইতস্ততঃ সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। তাহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ দৃষ্টে তাহাকে সকলে মুসলমান বলিয়া অনুমান করিল। এই ঘটনায় জয়ার অনুচরবর্গ সাতিশয় চিন্তিত হইল, বিশেষতঃ এই সময়ে দিল্লীর সৈন্যগণ নিকটে অবস্থান করিতেছিল। রাজপুতগণ এবিষয় অবগত ছিল। তাহাদের সঙ্গে তাদৃশ যুদ্ধোপকরণ ছিল না, সুতরাং শত্রুবল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা গুহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া জয়ার সেনাপ[তি] মুসলমানগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন অনুচরকে প্রে[রণ] করিলেন ও ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে আদে[শ] করিলেন। জয়া এসমস্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু সেনাপতি সকল বিষয় বিবৃত করিলে তিনিও গমনে অনুমোদন করিলেন।

সকলেই গমনের জন্য প্রস্তুত। এমন সময়ে যে ব্যক্তি যবনদিগের গতিবিধি পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, সে সহসা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সশস্ত্র মুসলমান সেনা গুহার চারিশত হস্ত অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পলায়ন অতঃপর অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রাজপুতগণ নিরাশ ও শঙ্কিত হইল। জয়া সৈন্যগণকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "মুসলমানগণ মনুষ্য বটে, তাহারা কখন স্ত্রীলোকের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিবে না। বোধ হয়, ঝড়বৃষ্টির পর আশ্রয়লাভের জন্য তাহারা এইস্থানে আসিতেছে। আমাদের এই গুহা পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ হিন্দু ও দেবদ্বেষী যবন কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না।" বিনয়-নম্রবচনে জয়ার সেনাপতি উত্তর করিলেন—"দেবি! যবন সেনাগণ দয়া মমতা বিহীন। বিশেষতঃ শত্রুপক্ষ। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ত বিধর্ম্মিগণের সহিত একত্র এই গুহা মধ্যে বাস করিতে হইবে।" জয়া প্রশান্ত ও ভক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "সৈনিকগণ! নারায়ণের নাম কর,

সেই অনাথের আশ্রয়দাতা ভগবানের শরণ লও। দুর্ব্বলের বল হরি বিপৎকালে এই অসহায়া অবলাকে রক্ষা করিবেন।" জয়ার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ গুহাদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। যবন সেনাপতি গুহার মধ্যে লোক দেখিয়া সৈন্যগণকে বাহিরে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। রাজপুতগণ শত্রুর আগমনে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। যবন সেনানী স্বয়ং গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জয়ার পটমণ্ডপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজপুত সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুহার মধ্যে কে আছে।" রাজপুত নীরব রহিল। তাহার নিস্তব্ধতা দর্শনে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া যবন কর্কশস্বরে বলিল, শীঘ্র আমার কথার উত্তর দাও। নতুবা আমি বস্ত্রাবরণ ছিন্ন করিয়া দেখিব, ইহার ভিতর কে অবস্থান করিতেছে।" রাজপুত সেনানী কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "স্ত্রীলোক!"

"স্ত্রীলোকত বুঝিয়াছি। পুরুষে কখন এরূপ আবরিত হইয়া থাকে না। ভাল, যদি তোমার বলিতে সঙ্কোচ হইতেছে, আমি নিজেই এবিষয়ের সন্ধান লইতেছি।" এই বলিয়া যবন বস্ত্রাবরণ অপসরণ করিতে অগ্রসর হইল। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার! রাজপুত সেনাপতি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বল প্রয়োগ করিয়া তথা হইতে যবনকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ যবন আরও উত্তেজিত হইয়া স্বীয় অসি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। অস্ত্রাঘাতের শব্দ ও আহতের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে জয়ার বাকী রহিল না। তিনি বিশ্রাম-স্থান হইতে বাহির হইয়া যবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রশান্ত অথচ তেজঃপূর্ণ বচনে বলিলেন—"আমি জয়া, চিতোর-রাজ রায় রতন সিংহের কন্যা। চিতোরেশ্বরকে তোমাদের সম্রাট কৌশলে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মুসলমান সেনাপতির হস্ত হইতে তরবারি বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জয়ার লোকাতীত রূপলাবণ্যের কথা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল। খিলিজী সম্রাট্ এই রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়া জয়ার পিতা চিতোররাজ রতন সিংহকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং জয়ার অন্বেষণে মিবারের চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই একাল পর্য্যন্ত জয়ার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। সহসা অনুকূল দৈববলে এক প্রকার আশাতীত ফল লাভ করিয়া পাঠান দলপতি আনন্দে উৎফুল্ল এবং অধীর হইয়া বারংবার স্বীয় অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সম্রাট্ ঈপ্সিত প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন, এই বলবতী আশা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা জয়ার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ও তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণে, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং নতজানু হইয়া ধীরভাবে বলিলেন—"দেবি ! প্রায় মাসাবধি আমরা ইতস্ততঃ আপনার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। আজ সৌভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আপনি রমণীরত্ন, প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর আপনার পাণিগ্রহণপ্রার্থী। আপনি আলাউদ্দিনের প্রধানা মহিষী হইবেন। অদ্য এই গুহা মধ্যে নিশাযাপন করুন, কল্য প্রত্যুষে আমরা দিল্লী যাত্রা করিব"।

কিছুমাত্র উদ্বেগের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া জয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি হিন্দু, দিল্লীর সম্রাট হিন্দুর চির শত্রু, যবন—হিন্দুদেব-দেবী-গণের নিগ্রহকারী, সুতরাং আপনার প্রস্তাব অসঙ্গত। বিশেষতঃ আমি পূর্ব্বেই অন্য জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। অতএব আমি পরিণীতা। আপনার হৃদয় আছে—দয়া মমতা আছে, এরূপ অসহায়াবস্থায় পাইয়া কখন স্ত্রালোকের স্বেচ্ছার বিরোধী হইবেন না এবং আমার গমনে কোন রূপ বাধা দিবেন না।"

"দেবি ! মানুষের কর্ত্তব্য বুদ্ধি তাহার ইচ্ছার অনুগমন করে না। আমার ইচ্ছা থাকিলেও আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাহা হইলে পবল প্রতাপান্বিত খিলিজী সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হইব। তজ্জন্য অধী-নের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। বিশেষতঃ আপনার পিতার বিবরক্ষণেকের

জন্য চিন্তা করা উচিত। আপনি দিল্লী গমন করিলে আপনার পিতা কারামুক্ত হইবেন, নতুবা আজন্ম তাঁহাকে কারাগারে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।"

গর্ব্বিত ভাবে জয়া বলিলেন, "আমার পিতা রাজপুত। রাজপুত প্রাণ অপেক্ষা মানকে অধিক জ্ঞান করেন। সামান্য কারাদণ্ডের কথা? আমার পিতা অনায়াসে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি নির্ম্মল শিশোদীয় কুলে কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত হইতে দিবেন না।"

অধিক তর্ক করা অনর্থক বিবেচনা করিয়া যবন সেনাপতি সৈন্যগণকে বিশ্রামের আদেশ দিলেন। এবং জয়াকেও বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন। জয়া যবনের মনোভাব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি আমি বন্দী?"

যবন কোন উত্তর প্রদান করিল না। পিঞ্জরাবদ্ধা সিংহীর ন্যায় জয়ার সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর কিছুমাত্র না বলিয়া গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সখীগণের নিকট গমন করিলেন।

রাজপুতগণকে পূর্ব্বেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। তাহারা সেনাপতির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া একাল পর্য্যন্ত তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত ছিল। এক্ষণে যবনগণকে দূরে শয়ন করিতে দেখিয়া তাহারাও অগ্নির চতুর্দ্দিকে শয়ন করিল। এবং শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়িল। জয়ার সহচরীগণও সমস্ত দিবসের ক্লান্তি প্রযুক্ত অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কেবল চারিজন সশস্ত্র মুসলমান সৈনিক অনিচ্ছাস্বত্বে সেনাপতির আদেশে গুহার বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল। অপর সকলেই নিদ্রার শান্তিময় অঙ্কে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। অভাগিনী জয়ার চক্ষে নিদ্রা নাই। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। শৈশবে মাতার স্নেহে বঞ্চিতা। পিতার যত্নে লালিত—সেই পিতা কারাগারে বন্দী; দিল্লীতে গেলে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বটে, কিন্তু হায়! কিরূপ অবস্থায়! পিতা কারারুদ্ধ, আর স্বয়ং অস্পৃশ্য যবনের অন্তঃপুরচারিণী! জয়ার শৈশবেই বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। ভাবী পতির সৌন্দর্য্যে ও গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয় দান করিয়াছিলেন। আশৈশব দেবতা জ্ঞানে যে প্রণয় ভাজনের মধুর ছবি

চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ কি করিয়া সহসা তাহা মুছিয়া ফেলিবেন? এ চিন্তা শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। বারংবার নিদ্রা দেবীর আরাধনা করিয়াও তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বদন স্বেদার্দ্র ও নয়নযুগল অশ্রু-সিক্ত হইল। জয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপাধানে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার শোকের কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইল। অঙ্গুলিস্থিত একটি অঙ্গুরীয়কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন। সাহসে বুক বাঁধিলেন। মনে মনে করিলেন ভয় কি? যদি আবশ্যক হয়, এই অঙ্গুরীয়স্থিত হলাহল পান করিয়া জীবনত্যাগ করিবেন, তথাপি অস্পৃশ্য, বিধর্ম্মী যবন কখন, তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এদিকে জয়ার অজ্ঞাতসারে নিশা অবসান হইল। উষার ক্ষীণালোক গহ্বরের দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বিহগগণ যেন জয়ার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কাকলিচ্ছলে ক্রন্দন করিতেছে। সমীরণ সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রভাতারুণ: ক্রোধে দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া গগনমণ্ডলে উদিত হইতেছে। এই সময়ে সৈনিকগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক যৎসামান্য আহার করিয়া লইল। পরে মুসলমান সেনাপতি গমনে আদেশ দিলেন। রাজপুত-গণকে মাঝে রাখিয়া যবনসেনা পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। জয়া ও তাঁহার সহচরীগণের শকটের চতুঃপার্শ্বে সশস্ত্র প্রহরী রক্ষিত হইল। সুতরাং অতঃপর পলায়ন অসম্ভব। কিয়দ্দুর গমন করিলে অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে জয়ার শকটবাহী পশুদ্বয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। জয়ার শকটবানকে দূরীকৃত করিয়া একজন গোখাদক তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সে গোদ্বয়কে যতই কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরিশেষে আর এক পদও অগ্রসর হইল না। অনন্যোপায় হইয়া মুসলমান সেনানী জয়ার নিকট আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—"দেবি! অবাধ্য পশুদ্বয় কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। আর আমাদেরও বিলম্ব করিবার সময় নাই। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছুদূর পদব্রজে চলুন। পরে পশুদ্বয় শান্তভাব ধারণ করিলে আবার পুনরায় শকটে আরোহণ করিবেন।" এবার জয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, দলিতা ফণিনীর ন্যায়

গর্জ্জিয়া বলিলেন, "যবন ? জানিও রাজপুত রমণী মরিতে ভীতা নহে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে এখনই আমি আত্মহত্যা করিব। যতক্ষণ পশুদ্বয় শান্ত না হয়, ততক্ষণ আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিব। যবন সেনাপতি রাজপুত জাতির নির্ভীকতা ও অটল প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত ছিলেন এবং কিরূপে রাজপুত রমণী হাসিতে হাসিতে জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তজ্জন্য তাদৃশ কঠোরতা প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু যখন অনেক ক্ষণের পরও গোদ্বয় পূর্ব্বমত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিয়া গমনে অসম্মত হইল, তখন, জয়াকে বলিলেন "অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আপনাকে পদব্রজেই যাইতে হইবে। আমাদের আর তিলার্দ্ধ বিশ্রাম করিবার ক্ষমতা নাই।" এই সময়ে শকটবান্ সবলে কশাঘাত করায় গোদ্বয় এরূপ উদ্ধত হইয়া উঠিল যে, শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল ও জয়া দুইজন সঙ্গিনী সহ শকট হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। যবন সেনাপতি শশব্যস্তে জয়াকে উত্তোলন করিতে গমন করিলেন। জয়া বিরক্ত ও ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, অস্পৃশ্য যবন! একপদ মাত্র অগ্রসর হইলে এই অঙ্গুরীয়কের বিষপান করিয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিব!"

ইহা দেখিয়া যবন ধীরভাবে বলিল, "দেবি! এবিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমাকে দোষ না দিয়া এই দুষ্ট পশুগণকে তিরস্কার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে পদব্রজে গমন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এ বন্ধুর ভূমি আপনার গমনের অনুপযুক্ত হইলেও আমাকে বাধ্য হইয়া এবিষয়ে অনুরোধ করিতে হইতেছে।"

জয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "আমি এস্থান হইতে এক পদও অগ্রসর হইব না।" এই বলিয়া করস্থিত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। চকিতের ন্যায় যবনসেনাপতি তাঁহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অঙ্গুরীয়ক কাড়িয়া লইলেন এবং বিরক্তি সহকারে বলিলেন। রাজপুত্রি! আপনি বারবার আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতেছেন। এখন যাঁহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। আমি সহসা আপনার প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন করিবনা।" ক্রোধে এবং অপমানে গর্ব্বিতা রাজপুতকন্যার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তিনি কোনও উত্তর না করিয়া সখীগণ সঙ্গে দ্রুতপদে সেই বন্ধুর উপত্যকা ভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ।

নারীধর্ম্ম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (স্বরস্বতী) প্রণীত।

শিক্ষা যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন, ইহা বোধ হয় কাহাকেও আজি কালি বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মানুষকে মানুষ করিবার জন্য মানব সমাজে সুখসাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, মানবপরিবারের সুখশান্তি আনয়নের জন্য এবং ইহকালে ও পরকালে ভগবৎকৃপা লাভের জন্য, সুশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। সুশিক্ষার অভাবে মনুষ্য পশু অপেক্ষাও অধম, নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণ্য হইয়া যায়। এহেন শিক্ষা যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অত্যাবশ্যক, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু এমনই আমাদের দুর্দ্দিন আসিয়াছে, যে আমরা একথা বুঝিয়াও বুঝি না। পুরুষের শিক্ষার জন্য কত আয়োজন হইতেছে, কত অর্থ ব্যয় হইতেছে, কতই কি হইতেছে, কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারও কোন রূপ যত্ন নাই, চেষ্টা নাই, আগ্রহ নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বঙ্গের অধিকাংশ রমণীই অশিক্ষিতা হইয়া গৃহে গৃহে দুঃখ ও অশান্তির হলাহল ছড়াইতেছে, কত নন্দন, কানন স্বরূপ গৃহকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে; যেখানে সুখের উৎস ছুটিতেছিল, তথায় দুঃখের দারুণ কোলাহল উঠিতেছে; যেখানে স্বর্গীয় পবিত্রতা বিরাজ করিতেছিল, তথায় নরকের কলুষরাশি আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। এই সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তাই বঙ্গরমণীকুলের সুশিক্ষার জন্য আমাদের "বীরভূমির" পাঠকগণের সুপরিচিতা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী স্বরস্বতী (ইনি সম্প্রতি সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন) "নারীধর্ম্ম" নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যিনি এতদিন কবিতার মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গীয় নরনারীর চিত্তে আনন্দের হিল্লোল তুলিতেছিলেন, আজ তিনি শিক্ষয়িত্রীর বেশে বঙ্গের গৃহদ্বারে উপস্থিত। গ্রন্থকর্ত্রী নিজে রমণী, রমণীর দোষ গুণ তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। রমণীর মানসিক রোগের চিকিৎসা করিতে তিনি যেমন পটু, কোন পুরুষে তেমন হইতে পারিবেননা। তাই আশা হইতেছে, নগেন্দ্র বালার এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বঙ্গের প্রতি অন্তঃ-

পুরে প্রবেশ করিয়া রমণীগণের হৃদয়কালিমা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। সেই জন্য অতিশয় অহ্লাদের সহিত আমরা এই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবারও প্রয়াসী হইয়াছি।

নগেন্দ্রবালা প্রথমেই স্ত্রীকে স্বামি ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন। স্বামিই রমণীর এক মাত্র গুরু, একমাত্র দেবতা ও একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, সুতরাং রমণীগণের স্বামি সেবাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দেশের স্ত্রীগণকে যে একথা বুঝাইয়া দিতে হইতেছে, ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়। যুগের পর যুগ অতীত হইয়াছে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আর্য্য সমাজের শাসনগ্রন্থি শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর যাহাই হউক, হিন্দুনারীগণ সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। তবে ধর্ম্মের ব্যভিচার পূর্ব্বকালেও ছিল, এখনও আছে। এসম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য ও অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্মের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী হিন্দুনারীগণকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

রমণীর উপর পারিবারিক সুখ নির্ভর করিতেছে। একটি পরিবার সুশৃঙ্খলায় শাসন ও একটি রাজ্যশাসন উভয়ই একরূপ কার্য্য। রাজ্য, শাসনে যেরূপ কঠোরতার সহিত কোমলতা, ন্যায়ের সহিত দয়া, পরিণাম-দর্শিতার সহিত ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয়, পরিবার রূপ রাজ্য শাসনেও ঠিক ঐরূপ গুণাবলীর ব্যবহার করিতে হয়। রমণীগণই পরিবার রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী; পরিবারের সুখ শান্তি সমস্তই তাঁহা-দেরই উপর নির্ভর করিতেছে। এত ক্ষমতা যাঁহাদের, এত দায়িত্ব যাঁহাদের, তাঁহাদের কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু হায়! কয় জন হিন্দুরমণীর মধ্যে উপরি উক্ত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়? কয়জন কর্ত্তব্য পালন করে, কয়জন তাহা বুঝে, কয় জনেরইবা বুঝিবার শক্তি আছে? বাড়ীর যিনি গৃহিণী, তিনি জানেন না, শিশুগণের কোমল মতি কুপথে ধাবিত হইলে কিরূপ কঠোর অথচ সস্নেহ ব্যবহারে তাহাদিগকে সুপথে আনিতে হয়, কিরূপে বধূগণের হিংসাদ্বেষ নিবারণ করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়, এক কথায় কিরূপে সুদক্ষ কর্ণধারের ন্যায় পরিবার-তরণীকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া সুখ

সাগরের উদ্দেশে চালিত করিতে হয়। যেস্থলে একটি সুমিষ্ট কথা প্রয়োগ করিলে সকল রোষ, সকল বিদ্বেষ, বিদূরিত হয়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়, গৃহিণী হয়ত সেখানে এমন একটি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, যাহাতে সমগ্র পরিবারের মধ্যে অশান্তির অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অধিকাংশ বঙ্গনারীগণের মধ্যে, বাক্যে সংযম নাই, ব্যবহারে অপক্ষপাতিত্ব নাই, পরদুঃখে সহানুভূতি নাই, নিজদুঃখে ধৈর্য্য নাই। আছে কেবল পরশ্রী-কাতরতা, সঙ্কীর্ণতা, কলহপ্রিয়তা, অত্যধিক কুসংস্কার, ও অতি হেয় স্বার্থপরতা! যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা জানেন, এরূপ স্ত্রীলোক লইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহিণী দেখিয়া শুনিয়া, কন্যাকর্ত্তার যথা সর্ব্বস্ব লইয়া একটি পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন। ভাবিলেন, এই যে পরের কন্যা তাঁহার গৃহে আসিল, সে নামে তাঁহার পুত্রবধূ, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার ক্রীত দাসী। তাহার কোন অধিকার থাকিবে না, কিছু সম্মান থাকিবে না, কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিবে না, থাকিবে কেবল, ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা ও অবমাননা। আহা! সুকুমার বয়সে মাতাপিতার অঙ্করূপ স্বর্গ হইতে বিচ্যুতা হইয়া বালিকা কি ঘোর নরকে পতিত হয়! শিশু প্রথম অপরাধে সর্ব্বত্রই সামান্য দণ্ডে বা বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পায়। কিন্তু এই বালিকা বধূর কোন দোষেরই মার্জ্জনা হয় না। কিন্তু মানব সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। বিনাপরাধে বা স্বল্পাপরাধে পুনঃ পুনঃ দণ্ডিতা হইয়া বালিকা অবশেষে শ্বশ্রুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে কত সোণার সংসার ছারখারে গিয়াছে। স্ত্রীলোকের অবিবেচনায়, অপরিণামদর্শিতায়, অন্ধ বিশ্বাসে কত স্নেহের পুত্তলি সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ কত অনর্থ যে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপরে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা অধিকাংশ বঙ্গরমণীর প্রতি প্রয়োগ করা চলে। তবে এ কথা স্বীকার না করিলে মহাপাপ হইবে, যে এখনও বঙ্গগৃহে অনেক রমণী আছেন, যাঁহারা নানা সদ্‌গুণালঙ্কৃতা ও সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদের সংখ্যা বড়ই কম।

বঙ্গনারীর এই দুরবস্থা অপনোদনের উপায় কি? ইহার একমাত্র উত্তর শিক্ষা। কিন্তু কিরূপে শিক্ষা দিতে হইবে? হিন্দুর মেয়ে কখনই এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি এ, পাশ করিতে যাইবে না। তাহা হইলে আর হিন্দু-

য়ানী থাকে না। পাঠশালা প্রভৃতিতে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে বালকগণের যে কি শিক্ষা হয়, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা পাঠশালায় বা স্কুলে ছেলেদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি কিছুই হয় না। ঐরূপ স্কুলের ফাঁদে মেয়েদের আর ফেলিয়া কাজ নাই। মেয়েরা যাহাতে হৃদয়বতী হয় ও সেই সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ হয়, এইরূপ শিক্ষা তাহাদের দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বিভিন্ন প্রণালীর স্কুল স্থাপন ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হয়। যাহাতে হিন্দুনারীকে সংসারে আবার দেবীরূপে দেখিতে পাই, এমন শিক্ষা দিতে হইবে।

নগেন্দ্রবালা তাঁহার পুস্তকে অতি বিশদ ভাবে বঙ্গীয় রমণীগণের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে শান্তি ও সুখ বিরাজ করে, তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। পুস্তক খানি সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত। আশীর্ব্বাদ করি, নগেন্দ্রবালা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া এমনি ভাবে বঙ্গনারীগণের কল্যাণ সাধন করুন।

শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেবল মাত্র পুস্তক পাঠে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন হয় না। পরিদর্শনের অভাব হইলে আমাদের সকল বিষয়েরই জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এক্ষণে পরিদর্শনের বিধি ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বাহ্য জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদিগকে সম্যক মনোযোগের সহিত দর্শন করিলে যে আমাদের নানা বিষয়ের জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পারাবত হইতে দম্পতী প্রেম, মধু মক্ষিকা হইতে শ্রমশীলতা, ইত্যাদি অনেক পদার্থ হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে। মানবের জীবন যদি অতি দীর্ঘ হয়, তবে মানব মনে করিলে যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা বহুশিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু নিয়তির অবিচলিত ব্যবস্থায় সকলকেই নাতিদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়। এই জন্য কেবল মাত্র জাগতিক পদার্থ পরিদর্শন দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিব,

এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে সকলকেই হতাশ হইতে হইবে। সেই জন্য পুস্তকে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অগ্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতিরূপ মহাপুস্তক ধীরভাবে অধ্যয়ন কর। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে—চিত্তের প্রসাদ জন্মিবে। কিন্তু গৃহে বসিয়াও প্রকৃতির পুস্তক পাঠ করা হইতে পারে না। শিক্ষার্থীকে নানা স্থানে গমন করিতে হইবে, নানা জাতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষ ও পরিদর্শন করিতে হইবে, এবং সকল পদার্থ হইতেই কিছু না কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। তবেই পুস্তকাধীত বিদ্যা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে।

কিন্তু এই নিখিল জগতের যাবতীয় পদার্থ পরিদর্শন সহজ ব্যাপার নহে। কিরূপ ভাবে পরিদর্শন আরম্ভ করিতে হইবে, ইহা এক কঠিন সমস্যা। পৃথিবীর অগণ্য পদার্থ পরিদর্শন সময়ে একের সহিত তাহার অনুরূপ পদার্থের পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন এইজন্যই পরিদর্শন সময়ে যাবতীয় পদার্থকে শ্রেণীবিভক্ত করা কর্ত্তব্য। এই শ্রেণীবিভাগ প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু যত্ন ও পরিশ্রমে অবশ্যই সফলতা আসিবে। স্রষ্টার আশ্চর্য্য কৌশলে সকল পদার্থেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য ও একতা দৃষ্ট হয়। আবার সেই সঙ্গে অপরের সহিত পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনুষ্য ও বৃক্ষের কথা বলা যাইতে পারে। উভয়েরই জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। অথচ, যে প্রণালীতে উহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়, তাহা একরূপ নহে। এইরূপ অনেক পদার্থেই একতার সহিত বিভিন্নতা মিলিত আছে। এই টুকু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। আবার যাহা স্পষ্টতঃ এক জাতীয় পদার্থ বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয়, তাহার মধ্যেও পার্থক্য আছে। আপাততঃ বোধ সকল মানবেরই অবস্থা একরূপ। কিন্তু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, একজন মনুষ্য অপর মনুষ্য হইতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। সকলের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় সম্পূর্ণ একরূপ নহে। তাহা যদি হইত, তবে সকল মানবই একরূপ হইয়া যাইত। সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আমাদের পৃথক্ ভাবে আলোচ্য। এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত সকল পদার্থ আলোচনা করিলে তবে আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিদর্শন করিয়া পদার্থ সম্বন্ধে বিষয় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সংগৃহীত বিষয় সমূহের আলোচনা ও বিচার করিলে পরিদর্শন শিক্ষা পক্ষে কার্য্যকারী হয়। কারণ, পদার্থ সকলের কেবলমাত্র পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ক ধারণা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধিত হয় না। যে কোন বিষয়ই হউক না, তাহার সকল দিক বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন না কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় এবং সেই মীমাংসিত বিষয় আমাদের জীবননির্ব্বাহে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া থাকে। ইতিহাস পাঠে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা। কারণ ইতিহাস বর্ণিত ঘটনাবলী পাঠ করিয়া আমরা তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি। কার্য্যক্ষেত্রে কখন কি উপায় অবলম্বন করিলে জয়ী হইব, সে সম্বন্ধে

বহুবিধ শিক্ষালাভে সক্ষম হই। ইতিহাস পাঠ এক প্রকার অতীত কালের ঘটনাবলীর পরিদর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অধুনা আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে ইতিহাস এইরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইতিহাস পাঠে যে বালকদিগের চিন্তা ও বিচার শক্তির পরিপুষ্টি সাধিত হয়, তাহা শিক্ষক ও ছাত্র কেহই ধারণা করেন না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই ইতিহাস বর্ণিত ঘটনাবলী স্মৃতিপথে দৃঢ়ীভূত হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও এবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উদাসীন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে উপাধি পরীক্ষা অবধি বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে চাহেন যে, ছাত্রেরা পুস্তকে বিবৃত বিষয় উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়াছে কিনা? যে বিষয় পুস্তকে বিশেষ রূপে মীমাংসিত থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে দিয়া ছাত্রদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় লওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ভাবে ইতিহাস পাঠের উৎসাহ দেওয়া সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য। যদি আমারা এই এই ঘটনা দ্বারা এই এই ঘটনা কেন ও কি প্রকারে হইল, তাহা না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে কেবলমাত্র ঘটনাবলীর সূত্র মুখস্থ করিয়া আমাদের কি ফল হইবে?

কোন বিষয় পাঠ বা পরিদর্শন করিয়া তাহার যদি বিচার করিতে না পারি, তাহা হইলে কিছুই ফলোদয় হয় না। বিচারশক্তি মানবের প্রধান প্রয়োজনীয়। এই বিচারশক্তির পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে আমাদের সকল বিষয়েরই তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের প্রকৃতি স্বতঃই আমাদিগকে এ বিষয়ে প্রণোদিত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব ও অপর পদার্থ সকল যে প্রকারে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্যে একভাবাপন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই হেতু মানবও সেই এক শক্তি হইতে একই প্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যেন জীব ও পদার্থ মধ্যে সেই নৈসর্গিক বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধনিচয় অনুসন্ধান করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। ইহা আমরা নিজেই জীবন পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিব। কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে আমাদের জীবনের ঘটনানিচয় পরিদর্শন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমরা সর্ব্বদাই নিজ নিজ জীবনে সাম্য স্থাপন করিতে ব্যগ্র। এক ঘটনার সহিত অপর ঘটনার বৈষম্য দৃষ্ট হইলে, আমরা ধৈর্য্যচ্যুত ও হতবুদ্ধি হই এবং এই অবস্থায় উভয়ের সাম্য স্থাপন করিতে বিশেষ প্রয়াসী হই। তাহার কারণ, পৃথিবীতে সমগ্র বস্তুই কার্য্যকারণরূপে সম্বদ্ধ। তাহাদের কোনস্থলে কোন বৈষম্য ঘটিলে, প্রকৃতি স্বতঃই সেই বৈষম্য দূর করিতে চেষ্টা করে। মানবজীবন হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিলে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন। যখন আমরা নিজে কোন একটা অন্যায় কার্য্য করি, সৎ প্রকৃতির লোক হইলে আমরা অন্যায় স্বীকার করিয়া তজ্জন্য পরিতাপ করি ও পরিশেষে ঘটনাসূত্রে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া "ভ্রান্তি মানবের সাধারণ ধর্ম্ম"

এইরূপ একপ্রকার যুক্তি ও তর্ক দ্বারা নিজের মনোমধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া থাকি। অসদ্ভাব মানবের প্রকৃতিগত নহে। মানব অসদ্ভাব লইয়া জন্মপরিগ্রহ করে না। যদি কেহ বলেন যে, অসৎ পিতার ঔরসে ও অসৎ মাতার গর্ভে জন্মহেতু যে অসদ্ভাব মানবের প্রকৃতিস্থ। কিন্তু তাহা হইলেও মানব অসৎ মাতাপিতা কর্তৃক লালিত পালিত হইলে যে-প্রকার অসৎপ্রকৃতি হয়, তাহার শতাংশের একাংশও অসৎ মাতাপিতা হইতে জন্মপরিগ্রহ হেতু হয় না। পৃথিবীতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানব যেরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকে, তাহার প্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত হয়, কিন্তু এই সঙ্গে যদি তাহার শিক্ষা হইয়া ভাল ও মন্দ বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা হয়, তাহা হইলে, তাহার অসৎ সহবাসের ফল প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণে তিরোহিত হয়। সুতরাং মানব যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহার শিক্ষা-বিচারশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক। এই বিচারশক্তির পরি-পুষ্টি সাধন করাই মানবজীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিচার-শক্তি মানবের প্রকৃতিগত। পৃথিবীতে এরূপ অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা জগতের কার্য্যসমূহের কারণ অনু-সন্ধান করেন না; তবে এ বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এক বিষয় অন্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও আমরা বিচারশক্তির দৌর্ব্বল্য-হেতু একেকে অন্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করি। যেহেতু আমরা সর্ব্বদাই এক বিষয় ঘটিবার পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই কারণসূত্রে অভিহিত করি। এবং এই জন্যই ঘটনাসূত্রে এক ঘটনার পূর্ব্বস্থিত ঘটনাকে প্রথম ঘটনার কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিই। অনু-সন্ধান করিলে আমরা জানিতে পারিব যে,পল্লীস্থ গৃহস্থ মধ্যে কোন না কোন গৃহস্থের নারিকেল বা তজ্জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করা নিষেধ। কারণ ঐ পরিবারে একব্যক্তি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিবার অগ্রেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যদিও উল্লিখিত বিষয় দুইটির একের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই—তথাপি ঐ পরিবারে নারিকেল বৃক্ষ রোপণই সেই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় স্বীকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু সম্যক বিচারশক্তিশালী ব্যক্তি কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হইবেন না। শোকে বিহ্বল হইলে তাঁহার বিচারশক্তি তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

বিচারশক্তির উৎকর্ষসাধন মানবজীবনের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বদা সকলকেই অতি সাবধানে বিচারশক্তির প্রয়োগ করা উচিত। বিচার করিবার পূর্ব্বে বিচার্য্য বিষয়ের সর্ব্ববিধ জ্ঞানলাভ একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা বিচারফল কলুষিত হইবে। বিচারশক্তির দৃঢ়তাসম্পন্ন করিতে হইলে, সকল ব্যক্তিরই গণিতশাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। গণিতশাস্ত্রের সকল বিষয়ই সুযুক্তিপূর্ণ। এইজন্য আমাদের ঐ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান ও পারদর্শিতা

লাভ হইলে যুক্তিশক্তি বলবতী হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা আমরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আরও অধিক বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এইরূপে যুক্তিশক্তি কিঞ্চিৎ দৃঢ়তাসম্পন্ন হইলে, আমাদের বাহ্যজগতের সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া স্বীয় মনোমধ্যে তর্ক উপস্থিত করা প্রয়োজন। গণিতের নিয়ম যে প্রকার অপরিবর্ত্তনীয়, কার্য্যক্ষেত্রের নিয়মাবলী সেরূপ কোন প্রকার নিয়মাবদ্ধ নহে। এক ঘটনায় বিপর্য্যয় বহুবিধ কারণে ঘটিতে পারে, কিন্তু গণিত শাস্ত্রে এক কারণ দ্বারা একই প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। সুতরাং গণিতের নিয়ম হইতে কার্য্যক্ষেত্রের নিয়মাবলী অনেক বিষয়ে বিভিন্ন, তাহা সদা স্মরণ করিয়া বাহ্যজগতের বিষয়সমূহ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মানবচরিত্রের বিচারিত ফলের অনৈক্য বিচারশাস্ত্রের দোষ সংঘটিত হয় না। বিচারক বিচার্য্য বিষয়ের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতব্য জানিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার বিচারের অন্যথা হইয়া থাকে। এইরূপে সামান্য বিষয় হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য এবং বিচারফলের অনৈক্য ঘটিলে বিচার শাস্ত্রের উপর দোষারোপ করিয়া ভগ্নোদ্যম ও নিরস্ত হওয়া সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ।

ভারতেশ্বরীর স্মৃতি-চিহ্ন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমনে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ দেশের নানাস্থানে সভা সমিতি হইতেছে। স্মরণচিহ্ন কি আকারে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে নানাস্থানে নানারূপ জল্পনা কল্পনাও হইতেছে এবং এ বিষয়ে বাদ-বিসম্বাদেরও অভাব নাই। ফলতঃ, এক শ্রেণীর লোক কোনও রূপ অট্টালিকাদির নির্ম্মাণ অথবা স্বর্গীয়া অধিরাজ্ঞীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন দ্বারা তাঁহার স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং অপর শ্রেণীর লোক ভারতের বাণিজ্য শিল্পাদির উন্নতিকল্পে কোনও রূপ স্থায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকগতা মহিষীর স্মৃতি ভারতবাসীর মনে অনুক্ষণ জাগরূক রাখিবার প্রয়াসী। বৃহতী অট্টালিকা দ্বারা স্মরণচিহ্ন স্থাপন নূতন নহে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রা সহরে ভূতপূর্ব্ব সাহজেহান বাদশাহের মমতাজমহল বেগমের সমাধিস্থান তাজমহল শুধু ভারতে নহে, সমস্ত জগতে এ বিষয়ের অদ্বিতীয় এবং অনুপম দৃষ্টান্ত।

মহারাণীর পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই, মোগল-গৌরব তাজমহলের সমতুল্য না হউক তদ্বিধ একটী অট্টালিকা দ্বারা স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরীর স্মৃতি-ধ্বজা আকাশপথে উড্ডীয়মান হউক, এইরূপ প্রসঙ্গ এ দেশীয় পাইওনীয়র-প্রমুখ প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রে আলোচিত হইয়াছিল।

আমাদের বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কলিকাতার রাজকীয় প্রাসাদের সমীপে একটী উপযুক্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণের বাসনায় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসি গণ কলিকাতার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে সাহায্য করা ব্যতীত স্বীয় প্রদেশের স্থানে স্থানে মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন।

মহারাণীর রাজত্বে আমরা যে সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়াছি, সিপাহী বিদ্রোহের পরে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় প্রজার প্রতি সতত সদয় ও ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহারের যে পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন জন্য কোনও রূপ প্রসঙ্গই আমাদের নিকটে অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অধিকন্তু, যে জাতি সম্রাটকে "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" বলিয়া বিশ্বাস করে, অধিরাজের প্রতি যাহাদের ভক্তি অচলা, তাহারা রাজসেবার নিমিত্ত স্বকীয় দরিদ্রতা সত্ত্বেও অজস্র অর্থব্যয় করিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র কি?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই অতীব চিন্তার বিষয়। আমাদের মনের উপর চিরানুগত প্রথার আধিপত্য এত অধিক যে, আমরা এখনও তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন অথচ হিতগর্ভ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। দেশের লোকসংখ্যা অপ্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; অচিরেই বর্ত্তমান লোকগণনার ফলে জানিতে পারা যাইবে, এ বিষয়ে মা ষষ্ঠি আমাদিগকে কতদূর কৃপা করিয়াছেন। স্বাভাবিক নিয়মের অবিরাম গতিতে জীবন সংগ্রাম দিনদিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে; ভারতের জীবিকার্জ্জনের প্রধান এবং বলিতে গেলে একমাত্র উপায় কৃষি নানা কারণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং বর্ষার চাপল্যে সময়ে সময়ে মৃতপ্রায়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতির সম্বন্ধ আমাদের সহিত ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থ ব্যয় যদি সঙ্গত অথচ প্রয়োজনীয় রূপে করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা হইতে বিরত হওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য?

সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারা স্বর্গীয়া রাজ্ঞীর স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রশস্ততা সম্বন্ধে আমি কোনও রূপে সন্দিহান নহি। বরং ইহাকে একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই বিবেচনা করি। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় প্রকৃষ্টতম উপায়ই অবলম্বন করা যে বিধেয়, আশা করি, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইবেনা।

এবিষয়ে বোম্বাই প্রদেশ সকলের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীগণ ভিক্টোরিয়া ফণ্ড" স্থাপন করিয়া এই ফণ্ডের আয় হইতে "যাবৎ গঙ্গা মহীতলে" তাবৎ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতভার স্বহস্তে গ্রহণ কালে স্বর্গীয়া

মহারাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতে শান্তি স্থাপিত হইলে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রীতিমত যত্ন গৃহীত হইবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ভারতীয় শিল্পের অবনতিই ঘটিয়াছে। বোম্বাই-বাসীগণ উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া স্বর্গীয়া রাজ্ঞীর অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যই করিয়াছেন।

কোনও আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, আমাদের বীরভূম জেলার লোকপ্রিয় সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, আহমেদ সাহেব বাহাদুরের উদ্যোগে কয়েক দিন পূর্ব্বে উক্ত অভিপ্রায়ে সিউড়িতে একটী সভার অধি-বেশন হইয়াছিল। বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বীরভূমে নবযুগের অব-তারণা করিয়াছেন; সুষুপ্ত বীরভূমবাসীকে কিয়ৎ পরিমাণে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন; দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বিষয়ে তাহাদের উপলব্ধির উৎপাদনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আহমেদ সাহেবের প্রতি বীরভূমবাসীর কৃতজ্ঞতার ইয়ত্তা নাই।

শুনিলাম, শিউড়ির নূতন টাউনহলে মহারাজ্ঞীর মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে, তজ্জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। বীরভূম অপেক্ষাকৃত দরিদ্রবহুল স্থান; কি পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিতে পারি না। তবে হেতম্-পুরের রাজা বাহাদুর, দুবরাজপুর ও বোলপুরের ব্যবসায়িগণ, সিউড়ির ব্যবহারজীবী ও কর্ম্মচারীগণ, কুণ্ডলার মুখোপাধ্যায়গণ, কীর্ণাহার, লাভপুর, বাজিতপুর, দমদমা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ চেষ্টা করিলে আবশ্যকীয় অর্থ অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। অধিকন্তু উপযুক্ত উপায়ে প্রত্যেক পল্লীবাসীর সমীপস্থ হইতে পারিলে তাঁহারাও স্বাধীনেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সাহ্লাদে এই বিষয়ে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন, এরূপ ভরসা আছে।

অবশ্যই মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি বীরভূমবাসীর রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ চির-কাল টাউন হলের শোভা বর্দ্ধন করিবে; কিন্তু কেবল শোভা বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে যদি বীরভূমের কোনও রূপ স্থায়ী উপকার সাধনের জন্য উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে কি সর্ব্বথা সুখের বিষয় হয় না?

সংগৃহীত অর্থে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া তাহার সুদের আয়ে এক বা ততোধিক মাসিক বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা রাজসাহীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের স্থাপিত রেশম বিদ্যালয়ে অথবা শিবপুর কৃষি-কলেজে প্রতি বৎসর এক বা ততোধিক বীরভূমবাসী প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককে প্রেরণ করিয়া রেশম বা কৃষি বিদ্যায় পারগ করিতে পারিলে বীরভূমের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে। অবশ্যই এই বৃত্তি জেলা বোর্ডের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। চেষ্টা করিলে বীরভূমে রেশমচাষ প্রসার প্রাপ্ত হইতে পারে এবং বীরভূমবাসী তাহা হইতে লাভবান্ হইতে পারিবে। যদি সংগৃহীত সমস্ত অর্থ এইরূপে ব্যয়িত হওয়া উপযুক্ত বলিয়া

বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে কিয়দংশও এবম্বিধ প্রকারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।

সতীদাহ।

সে অনেক দিনের কথা। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, তখন হুগলি জেলার মাজিষ্ট্রেট্। একটি হিন্দুরমণীর স্বামী গতাসু হইয়াছেন; রমণী তাই সর্ব্বসন্তাপহারিণী জাহ্নবীতীরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পরলোকগত স্বামীর সঙ্গলাভ বাসনায় আসিয়াছেন। বাড়ী অনেক দূরে, সেই জন্য স্বামীর মৃতদেহ আনয়ন করা হয় নাই। তাঁহার উত্তরীয় খানি কেবল আনা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখন সতীদাহ নিবারণের আইন হয় নাই। তাহা হইলে কি রমণীর ভাগ্যে স্বামীর অনুগমন ঘটিত? চিরবৈধব্য যন্ত্রণায় তাহাকে আমরণ পুড়িতে হইত।

হ্যালিডে সাহেব আপনার বাঙ্গালায় বসিয়া আছেন। দুইটী সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। একজন ডাক্তার, অপর জন মিশনারি। এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, একটি সতী গঙ্গাতীরে সহমৃতা হইবার জন্য আসিয়াছে। ডাক্তার ও মিশনারি সাহেব এই ব্যাপার দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সুতরাং তিন জনে গাড়ীতে চড়িয়া ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বহুসংখ্যক হিন্দু সমবেত হইয়াছে। চিতা সজ্জিত হইয়াছে। সতী চিতা পার্শ্বে স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। তিনজন সাহেব আসিয়াছেন দেখিয়া লোকে সসম্ভ্রমে তিনখানি চেয়ার আনিয়া দিল। সাহেবগণ তদুপরি উপবেশন করিলেন। সতী যেখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় বসিলেন। ডাক্তার ও মিশনারি সাহেবের ইচ্ছা যে, তাঁহারা কোন রূপে সতীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রাণত্যাগরূপ সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। তাঁহারা জানিতেননা যে, হিন্দুরমণী কিরূপ জীব। প্রমদা যে পতিবশ্যগা, তাহা তাঁহারা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা সতীকে মরণ সংকল্প পরিত্যাগ করাইবার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাদের কথা সতীকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। স্থির, গম্ভীর ভাবে ও সসম্ভ্রমে সতী তাঁহাদের কথা শুনিলেন—কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। আর অপেক্ষা করা চলে না। তাঁহার স্বামী যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন। আর তিনি কতক্ষণ একাকী থাকিবেন? সতী অধীরা হইলেন। হ্যালিডে সাহেবের নিকট চিতারোহণের অনুমতি প্রার্থনা করি-

লেন। বাক্যব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া সাহেব তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু ডাক্তার ও মিশনারীর এখনও জ্ঞান হয় নাই। এখনও তাঁহাদের ইচ্ছা যে, সতীকে কোন রূপে নিবারণ করেন। সেই জন্য তাঁহাদের অনুরোধে হ্যালিডে সাহেব সতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগে কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, তাহা জান ত?" সতী ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সাহেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কোন উত্তর না করিয়া বলিলেন, "একটা প্রদীপ আন ত।"

আজ্ঞা মাত্রা প্রদীপ, ঘৃত ও সলিতা আনীত হইল।

সতী বলিলেন, "প্রদীপ জ্বাল।" প্রদীপ জ্বালা হইল। তখন সতী স্থির দৃষ্টিতে সাহেবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া একটি অঙ্গুলি প্রদীপের শিখায় ধরিলেন। অঙ্গুলি পুড়িতে লাগিল—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, এবং অবশেষে পালক দগ্ধ হইলে যেমন হয়, সেইরূপ হইয়া গেল, তথাপি সতীর পবিত্র মুখমণ্ডলে কোন রূপ যন্ত্রণার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। কোন রূপ যে যন্ত্রণা হইয়াছে, কোন রূপে তাহা প্রকাশ হইল না।

গম্ভীর স্বরে সতী হ্যালিডে সাহেবকে বলিলেন,"কেমন,এইবার বুঝিয়াছ? সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "হাঁ বেশ বুঝিয়াছি। প্রশান্তভাবে দীপশিখা হইতে অঙ্গুলি অপসৃত করিয়া সতী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইবার আমি যাইতে পারি কি?" সাহেব সম্মতি দিলেন। সতী চিতার নিকটে চলিয়া গেলেন। চিতা ৪½ ফিট দীর্ঘ, ৪½ ফিট উচ্চ ও তিন ফিট প্রস্থ। তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া সতী হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া চিতার উপরি শয়ন করিলেন। তাঁহার শরীরের উপর শুষ্কতৃণ বিস্তৃত করা হইল। তাহার পর বৃহৎ বৃহৎ বংশখণ্ড দিয়া তাঁহার শরীরকে চিতার সহিত বন্ধন করিবার উদ্যোগ করা হইল। হ্যালিডে সাহেব ইহাতে আপত্তি করায় উহা কার্য্যে পরিণত হইল না। সতীর ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। সতী চিতায় অনল প্রজ্জ্বলিত করিতে তাহাকে আদেশ দিলেন। ধূপ ও ঘৃত সংযোগে মহাবেগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সতী কোন রূপ আর্ত্তনাদ বা উঠিবার চেষ্টা করে কিনা দেখিবার জন্য হ্যালিডে সাহেব চিতার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন। নীরবে সতীর নশ্বর দেহ দগ্ধ হইয়া গেল; সতীর পবিত্র আত্মা অমরলোকে স্বামীর আত্মার সহিত সম্মিলিত হইল। আহা! সতী ধর্ম্মের কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই পূর্ব্বে দেখা যাইত!

পাঠক, ইহা আমার নিজের কথা নহে। হ্যালিডে সাহেব স্বহস্তে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মাননীয় বক্ল্যাণ্ড সাহেব প্রণীত Bengal under the Lieutenant Governors নামক পুস্তকের ১৬০ পৃষ্ঠা দেখুন।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। [৮ম সংখ্যা।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিবরণ।

যে বিশ্বব্যাপিনী অনন্ত-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিচালিত, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসরূপে প্রতিনিয়তই অবস্থান্তরিত লক্ষিত হইতেছে, ইহা. মূলে তিনটী মাত্র শক্তি বা গুণ আছে। ঐ তিনটী গুণের নাম, যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। এবং ইহাদেরই পরস্পর ভবাভিভব-ক্রিয়া (জয়-পরাজয়) দ্বারা বর্ত্তমান আকারে জগতের অবস্থান্তর ও বিচিত্রতার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। রজোগুণ দ্বারা উৎপত্তি, সত্ত্বগুণ দ্বারা স্থিতি ও তমোগুণ দ্বারা সংহার কার্য্য চলিতেছে। এই যে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-পাহাড়-পর্ব্বতাদিবিশিষ্ট স্থূল জগৎটা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থাই কিছু আদিম অবস্থা নহে; ইহারা সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু-পুঞ্জই সম্মিলিত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে। নতুবা স্থূলপদার্থকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কখনই সূক্ষ্মাকারে বিভাগ করা যাইতে পারিত না। ফলতঃ সূক্ষ্ম পরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগ দ্বারাই যে, স্থূলপদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসসাধন হইতেছে; সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু পরমাণু সকলের সংযোগ-বিয়োগ হয়, কাহার বলে? নিশ্চিতই প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি নিহিত আছে। এবং সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইয়া স্থূলভাব ধারণ করিতেছে; আবার বিপ্রকর্ষণ শক্তি দ্বারা ইহারা পরস্পর বিযুক্ত

হইয়া সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইতেছে। উপরে যে পরমাণুর কথা বলিয়াছি, তাহাও পদার্থ সকলের আদিম অবস্থা নহে। পরমাণু সকলকে আরও সূক্ষ্মাকারে বিভাগ করিলে, অবশেষে শক্তি বা গুণ মাত্রে গিয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ বস্তুর যাহা গুণ বা শক্তি, তাহাই সেই বস্তুর আদিম সূক্ষ্মাবস্থা। স্থূল অগ্নির আদিম সূক্ষ্মাবস্থাই হইল, তাহার দাহিকাশক্তি ; স্থূল জলের সূক্ষ্মাবস্থাই শৈত্যগুণ, ইত্যাদি। অতএব বুঝা গেল যে, এই পরিদৃশ্যমান, স্থূল জগৎটা কেবল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য মাত্র।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কাহাকে বলে এবং তাহাদের ভবাভিভব-ক্রিয়াই বা কি প্রকার, এখন সেই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে,—

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতা, প্রকাশকতা ও নিরুপদ্রবতা জন্য সুখ ও জ্ঞান দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। রজোগুণ তৃষ্ণা ও সঙ্গাভেচ্ছার উৎপাদক অনুরাগযোগে জীবকে কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ

করিয়া থাকে। আর তমোগুণ অজ্ঞানাংশ হইতে উৎপন্ন ও সর্ব্বপ্রাণীর মোহজনক আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। জীবকে সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে নিযুক্ত করিয়া রাখে। ফলতঃ এই গুণত্রয়ের কার্য্য একই সময়ে সমভাবে সম্পাদিত হয় না। কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ ও কখন তমোগুণ প্রবল হইয়া অন্য দুইটী গুণকে পরাভূত ও নিস্তেজ করিয়া দেয়; অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠিলে রজস্তমোগুণের ক্রিয়া ও রজোগুণ প্রবল হইলে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া এবং তমোগুণ প্রবল হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণের ক্রিয়া নিস্তেজ হইয়া যায়। সত্ত্বগুণের প্রবলতার সময় সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ, রজোগুণের প্রাবল্যে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, মানসিক অশান্তি ও আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি এবং তমোগুণের প্রবলতার সময় অজ্ঞানতা, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াপ্রণালী উপরে দর্শিত হইল। এইবার পাঠক! তোমাদের আপন আপন দেহমধ্যে ঐ তিনটী গুণের কার্য্য মিলাইয়া লও। যখন দেখিবে, তোমার মনোমধ্যে ভক্তি বা দয়া বৃত্তির উদ্রেক হওয়ায়, মন প্রসন্ন ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিবে যে, দেহমধ্যে সত্ত্বগুণের প্রবলতা হইয়াছে। যখন দেখিবে, ঘোর অশান্তিতে তোমার মনঃ জর্জ্জরিত, তখন রজোগুণের এবং যখন দেহমধ্যে অবসন্নতা, আলস্য বা নিদ্রাদির ভাব আসিতেছে, তখন তমোগুণেরই প্রবলতা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফলতঃ এই তিনটী গুণের স্বভাবই এই যে, অন্য দুইটীকে পরাভূত করিয়া নিজে প্রবল হইবার জন্য প্রত্যেক গুণই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে এবং উত্তেজক কারণ পাইলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করে। ইহারই নাম গুণত্রয়ের ভবাভিব-ক্রিয়া।

জীবদেহের মধ্যে সত্ত্বাদিগুণের ভবাভিব-ক্রিয়া যে ভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহাই উপরে দর্শিত হইল। বস্তুতঃ কেবল আমাদের দেহের মধ্যে নহে, দেহের বাহিরেও জগৎব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে স্থূল, সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে ঐ ভাবেই ত্রিগুণের ক্রিয়া চলিতেছে। কিন্তু যখন উক্ত প্রকার ভবাভিভব-ক্রিয়া রহিত হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কোন গুণেরই আর প্রবলতা না থাকে, তখন তাহাকে প্রকৃতি বলে।

জগতের আদি কারণ ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতির কথা সংক্ষেপে একরূপ বুঝান হইল। এইবার জ্ঞানময় ও আনন্দময় চৈতন্যের কথা বলিব। শক্তি-ময়ী প্রকৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব (অবিচ্ছিন্ন) সম্বন্ধ; অর্থাৎ প্রকৃতি ব্যতিরেকে চৈতন্য ও চৈতন্য ব্যতীত প্রকৃতি থাকিতে পারে না। প্রকৃতির কর্তৃত্ব (কার্য্যকারিতা শক্তি) আছে, কিন্তু তিনি নিজে অন্ধ জড় শক্তি মাত্র; আবার চৈতন্য কেবল জ্ঞানময় ও আনন্দময় পদার্থ মাত্র, কিন্তু তাঁহার কার্য্যসাধনা শক্তি কিছুই নাই। তিনি কেবল প্রকৃতির কার্য্যে দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী মাত্র। এই প্রকৃতি-চৈতন্যের সম্মিলিত নামই পরব্রহ্ম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে যেখানে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, সেই সেই স্থানেই চৈতন্য পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক জীবদেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া যে, চৈতন্য পদার্থ আছেন, ইহা ত আমরা স্পষ্টতঃ অনুভব করিতেই পারিতেছি। পাঠক! তোমার দেহের যে কোন স্থানে যে কোন ঘটনাই হউক না কেন, যে জ্ঞান দ্বারা তৎসমস্তই তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ, সেই জ্ঞানের নামই ত চৈতন্য; অথবা ঐ জ্ঞানটুকুই 'তুমি' বা 'জীব'। জীবদেহ ব্যতীত জগতের যাবতীয় অচেতন জড় বস্তুতে, এমন কি অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতরেও জ্ঞানরূপী চৈতন্য পদার্থের বিদ্যমানতা আছে; নতুবা জগৎকার্য্যের শৃঙ্খলা থাকিবে কিরূপে? অন্ধ জড়শক্তির ত শৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য করিবার সমর্থ নাই। ফলতঃ ঐ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এক মাত্র চৈতন্যর সাহায্য পাইয়াই ত যেটীর পর যেটী হওয়া আবশ্যক, সেই রূপেই জগৎকার্য্য চালাইতে সমর্থা হইতেছেন। এবং সেই জন্যই জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সম্পাদিত হইতেছে কোথায়ও তাহার ব্যত্যয় ঘটে না।

এই বিশ্বের যতদূর স্থান ব্যাপিয়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চলি-তেছে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি কেবল তাহারই মধ্যে নিবদ্ধ আছেন। কিন্তু চৈতন্য অসীম, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তিনি জগ-তের বাহিরেও সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান। জগৎ তাঁহার একাংশে মাত্র অবস্থিত। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, "হে অর্জ্জুন! আর তোমায় অধিক জানিবার প্রয়োজন

কি? তুমি কেবল ইহাই জানিয়া রাখ, এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশ দ্বারাই ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।

বলা বাহুল্য যে, ঐ অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই পরমাত্মা এবং ইঁহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র যথক্রমে কারণ দেহ, লিঙ্গদেহ ও স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকায়, তাহাই জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ শক্তিময়ী প্রকৃতিই জগতের প্রসূতি বা মাতা এবং চৈতন্যই জগতের পিতৃ-স্বরূপ। গীতাতেও আছে,—

"মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বাযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥"

এই ভগবদুক্তির মর্ম্মার্থ এই যে, "ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার গর্ভাধানের স্থান। আমি তাহাতেই "চিদাভাস" স্বরূপ গর্ভ আধান করিয়া থাকি। এবং সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তৎসমস্তের মাতৃ-স্বরূপা এবং বীজপ্রযোক্তা, আমিই তাহাদের পিতৃস্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া "চিদাভাস" রূপ জীবাত্মাকে দেহবদ্ধ করিয়া থাকে।

উপরোল্লিখিত ভগবদুক্তি দ্বারা যেন কেহ এরূপ না বুঝেন যে, প্রকৃতি ও চৈতন্য পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। প্রকৃতি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তি মাত্র। যেমন তোমার দেহ ও দেহান্তর্গত শক্তি অভিন্ন ও পরস্পরকে পৃথক করিবার যো নাই; ইহারাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃতি-চৈতন্যের পরস্পর সম্মিলিত নামই পরব্রহ্ম; এবং একাধারেই মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অথবা স্ত্রীত্ব পুংত্ব দুইই আছে। কেবল অজ্ঞান শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্যই ইঁহাদের পার্থক্য কল্পিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে,—

"সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং মরৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপুমানিতি ভেদতঃ॥

শিবঃ * প্রধান পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত এব পরাৎপরম॥
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্র রূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া॥
দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥"
ভগবতী গীতা।

ভগবতী গিরিরাজকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন "হে মহারাজ! সৃষ্টির নিমিত্ত আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার রূপকে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শিব * রূপে প্রধান পুরুষ ও শিবারূপে (কালী, দুর্গা, রাধিকা ইত্যাদি) পরমা শক্তি হইয়া থাকি। এই শিব-শক্তিযুক্ত পদার্থকেই তত্ত্বদর্শী যোগিগণ পরাৎপর ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। আমি ব্রহ্মরূপে চরাচর জগৎ সৃজন করি; আবার অন্তঃকালে মহারুদ্ররূপে স্বেচ্ছাক্রমেই সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি। হে মহামতে! আমি দুষ্টদমনের জন্যই পরমপুরুষ বিষ্ণু হইয়া এই সমস্ত জগৎ পালন করি।"

প্রকৃতি চৈতন্যময় পরব্রহ্মের কথা মোটামুটি একরূপ বলা হইল; এই বার জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে।

যখন মহাপ্রলয় হয়, তৎকালে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পূর্ব্বোক্তরূপ ভবাভিভব-ক্রিয়া রহিত হইয়া সত্ত্বগুণ রজোগুণ, রজোগুণ তমোগুণে ও তমোগুণ মূল প্রকৃতিতে মিশিয়া যায়। সুতরাং তখন এই স্থূল জগতের ধ্বংস হওয়ায়, কেবল সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, প্রকৃতিচৈতন্যময় এক ব্রহ্ম মাত্র বিদ্যমান থাকেন। ব্রহ্মের এই অবস্থার নামই নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়াবস্থা। তাহার পর মহাপ্রলয়ের অবসানে কালশক্তির সহায়তায় ও অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবগণের ভোগের সময় উপস্থিত হইলে, ঐ চৈতন্য তদাত্ম্য সম্বন্ধে মূল প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়েন। এবং তৎসূত্রেই প্রকৃতিতে প্রথমতঃ গুণক্ষোভ (ত্রিগুণের চাঞ্চল্য ভাব) হয়; তদনন্তর বসন্তসমাগমে নবোদ্ভিন্ন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলের ন্যায় চৈতন্যযুক্ত উক্ত প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব হইয়া

* এখানে 'শিবঃ' শব্দে ঈশ্বর-পদ-বাচ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিকেই বুঝাইবে।

থাকে। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিতা হয়েন। বস্তুতঃ এই আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র; এবং মূল প্রকৃতির ন্যায় ইনিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও চৈতন্যের সহিত একীভূতা। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি; কিন্তু ইঁহার বিকৃতি আছে। যাহা হউক, তাহার পর ঐ আদ্যাশক্তি হইতে প্রথমেই তমোগুণের আবির্ভাব হইলে, চৈতন্যময়ী অদ্যাশক্তিও সেই তমোগুণে অনুপ্রবিষ্টা হয়েন। তন্ত্রশাস্ত্রে এই তমোগুণ 'মহাকাল' নামে ও আদ্যাশক্তি 'মহাকালী' নামে কথিতা হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা আদ্যাশক্তিকে 'রাধিকা' নামে অভিহিত করেন। তন্ত্রে যে, কথিত আছে, "আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতেই বলপূর্ব্বক বিপরীত রতিতে প্রবৃত্ত হয়েন।" আবার কালীর ধ্যানেও আছে,—

"মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং বিপরীতরতাতুরাম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তি স্বয়ংই অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন।

তাহার পর তমোগুণপ্রবিষ্টা ঐ আদ্যাশক্তি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্বের আর একটী নাম সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্বই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মব্রহ্মা, সূক্ষ্মবিষ্ণু ও সূক্ষ্ম মহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হয়।

এই স্থলে প্রকৃত বৈষ্ণব-মতের সহিত একটা কথার সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে, "গোলোকে রাসমণ্ডলে আদ্যাশক্তি রাধিকা একটী অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন। এবং সেই অণ্ড হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব হয়।" এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্যই এখানে মহত্তত্ত্ব। এবং পূর্ব্বে যে তমোগুণকে "মহাকাল" নামে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তিনিই বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণ; গোলোকে নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। গোলেক শব্দে অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ও রাসলীলা শব্দের অর্থ, বহুরূপা শক্তি সহযোগে সৃষ্টি। শ্রুতিতেও আছে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমর্ত্ততাগ্রে।"

অর্থাৎ অগ্রে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন; পশ্চাৎ তিনিই গুণভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখানে শ্রুত্যুক্ত হিরণ্যগর্ভ, তন্ত্রোক্ত মহাকাল ও বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণ একই পদার্থ; সুতরাং শাস্ত্র সকলের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। কেবল মানবগণের প্রকৃতি

ও রুচিভেদেই শাস্ত্রভেদ হইয়াছে। কিন্তু ফলিতার্থ সকল শাস্ত্রেরই একরূপ।

তদনন্তর মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে তামসিক অহঙ্কার হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ; আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে বায়ু; বায়ু হইতে রূপ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ; তেজ হইতে রস-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র হইতে জল; জল হইতে গন্ধ-তন্মাত্র এবং গন্ধ-তন্মাত্র হইতে ক্ষিতির (মৃত্তিকা) উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ।

পূর্ব্বোক্ত তামসিক অহঙ্কার হইতে যে ভাবে আকাশাদি অতি সূক্ষ্মভূত পদার্থের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাজসিক অহঙ্কার হইতেও যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দ-শক্তির পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শ-শক্তির পাদেন্দ্রিয় ও তৈজস-শক্তির, পয়ুিন্দ্রিয় ও রস-শক্তির এবং উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধ-শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আবার ঐ ভাবেই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দ-জ্ঞানের, ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শ-জ্ঞানের, দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপ-জ্ঞানের, রসনেন্দ্রিয় ও রস-জ্ঞানের এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

উপরে যে "তন্মাত্র" শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি নামক পঞ্চভূতের পূর্ব্বাবস্থা, অতি সূক্ষ্ম ভূত মাত্র। পরে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ হইলে, ইহাদের সূক্ষ্মাংশ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল ভূতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্রতাময় স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময় অনুলোমক্রমে যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, আবার মহাপ্রলয়ের সময় বিলোমক্রমে তাহাতেই তাহার লয় হইয়া থাকে। এইরূপে অনাদি কাল হইতে সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই জগৎ মায়াকল্পিত মিথ্যা পদার্থ ও সচ্চিদানন্দময় শক্তিসংযুক্ত অদ্বয় পূর্ণব্রহ্মের বিবর্ত্ত * মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম

* যেস্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি সময়ে পূর্ব্ববস্তুর অন্যথা ভাব হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি ও শব্দ-তন্মাত্রের বিকার আকাশাদি।

ও মরীচিকায় জল-ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-শক্তি মায়া কর্ত্তৃক ব্রহ্মেও জগৎ ভ্রম হইতেছে। মায়ার একটী বিশেষণ হইল, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, অর্থাৎ ইনি অঘটনাকে ঘটাইয়া দেন, মিথ্যাকে সত্য ধারণা করাইয়া দেন; ইহাই ইঁহার স্বাভাবিক কার্য্য। যেমন সুনিপুণ বাজিকর ভোজবিদ্যাবলে অসময়ে পাকা আম্র আনিয়া উপস্থিত করে, অথচ বাস্তব-পক্ষে সেটী প্রকৃত আম্র না হইলেও দর্শকগণের দৃষ্টিতে যথার্থ আম্র বলিয়াই ধারণা হয়, তদ্রূপ জীবের মায়াপ্রসূত মনঃ ও বুদ্ধির নিকট মায়াকল্পিত মিথ্যা জগৎও স্বপ্নকালীন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

এইবার উপাস্য উপাসক সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহাপ্রলয়ের অবসানে প্রকৃতি চৈতন্যময় পরব্রহ্ম যখন জগৎসৃষ্টি করণে উন্মুখ হয়েন, তখনই তিনি সগুণ ও ঈশ্বর-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশে উপহিত চৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর; এবং অবিদ্যা অর্থাৎ প্রকৃতির মলিন সত্ত্বাংশে উপহিত চৈতন্য অল্পজ্ঞ, অল্পকর্ত্তা ও অল্পশক্তিমান জীব। ফলকথা সমষ্টি-চৈতন্যই ঈশ্বর ও ব্যষ্টি-চৈতন্যই জীব। এই ঈশ্বর যখন রজোগুণাবলম্বী হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মা নামে, যখন সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট জগৎ পালন করেন, তখন 'বিষ্ণু' নামে এবং যখন তমোগুণাবলম্বী হইয়া জগৎ ধ্বংস করেন, তখনি তিনি 'মহেশ্বর' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ একই ঈশ্বর তিন গুণাবলম্বী হইয়া তিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।"

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রকৃতির সহিত চৈতন্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ। সুতরাং একই আদ্যাশক্তি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিবার সময়ে ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মাণীশক্তি, বিষ্ণুর নিকট বৈষ্ণবীশক্তি ও রুদ্রের নিকট রুদ্রাণীশক্তি রূপে কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। ফলতঃ শক্তি ও চৈতন্য এই উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র একের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। চৈতন্যবিরহিতা হইলে প্রকৃতি যেমন জড়-স্বরূপা হইয়া যান,

---

আবার যেস্থলে এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরের উৎপত্তি হইলেও পূর্ব্ববস্তুর সত্তা বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম বিবর্ত্ত। "জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত" বলিলে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সূচিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব অব্যাহত থাকে।

তদ্রূপ ঈশ্বর-মূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও প্রকৃতি বা শক্তিবিরহিত হইলে শবরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। যথা,—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণ-মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম॥"

কুব্জিকা তন্ত্র।

অর্থাৎ ব্রহ্মাণীশক্তিই সৃষ্টি করেন, একা ব্রহ্মার সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি শব মাত্র! বৈষ্ণবশক্তিই জগৎ পালন করেন, বিষ্ণুর পালন করিবার সামর্থ্য নাই; তিনিও শব। এবং রুদ্রাণী শক্তিই সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন; রুদ্রও শব মাত্র। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন; শক্তি সমবেত বিষ্ণু পালন করেন এবং শক্তি সমবেত রুদ্রই সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে ইঁহারা সকলেই জড়স্বরূপ হইয়া থাকেন।

ফলতঃ এই সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য; ব্রহ্মের নির্গুণাবস্থা উপাসনার বিষয়ীভূতা নহে। সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপারের নামই উপাসনা। যথা—

"উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপাণি।"

তন্ত্র।

স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি-ভেদে এই ব্রহ্মপদার্থকে কেহ চৈতন্যময়ী প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীদেবতা ও কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ পুংদেবতা ভাবিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ বা ইঁহাকে স্ত্রী পুংভাবের অতীত নিরাকাররূপে ধ্যান করেন। সুতরাং এক ব্রহ্মপদার্থই বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু, গোপাল ও কৃষ্ণ প্রভৃতি; শাক্তদিগের উপাস্য কালী, তারা ও ত্রিপুরা প্রভৃতি; সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য; শৈবদিগের শিব; ও গাণপত্যদিগের গণেশ নামে অভিহিত। ফলতঃ যে, যে নামেই উপাসনা করুক, এমন কি স্ত্রী স্বামিকে, পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে যে উপাসনা করে, তাহাতে যদি

ব্রহ্মভাব থাকে, তবে প্রকৃতি-চৈতন্যময় পরব্রহ্মের উপাসনাই সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, "যে যে ভাবেই আমার উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃতার্থ করিয়া থাকি।"

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে মূলে ব্রহ্মনিরূপণে কোন গোল নাই; কেবল নাম ও রূপ লইয়াই অজ্ঞান লোক ভেদ কল্পনা করিয়া পরস্পর বৃথা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকগণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্রও ভেদবুদ্ধির উদয় হয় না। তাঁহারা আপন আপন ইষ্টদেবের উপর মুখ্য বুদ্ধি রাখিয়াও অন্যান্য দেবতাদিগকে তাঁহারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র ভাবিয়া তদনুরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন। শক্তি-সাধক সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ কি বলিতেছেন, শুন,—

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

"কালি! হলি মা রাসবিহারী।

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে॥

পৃথক্ প্রণব, নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটী, এলোচুল চূড়া-বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, অনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-হাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্ব্বে শোণিত-সাগরে, নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব
যমুনাবারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি! মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা-তনু, একই সকল বুঝিতে নারি।"

আবার শুন,—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

"তাই কালোরূপ ভালবাসি।

শ্যামা জগন্মনোমোহিনী মা এলোকেশী॥

কালোর গুণ না ভাল জানে, শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব, মহাদেব, কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসী॥
কালো বরণ, ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী, কৃষ্ণ কালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে, তার মধ্যে কেলে মা মোর্, বিরাজে পূর্ণিমা-শশী॥
প্রসাদ ভণে, অভেদ জ্ঞানে, কালোরূপে মেশা-মেশি।
ওরে, একেই পাঁচ, পাঁচেই এক মন করোনা দ্বেষা-দ্বেষি॥"

পাঠক! এইবার এজন প্রকৃত বৈষ্ণব সাধকের কথা শুন। বৈষ্ণব-সাধক কালী দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া, কালীকে 'হরি' সম্বোধনে কি বলিতেছেন, শুন,—

বাউলের সুর—তাল খেম্‌টা।

"হরি! কই সে মোহন বাঁশরি।
কেন ভয়ঙ্করা, অসিধরা, হলে হে বংশীধারী॥
কি লাগি কেলে সোণা, দিগ্‌বসনা, লোলরসনা, হেরি।
ল'য়ে বনমালা, মুণ্ডমালা, কে পরালে শ্রীহরি॥
কেন পায় রুধিরধারা, পড়ে ধরায়, চরণে ত্রিপুরারি।
হলে কার্ ভাবে ত্রিনয়না শ্যাম! বাঁকা নয়ন সম্বরি।
কি কারণে, মত্তরণে, সুধাপানে, দৈত্যারি॥
আবার চূড়া ফেলে, পড়্‌ছো ঢ'লে, উন্মাদিনীর বেশ ধরি।
কোথায় সব ব্রজাঙ্গনা, গোপললনা, কাননে কি রূপ হেরি।
আবার শ্রীচরণে, পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন রাই কিশোরী॥
(ওহে কাঙ্গালের ধন চিন্তামণি)"

ব্রহ্মপদার্থ স্বরূপতঃ নিরাকার। এবং সে নিরাকার রূপ প্রশান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত যোগীজনেরই ধ্যেয়। আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারী, ঘোর সংসারী মানবের বিষয়কলুষিত মলিন অন্তঃকরণে নিরাকার ধ্যান হইতে পারে না বলিয়াই, ভগবান কৃপা করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট মানবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্যই বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দর্শন দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা॥"

অতএব হিন্দু পাঠকগণ! সাবধান, যেন কালী-কৃষ্ণে হরি-হরে ভেদ-বুদ্ধি করিও না। *

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সীতাহাটী।

ঐতিহাসিক ছড়া সংগ্রহ।

(২)

Lieutenant Colonel James Watson (লেফ্‌টেণেণ্ট কর্ণেল জেমস্ ওয়াট্‌সন) এর অধীনে H. M. 14th Regiment of Food (১৪নং পদাতিক সেনা) বহরমপুর হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে, তৎকালীন বীরভূমের অধীন গোকর্ণে পঁহুছিয়া কান্দী, ছোট কপসা, আকলপুর, সিউড়ী, কৃষ্ণনগর, খয়রা শোল, আফজালপুর অতিক্রম করিয়া ১১ই তারিখে অজয় নদীর পর পারে চুড়ুলিয়ার জঙ্গল মহালে প্রবিষ্ট হয় এবং রামণালা চটী, মোতাইনি, ও বিনো রঘুনাথপুর হইয়া পশ্চিমে চলিয়া যায়। মধ্যে এই সৈন্যদলের সিউড়ী সুরুল, ইলাম বাজার, সোণামুখী ও বাঁকুড়া হইয়া যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু অসুবিধা বশতঃ এই বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হয়। পরে নগর হইয়া দেওঘর, চাকাই, নোয়াদা ও গয়া এই রাস্তাও অসুবিধা জনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কারণ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ২০০০ অশ্বারোহী ও পদাতি সহ 'He Highness Amorut Row brother to the Peswah' (পেশোয়ার ভ্রাতা অমারৎ রাও) বারাণসী হইতে বীরভূম হইয়া বৈদ্যনাথ ধাম দর্শনে গিয়াছিলেন ; তখন মধ্যে মধ্যে গভীর জঙ্গল ও নালা থাকায়, দেশীয় সৈন্যগণের রাস্তা অতিক্রম করা কষ্টকর হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে আরও কষ্টকর হইবে, ভাবিয়া এই রাস্তাও পরিত্যাগ করিয়া প্রথমোক্ত রাস্তাই সুবিধা জনক বলিয়া গৃহীত হয়।

* এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ ব্রাহ্মণকুলাভরণে উদ্ধৃত "আগম মতে কালীর ব্যাখ্যা" নামক প্রবন্ধের ভাবার্থ সঙ্কলনে লিখিত হইয়াছে।

বীরভূমে তখন আর মরিসন সাহেব, সহকারী কলেকটার। তাঁহার অধ্যবসায় গুণে সৈন্যগণের রসদ আহরণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। এবং যাহাতে প্রজাগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয় ও তাহারা রীতিমত রসদের মূল্য প্রাপ্ত হয়, তাহারও বিহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তবে এতদঞ্চলে সৈন্যসঞ্চালনের প্রথা তত প্রচলিত না থাকায়, তদানীন্তন বীরভূমবাসী অত ইংরাজ সৈন্য দেখিয়া একবারে বিব্রত হইয়াছিল। বলিতে কি, মরিসন সাহেব, বীরভূমের অধিবাসিগণ অধিকাংশ হিন্দু বলিয়া গোহত্যার পরিবর্ত্তে সৈন্যগণের জন্য ৪০।৫০ টি ভেড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ চারি পাঁচ শত সৈন্য আসিবার কথা হয়। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনের ৪।৫ দিন পূর্ব্বে Assistant Commissary General এর নিকট হইতে খবর আইসে যে, 'H. M. 14 Regiment will not move as originally intended in 2 divisions; but the whole will proceed together amounting to 900 men, exclusive of officers and camp-follower's—14 December, 1814. অর্থাৎ অপরাপর লোক ছাড়া ৯০০ শত সৈন্য আসিবে। এই ছড়াটি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

'গোরার কবিতা।'

শুন সবে এক ভাবে বিপত্তের কাজ
জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাজ।
থাকে সব বরমপুরে, ফৌজ জুড়ে, কি দিব তুলনা
এক এক গোরার পিছু, সিপাই তিন জনা।
এমন নয়শ' গোরা, হাতি ঘোড়া, তার তেমন সোয়ারী
নফর চাকর, বেটবেগারী, লিখিতে না পারি।
জাবে সব পশ্চিমেতে, আচম্বিতে, আইল পরওয়ানা
জমীদার লোক শুনে, করিছে ভাবনা।
তারিখ সন ১২২১ সাল অর্দ্ধেক পৌষ মাস
আচম্বিতে শুনে লোকের লাগিল তরাস।

জেলা বীরভোমে, সিউড়ী গ্রামে, জজ সাহেবের থানা
লাটে লাটে জমীদার পাইল পরওয়ানা।
সাহেব ডেকে বলে, রেয়ৎ লোকে, সাবধান হও তোমরা
এই রাস্তা দিয়া জাবে বাদসাই গোরা।
তাদের খোরদানা, জত জমা কর সকল মুদি
জেলাদারে হুকুম দিল কর রাস্তাবন্দি।
হাকিমের হুকুম শুনে, সেনা বেনে, ভাবিছে অন্তরে
ভাবনায় ভাবুচি লাগে ভেকাচুকি ধরে।
বলে ভাই ফৌজ আসিবে, কিবা হবে, বিষম ফৌজের লেঠা
দেখবেক্ যাকে, বান্দবেক তাকে, মানিবেক নাই তারা ॥
দুয়ারে দুয়ারে দিল সিয়াকুলের কাঁটা।
বলে ভাই, পড়লো দায়, রৈতে নারি ঘরে
গরু জরু সকল নয়ে পলায় দোশান্তরে।
পলায় সব কলুমালি, তিলি তামলি, মনে পেয়ে ভয়
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে রয়।
তাঁতি ভাই তাঁত ছেড়ে, লুকায় তাঁতের গাড়ে।
জমীদার গ্রামে গ্রামে, পেয়দা লয়ে, আনে মণ্ডল ধরি
তোমরা, খাবার খোরদানা দাও, বেট্ আর বেগারি।
লাগিবেক বলদ সগড়, রগড় ঝগড়, না করিহ ভাই
হাঁড়ি কাট পাত খাসি বখ্রি ভেড়া চাই।
পাবে সব দাম ধরে, লেখা করে, জিনিষ দেহ আনি
চাল ডাল লবণ তৈল ঘৃত আটা চিনী।
বলদের খোরদানা চাই আউড় পোয়াল লাড়া
জিনিষ দিতে কোন কাজের ওজর না করিহ তোমরা
বিষম ফোজের লেঠা—
দুয়ারে দুয়ারে দিল সিয়া কুলের কাটা।
আনালো স্থত্রধরে ইজাদারে লাগয়ে কোটাল
রাস্তাবন্দি হবে বাছা কাট গিয়া ডাল।
জাবে সব হাতি ঘোড়া, হাওদা চড়া, বিষম ফোজের লেঠা
জেতে পথে, ঠেক্‌বেক্ মাথে, মার খাবি তু বেটা।

আনালো কর্ম্মকারে, জারী করে, লাগায়ে কাটাল
গ্রামের ইজাদার।
বলে গোলমেক্ বনায়ে দাও হাজারে হাজার।
একটি জাবীন দাও, ভাল চাও, শুন কামার ভাই
তারিখ সাতাশে পোষে গোলমেক্ চাই।
তখন কোটাল ডেকে, কেয়ট্ দিকে, আনালো তৎকাল
তারা হেষ্ট মাথে, আস্‌ছে পথে, বুন্তে বুন্তে জাল।
বলে জানছি মনে, মাছ কারণে, ডাকাইলে মোরে।
ইজাদার কৈছে তারে, মাছের তরে, ঘন নাড়ি মাথা
কেয়ট বলে, এত জাড়ে মাছ পাব কোথা।
শুনে উঠলো রেগে, মাছের লেগে, রাখ বেটাকে ধরে
দেখে দাপ, বলে বাপ্, জালে লাগলো গিরে। ৫১
আনালো ফকির যত, দেড়াল তত, সহিত খাদিম
বলে মুরগী কুখুড়ো বাহা দাও তার ডিম।
আনালো ত্বরা ক'রে, ~~পাত নেড়ে~~, জত মুছলমান
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।
এম্নি দিবা নিশি, রাস্তায় বসি, করে হিয়া চিয়া
সাতাশে পোষের কথা সকল হৈল ভূয়া।
করে লোক পিঠা নাটা, চাল কুটা, ফোজের কথা ছেড়ে
ডুপুর দাপুর ধুপুর ধাপুর প্রতি ঘরে ঘরে।
মনে আনন্দ হল, ঘর্‌কে এল, পলায়েছিল যত
পোষ মাস গত হইল মাঘ উপনীত। ৬১
শুন সব মন দিয়া সর্ব্বজনে মঙ্গলার স্থানে
দেয়ালে পড়িয়া লেখন, ভাবছে মনে মনে।
বলে ভাই এল গোরা, পড়লো ডেরা, সিউড়ী মোকামে
তখন রাইপুর পলায়ে গেল আস পাশ গ্রামে।
লোক সব হল হাবা, হাবা চাবা, লাগ্‌লো সভাকারে
মোট সোট, বান্ধে লোক, খাবার দাবার করে।
এমনি হুচুক হলো, লোক পলালো, ছাড়ি ঘর বাড়ী
আবাল বৃদ্ধ যুবা পলায় ঠেঙ্গা ধরা বুড়ী।

পলায় নাড়া, ব'লে গোরা রৈল ঝুলি ঝালা, জপের মালা
কোরঙ্গ কৌপীন
কেবল মাত্র রসের পাত্র চলিল বৈরাগীন। ৭১
বৈরাগী কৈছে দাপে, নবদ্বীপে, হয়েছিল যে গোরা
নিস্তার করিল জীব শচীর কিশোরা
দিয়া হরি নাম, কৈল ত্রাণ, গৌরচন্দ্র রায়
এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়।
তখন ফৌজ সিউড়ি গ্রামে, সর্ব্বজনে পড়িল ঘোষণা
নফর চাকর বেট্ বেগারী পড়লো তাম্বুখানা।
আগাড়ীর ফৌজ সকল রয় শ্রীকৃষ্ণ নগরে
বীণা বাঁশী, যন্ত্ররাশি, আস্‌ছে ভারে ভারে।
এম্নি অবিরত, আসছে কত, তুড়ুক সওয়ার
কামান গেঠান কত হাজারে হাজার। ৮১
কিবা তারা, আসছে গাড়ী, তার উপরি, দেখতে জেন ঠাঠ,
তাহার উপরে আছে ইংরাজ সর্দা।
কিবা তার রূপের ছটা, বরণ কটা, দেখিতে মাধুরী
কিবা সাহেব, কিবা গোরা, চিনিতে না পারি।
বন্দুকে সঙ্গিন চড়া, আছে গোরা, বিপক্ষ বিনাশে
কটকের পদধূলি উড়িছে আকাশে।
জোধা মোকাম পেয়ে, খানা খেয়ে, কাওয়াজ খেলে তারা
জয়ঢাক, জয় ঢোল বাজে, বাজে রণকাড়া।
বাজে সব তুরী ভেরী, ধো ধো করি, সুমুরালী বাঁশী
গোরা মেলে, কাওয়াজ খেলে, সাহেব দেখে খুসী। ৯১
বাজিছে জগঝম্প, মহিকম্প, বাদ্যের বাখান
দুই ভিতে, দুই ছড়ি হাতে, ফিরিছে কাপ্তান।
জত সব ফৌজের গুলি, কহি শুনি, কিছু মাত্র সীমা
ফৌজ দেখিতে শোক পেয়েছে কুখুটার নিমা।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে, কুখুটাতে, জাহার নিবাস
ফৌজের কবিতা কৈল হইয়া উল্লাস। ৯৭

শ্রীশিবরতন মিত্র

সাধু দর্শন।

শীতকালে বড় লাট সিমলা পাহাড় হইতে কলিকাতায় শুভাগমন করেন। বসন্তের আগমনে কত ফুল ফুটে, চাঁদ হাসে, পাখী ডাকে; সেইরূপ বড়-লাট বাহাদুরের পদার্পণের সঙ্গে সহরে কত রাজা মহারাজা আসিয়া থাকেন। তাহার পর, শীতকাল ইংরাজী বৎসরারম্ভ। ইহাও এক ধূম ব্যাপার। পরন্তু খৃষ্টের জন্মোৎসবও শীতকালে হয়, ইহাও আনন্দের ব্যাপার। আর থাকে সার্কাস, থিয়েটর, মোহন-মেলা, কংগ্রেস, কত কি ব্যাপার এই শীতকালেই হয়। তৎসঙ্গে প্রতিবৎসর সাগর-সঙ্গমে স্নানের জন্য এই শীতকালে কলিকাতায় কত স্থানের সাধু মহাপুরুষেরা আগমন করেন, ইহাঁদের এই মেলার জন্য বিজ্ঞাপন নাই, সংবাদ পত্র নাই, কাজেই ইহা নীরবে নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ইহাও কিন্তু এক মহানন্দের অপূর্ব্ব মেলা। বাক্যহীন এক সাধুর পরিচয় দিতেছি। ইহাঁর সঙ্গে এক শিষ্য, শিষ্যও প্রায় গুরুর মত। দুই জনের পরিধান কৌপিন মাত্র। এই প্রবল শীতেও গা' আগ্‌লা। গায়ে ভস্ম-মাখা। মস্তকে বৃহৎ জটা। মুখ দু'খানি হাঁসি হাঁসি। তাঁহাদের নয়নে কি যেন আছে! গুরু শিষ্য হিন্দুস্থানী এবং সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিলে বেশ বুঝিতে পারেন। এবং তাঁহাদের হিন্দুস্থানী ভাষাও আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম। যাহা হউক, এ প্রবন্ধে তাঁহাদের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বলা হইবে। ইহাঁদের শরীর, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান মতে যাহাকে "সুস্থ শরীর" বলা হইয়াছে তাহাই। পরন্তু ইঁহারা যেন সংসারীর "স্বাস্থ্য রক্ষা" পুস্তককে রহস্য করিয়া দেখাইতেছেন! "তোরা ঐ বলিস্, হিম লাগাইও না, খোলা বাতাসে শয়ন করিও না ইত্যাদি। আর আমরা দেখ, উহার বিপরীত পথে দাঁড়াইয়া কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি! অতএব জানিও, জগতের সমন্বয় ভাবেই সৎ আছে!" বস্তুতঃ তাঁহাদের দেহ দেখিলে ঐ কথা মনে হয়। আমার সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন "জগতের মধ্যে বড় কে?" সাধুর শিষ্য উত্তরে বলিলেন (গুরুকে দেখাইয়া) "উইঁার অবস্থা ঠিক নাই! বালকের মত হইয়াগিয়াছেন। উইঁার কখন জ্ঞান হয়, কখন অজ্ঞান হয়েন। জ্ঞান এবং অজ্ঞান অবস্থা অস্থায়ী ভাবে হয়। পূর্ব্বে উনি জ্ঞানী ছিলেন, আমার স্বামী উনি।

উহাঁর এই অবস্থা বলিয়া আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়াছেন এবং আনিয়াছেন। আপনাদের উত্তর আমি দিলে হইবে না।" এই বলিয়া তিনি এক মাটীর হাঁড়ী করিয়া জল গরম করিতে লাগিলেন, এবং আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। গুরু ঠাকুরটি চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু গভীর অন্যমনস্ক! যেন এজগৎ ছাড়িয়া, তাঁহার "মন" শূন্যে উঠিয়াছে।

শিষ্য পুনরায় বলিল, "পৃথিবীতে কে বড়, তা' আপনারাই বলুন না? আপনাদের ত' এক একটা মন সকলের কাছেই আছে; আমাদের কাছে তাই আছে। সেই যন্ত্র নাড়াইয়া ত আমরাও উত্তর দিব, অতএব আপনাদের কাছেও যখন সেই এক যন্ত্র, তখন না হয়, আপনারাই উহা নাড়াইয়া বলুন, আমি শুনি।" বন্ধু বলিলেন, আমাদের যন্ত্রে ও গৎ বাজে না। উত্তরে "তা হয় না, গৎ বাজালেই বাজে। তবে পাত্রানুসারে সুর মিষ্টের কম বেশী হয়।"

প্রশ্ন। আপনারা বড় দামের যন্ত্র; আপনাদের যন্ত্রটা বাজাইয়া বলুন না,"কে বড়?" শিষ্য হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ছোট ছোট যন্ত্রগুলির বাজনা হউক না শুনি। বড় যন্ত্র বাজিলে, লোকের কানে তালা লাগিবে, অনেকে বিরক্ত হইবে। আর দেখুন, নহবতের ছোট বাঁশীর বাজনা শুনে নিদ্রা আইসে, শান্তি আইসে। আপনারা কিছু বলুন, অগ্রে আমি শুনিব, নচেৎ আমি কিছুই বলিব না। কারণ উনি বলিয়াছেন, "আগন্তুকের সহিত কথা কহিবার অগ্রে তুমি যেন উপদেশ দিও না, কারণ উপদেশ দেওয়া গুরুর কার্য্য।" আমি এখন গুরু হই নাই। এজন্য আমি লোকের কাছে তাহাদের উপদেশ শুনি, তৎপরে আমার নিজের মতামত কিছু কিছু বলি। কিন্তু আমার মতামত লোকের ভাল লাগে না, যে উহা শুনে, সেই রাগ করে। আপনারা অগ্রে যেটুকু বুঝিয়াছেন,তাহাতেই বলুন, "কে বড়?" যাহা হউক, অনেক কথার পর, তিনি বলিলেন, সকল সেয়ানারই কথা এক। আমাকে এক ব্যক্তি বলেছিল, "অমুক লোক তোমাপেক্ষা অনেক বড়"; অগ্রে ভাবিলাম, "বয়সে বড়" তাই বুঝি বলিলে। তৎপরে কথার ভাবে জানিলাম, তা নয়, অমুক আমাপেক্ষা বিদ্যায় এবং টাকায় বড়, তাই বলিল। কাজেই আমি বলিলাম, "তা হতে পারে; নিশ্চয়ই সে আমাপেক্ষা বড়, উহা স্বীকার করিতেছি, এবং তজ্জন্য তাহাকে দুই শত নমস্কার করিতেছি। আমি যেন জগতে কাহার অপেক্ষা বড় না হই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে লোক তোমা-

পেক্ষা বড় কি না? উত্তরে সে বলিল, "নিশ্চয়ই আমাপেক্ষা তিনি বড়।"

তোমার বিবাহ হইয়াছে?

"হইয়াছে।"

"সে বড়, ইহা ঠিক জানিয়াছ! তবে এক কাজ কর, তোমার স্ত্রীকে উহার নিকট পাঠাইয়া গর্ভাধান সংস্কারটি করাইয়া লও না, কারণ তাহা হইলে উহা দ্বারা তোমাপেক্ষা বড় ছেলে হইবে এখন!! দেখ, ঐ এক মুটে যাইতেছে, মুটে অপেক্ষা তুমি যে বড়, তাহা আমি দেখিতেছি বটে, কিন্তু এ দেখা আমার ঠিক কি না, তাহাই বিচার্য্য। কারণ ঐ মুটের পর্য্যন্ত বিচার শক্তি আছে। মুটেও এক জনের স্বামী। তুমি বড় বলিয়া উহার স্বামিত্ব পদ টুকু তোমায় দিতে পারে না। তবেই বুঝে দেখ, জগতে "কে বড়?" সকলেই বড়—গুরু নানক বড়—ঈশ্বর বড়।

প্রশ্ন। মিথ্যাবাদী এবং জুয়াচোরে প্রভেদ কি? উহারা ধর্ম্মপথ হইতে কেন স্খলিত হয়?

উত্তরে "ইচ্ছা করিলেই উহারা ধার্ম্মিক হইতে পারে। ধর্ম্ম উহাদের ছাড়ে না। কিন্তু সংসার ধর্ম্মের নিম্ন স্তরে উহারা পড়িয়া যায়। সংসার-ধর্ম্মের মতে মিথ্যা কথার দ্বারা মিথ্যা কার্য্য প্রসব হয়, সেই মিথ্যা কার্য্যের অপর নাম "জুয়াচুরী।" পরোপকার এবং দয়া মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। চুরী কার্য্যের দ্বারা মানুষের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে হত্যা করা হয়, কাজেই উহারা নিম্নশ্রেণীর বৃত্তি পায়।

এইবার তাঁহার গুরু ঈষৎ যেন রাগিয়া বলিলেন, "আঃ কি কর! ক্ষুধা পাইয়াছে, এখনো হইল না;—কবে হইবে?" এই বলিয়া তিনি সেই হাড়ীটি ভাঙ্গিয়া দিলেন, উহার জল ধুনিতে পড়িয়া ধুনির আগুন নিভিল। ইহা দেখিয়া শিষ্য বলিলেন, আপনাদের অদৃষ্টে ভাল হইবে। ইনি কথা কহিতেছেন। এই হাড়ী ভাঙ্গিয়া ইনি আপনাদের এই জানাইলেন যে, জল আগুনের দেহ, ঐরূপ হাড়ীর জলের মত ফুটিতে থাকে, তাহাতে নানা শব্দও উঠিতে থাকে। যতক্ষণ শব্দ উঠে, টগ বগ্ করে, ততক্ষণ মানুষের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে, ভাল মন্দের বিচার থাকে; দেশের পুতুল অপেক্ষা বিলাতী পুতুল ভাল, এ খেলা ঘরের জ্ঞান থাকে, ছোট বড় জ্ঞান হয়, সবই হয়। তাহার পর, জল আগুন ভাঙ্গিয়া এক করিয়া দিলে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আর কোন শব্দ থাকে না। এই দেখুন না, আর হাঁড়ির জলের সে ডাক নাই।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

বীরভুমবাসীর কর্ত্তব্য।

বিগত পৌষ মাসের বীরভূমি পত্রিকায় আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, আহমেদ্ সাহেব বাহাদুরের উপদেশানুসারে বীরভূমের জমীদারকুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে পানীয় জলের বিশুদ্ধির সংরক্ষণার্থ কীর্ণাহারে যে গ্রাম্য-সমিতি সংস্থাপনের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, আশা করি, তাহা এত দিনে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। * পানীয় জলের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ শুধু কীর্ণাহার অঞ্চলে নহে, সমস্ত বীরভূম জেলায়, এমন কি, সমগ্র বঙ্গদেশে একান্ত প্রয়োজনীয়। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কিছু অধিক হইলেও অধিকাংশ বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর না হউক, অশিক্ষিত বলিতে হইবে। বিশেষতঃ বীরভূম জেলা এ বিষয়ে অতীব মন্দগতি। এখনও বীরভূম জেলার সদর ষ্টেসনের অনতিদূরেই এরূপ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, যেখানে বিংশতি মাইলব্যাপী গ্রাম সমূহের বালকগণের শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত একটীও মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল নয়নপথে পতিত হয় না।

পূর্ব্বকালে পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিষয়ক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ ধর্ম্মের অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া, এবং তৎকালীন মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া, উত্তম পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। অধুনা সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার পুনরাবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অথচ বঙ্গদেশের বিশেষতঃ বঙ্গীয় পল্লীসমূহের জলবায়ু দিন দিন এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে তাঁহাদের চিরপ্রদর্শিত উপেক্ষা পরিহারপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া সমবেত চেষ্টায় কার্য্যক্ষেত্রে

* লেখক শুনিয়া হতাশ হইবেন, এ সম্বন্ধে এখনও কিছুই হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্তোষের সহিত সৌরেশ বাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া মেম্বরগণের নাম চাহেন, অনতিবিলম্বে নাম প্রেরিত হইল। তাহার পর আর ও সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাই না। বীঃ স।

অবতীর্ণ না হইলে বাঙ্গালীর শোচনীয় জীবন ক্রমশঃই শোচনীয়তর হইবে।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই, সুতরাং বীরভূম জেলাতেও, পল্লীগ্রামের বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলার সদরে অথবা তদ্রূপ কোনও সহরে আবাসবাটী ক্রয় বা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করা ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে এবং জমীদার শ্রেণীর মধ্যে রোগবিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, মফঃস্বলের জমীদারগণ কলিকাতাবাসী হইয়া পড়েন। কলিকাতার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জলবায়ুর আকর্ষণেই হউক, বাসোপযোগী অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্তির আশাতেই হউক, অথবা অশেষবিধ আমোদ প্রমোদের প্রলোভনেই হউক, কলিকাতাবাসী জনপদ জমীদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অবশ্যই বিষয় কর্ম্মের সুবিধার জন্য কলিকাতায় অথবা জেলার সদর ষ্টেসনে মধ্যে মধ্যে অবস্থান করা কোনরূপেই নিন্দনীয় হইতে পারে না। যে প্রজার কষ্টলব্ধ অর্থ দ্বারা জমীদারের কোষাগার পূর্ণ হয়, তাহাদিগের উন্নতিবিধানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিয়া গ্রাম্য বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরে স্থায়িভাবে অবস্থান করা কোনও ক্রমে প্রশংসনীয় নহে।

অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই যদি এইরূপে স্ব স্ব গ্রামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, তাহা হইলে সেই সেই গ্রামের উন্নতির আশা অবশ্যই সুদূরপরাহত। উচ্চ শিক্ষায় যাঁহাদের মন প্রদীপ্ত হইয়াছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মনস্বীগণের সংস্পর্শে যাঁহাদের মনের উচ্চতা সম্পাদিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য দেশোন্নতিবিধান যাঁহাদিগের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্য স্বরূপ প্রত্যাশিত হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে গ্রামোন্নতি বিধানে পরাঙ্মুখ থাকা কেবল মাত্র কর্ত্তব্যভঙ্গের নহে, পরন্তু অতীব অশিষ্টতার পরিচায়ক। ক্ষোভের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত জেলার সদরে অথবা অপর নগরে বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়েন বলিয়া সচরাচর তথায় স্থায়িভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবিকার্জ্জনের কঠোর পরিশ্রমের পর, অবকাশকালে গ্রামে গিয়া অবস্থান করিলে, স্থান এবং দৃশ্যের পরিবর্ত্তনে ও সরল প্রকৃতি গ্রাম্য সুহৃদ্গণের সাহচর্য্যে যে চিত্তবিনোদন হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। শিক্ষিত লোকের সংসর্গে পল্লীবাসীগণের নৈতিক ও ব্যবহারিক উৎকর্ষ ঘটিবার পথ এইরূপে

প্রশস্ত হইতে পারে, এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা বহুবিধ হিতগর্ভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, সংক্ষেপতঃ গ্রামোন্নতি-বিধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এইরূপ গ্রাম্যবাসত্যাগী জমীদার বা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সৌভাগ্যবশতঃ বীরভূমজেলায় এখনও অল্প হইলেও যখন এই অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, তখন ইহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

যদি মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর কেবল মাত্র কীর্ণাহারে বা তদঞ্চলে পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় বিধানানন্তর ক্ষান্ত না হইয়া বীরভূমি জেলার সর্ব্বত্রই ইহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সর্ব্বথা সুখের বিষয় হইবে। অবশ্যই এবিষয়ে স্থানীয় লোকের সহকারিতা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং জমীদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর নিকটেই এরূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করা যায়। রাজপুরুষগণ সাধারণ প্রজার মঙ্গল বিধায়ক যে প্রস্তাব সমূহ সময়ে সময়ে উত্থাপন করিয়া থাকেন, অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানারূপ কুসংস্কার বশতঃ তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ন্যূনাধিক ৬ বৎসর পূর্ব্বে বীরভূম জেলা বোর্ডের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফিসার সাহেব বাহাদুর পুরন্দরপুর গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুল ও পোষ্টাফিসের সমীপবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীর জলের বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার অভিলাষে পুষ্করিণীর অধিকারীগণকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং যখন বীরভূম-বাসীর সুকৃতিবশতঃ বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন আশা করি, বীরভূমের চতুঃপার্শ্বস্থ জমীদার ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আনুকূল্যে স্ব স্ব গ্রামে এক একটী সমিতি সংস্থাপন পূর্ব্বক পানীয় জলের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

এই প্রস্তাবিত সমিতির গ্রাম্যবর্ত্মের সংস্কারেও মনোযোগ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের প্রতি অসভ্য, বর্ব্বর প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইলে আমরা প্রায়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ি। কিন্তু আমাদিগের বাসস্থানের কুৎসিত পথ ঘাট ও সাধারণ অপরিচ্ছন্নতা অবলোকন করিলে আমাদিগকে উল্লিখিত আখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানসূচক বিশেষণে বিভূষিত করিতে কোনও সভ্যজাতির প্রবৃত্তি হইবে না। অরণ্যবাসী আমমাংসভোজী সাঁও-

তাদেরাও নিজ পল্লার মধ্যস্থলে একটী সুপ্রশস্ত বর্ত্ম সর্ব্বদা সযত্নে সুরক্ষিত করে। কিন্তু মনুর বংশধর বেদোপনিষদধ্যায়ী সভ্যতাভিমানী আমরা সুযোগ পাইলেই রাস্তা চাপিয়া বাটী বা প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে, অথবা সুপ্রশস্ত গোপথকে ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক লোপ ঘটাইতে কখনও পশ্চাৎপদ হই না। আমরা এতই অধঃপতিত ও এতদুর স্বার্থান্ধ যে, উল্লিখিতরূপ নীচতা মূলক অকার্য্য দ্বারা সম্যকরূপে প্রত্যবায়ভাগী হইতে কখনও ইতস্ততঃ করি না।

এক পল্লীগ্রাম হইতে অন্য পল্লীগ্রামে শকটাদি লইয়া যাইবার পথ বীরভূমের অনেক স্থলেই একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার অভাব বশতঃ যে কষ্ট ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুরূহ। অনেক স্থলেই গ্রাম্য রাস্তা ও গোপথের দুর্দ্দশা এরূপ ভয়াবহ যে, বর্ষার শেষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেও সে সকল পথ ব্যবহার করা অতীব আয়াস-সাধ্য। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে কোনও বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে বাতিকার গ্রামের জমীদার বিশেষের সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে আমাকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। পঙ্কিল গোপথে গোযান চক্রের ন্যূনাধিক অর্দ্ধাংশের নিমজ্জন হেতু গোযানের অচলতা, তন্নিবন্ধন শকট হইতে সেই কর্দ্দমাক্ত পথে অবতরণের পৌনঃপুন্য, চারি দণ্ডের পথে চারি প্রহরের ক্ষেপণ, এবং অবশেষে অবসাদভরে শকটচক্রের কায়া মায়া ত্যাগ চিরকাল আমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। বাতিকার যাইতে হইলে একটী ক্ষুদ্র কন্দর অতিক্রম করিতে হয়। আমার কষ্টের সীমা তখনও শেষ হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা আমাদের অসভ্যাবস্থার এবং মানসিক জড়তার চরম দৃষ্টান্ত তখনও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই বলিয়াই হউক, বাতিকার যাইবার পথে এই স্রোতস্বিনী আমার প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। নদীর উভয়কূলে শকটাদির অবরোহণ ও আরোহণের নিমিত্ত কোনও রূপ অবনম্রাভূত স্থল ছিল না। এরূপ দুরাবরোহস্থানে কোন প্রকারে অবতরণ করিয়া যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলাম, কতিপয় সহৃদয় মুসলমানের সাহায্যে শকটের উদ্ধার সংসাধিত না হইলে, ক্লিষ্টশরীরে, ক্ষুধার্ত্ত উদরে, সেই স্রোতস্বতীর জলে সমস্ত রাত্রি তাহার প্রায়শ্চিত্তের সমাধান হইত। বাতিকারের সন্নিহিত নবগ্রামে কতিপয় মুসলমানের সহিত কথোপকথনে অবগত হইয়াছিলাম যে, "দেওয়ানজী" (বাতিকারের জমীদার

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সিংহ) প্রভৃতি ব্যক্তিগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহারা অবকাশকালে স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে ঐ সকল রাস্তার আবশ্যকীয় সংস্কার বিধান করিতে পারে। আমার বিশ্বাস, যদি জমীদার ও শিক্ষিত ব্যক্তি-গণ গ্রাম্য ব্যক্তিগণের সহিত যথোপযুক্তভাবে মিশিয়া রাস্তাঘাট সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করান এবং তন্নিমিত্ত তাহা-দিগের নিকট আর্থিক ও কায়িক সাহায্যের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের অনুগামী হইবে এবং একবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ইহা হইতে প্রভূত শুভফল প্রসূত হইবে।

লোপপ্রাপ্ত গোপথগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট বিনা ষ্ট্যাম্পে দরখাস্ত করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দয়ালু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বোধ হয় উপরিউক্ত গ্রাম্য সমিতির দরখাস্ত বিনা ষ্ট্যাম্পে গ্রহণ করিবেন। যদি ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত না করিলে কোনও রূপে কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে কার্য্যো-দ্ধারের নিমিত্ত অগত্যা তাহাই করিতে হইবে।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলে উল্লিখিত সংস্কারাদির পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। অধুনা স্ব স্ব গ্রামে অথবা কতিপয় গ্রাম লইয়া সমবেত ভাবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পথ ঘাটের সংস্কার ও সংযোজন, এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংগ্রহ বীরভূমবাসী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির ও প্রত্যেক জমীদারের প্রধান-তম কর্ত্তব্য। আমাদের স্বভাবসুলভ জড়তার ও দীর্ঘসূত্রতার জন্য আমরা ইতঃপূর্ব্বে অযথা অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আর আমাদের এরূপ ভাবে কালযাপন করা উচিত নহে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

কৃষি প্রবন্ধ।

(সঙ্কলিত)

(১)

বীজ পবন বিধি।

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠেতু মধ্যমং স্মৃতং।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমম্॥"

বৈশাখে বপনই শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম, আষাঢ়ে অধম, ও শ্রাবণে অধমাধম

বলিয়া কথিত হয়। বছরের প্রথমে মাটী নূতন হয়। তাহার প্রমাণ চাষের দ্বারা জানা যায়। বৈশাখ মাসে যত জমি চষা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে তদপেক্ষা কম, এইরূপে শ্রাবণ মাসে সে হিসাবে নিতান্ত কম জমিতেই চাষ উঠে। ইহার কারণ ক্রমে মাটী কঠিন হইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মাটী যতই কঠিন হয়, ততই ধান্যাদির বীজ হইতে গাছ হইয়া পুষ্ট হইতে বিলম্ব হয়। একারণ বৈশাখের বুনাই ভাল। খনা বলিয়াছেন ;—

"বৈশাখী বুনো। ফলে দুনো॥"

শিশির, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম খাইয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তিও নূতন হয়। শীত, তাপ, বায়ু ও বৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পৃথিবী নূতন শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই নূতন শক্তি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহার ফলোৎপাদিকা শক্তি নিশ্চয়ই অধিক হয়।

"বৃষান্তে মিথুনাদৌ চ ত্রীণ্যহানি রজস্বলা।
বীজং ন বাপয়েত্তত্র জনঃ পাপাদ্বিনশ্যতি॥

বৃষের (জ্যৈষ্ঠের) অন্ত ও মিথুনের (আষাঢ়ের) আদিতে তিন দিবস পৃথিবী রজস্বলা হয়েন। ঐ সময় বীজ বপন করিবে না, করিলে বিনষ্ট হইবে।

অন্য মতে :—

"মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্র পাদেঽম্বুবাচী।
ভবতি ঋতুমতীক্ষ্মা ভাস্করে ত্রীণ্যহানি।
যদি বপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্র মাসাদ্য বীজং।
ন ফলতি কললাভো দারুণ শ্চাহ কালঃ॥"

বরাহ সংহিতা।

মৃগশিরা নিবৃত্ত হইয়া রৌদ্রপাদ আরম্ভ হইলে (আষাঢ়ের) তিনি দিন পৃথিবী ঋতুমতী হয়েন। উহাকে অম্বুবাচী বলে। ঐ কাল দারুণ সময় জানিবে। অম্বুবাচীতে যদি কৃষক ক্ষেত্র মধ্যে বীজ বপন করে, তবে তাহা নিষ্ফল হয়।

* * * * *

রোপণ বিধি।

"রোপণার্থন্তু বীজানাং শুচৌ বপন মুত্তমম্।
নভঃ শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধম্॥"

রোপণের জন্য যে বীজ, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করাই উত্তম; শ্রাবণ মাসে অধম, আর ভাদ্রে অধমেরও অধম।

"বৈশাখী বাওয়া জ্যৈষ্ঠের জাওয়া
আষাঢ় রোওয়া, শ্রাবণে গাওয়া ।"　　(খনা)

বৈশাখ মাসে বপনের পর গাছ বাহির হইয়া যাওয়াকে বাওলা বা বাওয়া বলে। জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ জন্য যে বীজ বপন করা হয়, তাহার গাছ বাহির হওয়াকে জাওলা বা জাওয়া কহে। আষাঢ় মাসের রোপণকে রোওয়া ও শ্রাবণ মাসের গাছানকে গাওয়া বলে। যদি এইরূপ হয়, তবেই চাষ ভাল হয়। সময়ে সবই ভাল আর অসময়ের কৃষি কষ্টসাধ্য এবং তাদৃশ ফলদায়কও নহে।

"বপনে রোপণে চৈব বারযুগ্মং বিবর্জ্জয়েৎ।
মূষিকাণাং ভয়ং ভৌমে শলভকীটয়োঃ ॥
ন বাপয়েত্তিথৌ রিক্তে ক্ষোণে সোমে বিশেষতঃ।
এবং সম্যক্ প্রযুঞ্জানঃ শস্যবৃদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥"

বপনে ও রোপণে শনি মঙ্গলবার ত্যাগ করিবে। মঙ্গলবারে মূষিকের ও শনিবারে শলভ (পতঙ্গ) ও কীটাদি ভয় হয়। আর রিক্তা তিথিতে বিশেষতঃ সোম মঙ্গলবার হইলে কদাচ বপন করিবে না। এরূপ হইলে নিশ্চয়ই শস্য বৃদ্ধি হয়।

*　　*　　*　　*　　*

"বপনহ্ রোপণঞ্চৈব বীজংস্যাদুভয়াত্মকম।
বপনং গদ নির্ম্মুক্তং রোপণং স গদং বিদুঃ ॥
ন বৃক্ষরূপ ধান্যনাম্ বীজাকর্ষণ মাবরেৎ।
ন ফলাস্ত দৃঢ়বীজা বৃক্ষা কেদার সংস্থিতাঃ ॥
হস্তাগুরু কর্কটে চ সিংহে হস্তার্দ্ধ মেবচ।
রোপণং সর্ব্ব-ধান্যা নাং কন্যায়ং চতুরঙ্গনম্ ॥"

বপন এবং রোপণ এই উভয় প্রকারেই বীজের আবাদ করা যায়। বপন করিতে হইলে জমি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, যেন সোঁতা না হয়। আর রোপণের জমি জল ও কাদাযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে ধান্য গাছ শক্ত বা যাহার গোঁড়ার পাব হইয়াছে, এরূপ গাছান বীজ লইবে না। গাছান বীজ ও বীজক্ষেত্রের আইল পার্শ্বস্থ গাছবীজে ভাল ফল হয় না।

শ্রাবণে এক হাত অন্তর, ভাদ্রে আধ হাত অন্তর, ববং আশ্বিনে চারি আঙ্গুল অন্তর রোপণ করাই রীতি।

"কোল পাতলা ঘন গুছি।
লক্ষ্মী বলে ঐখানে আছি॥" (খনা)

রোপণ করিবার সময় বিবেচনা পূর্ব্বক গুছি গুলিতে ধানের গাছবীজ কিছু বেশী করিয়া দেওয়া হয়। রোপণ করাইলে যদিও কোল পাতলা হয়, তথাপি তাহাতে প্রচুর ধান্য জন্মে।

মদিকা দান বিধি।

বীজস্য বপনং কৃত্বা মদিকা তত্র দাপয়েৎ।
বিনা মদি প্রদানেন শস্যজন্ম ন জায়তে॥

বীজ পবন করিয়া তাহার উপর মই দিবে। বিনা মইয়ে ধান্যাদি ভাল জন্মে না। দাবিয়া মই দিলে মৃত্তিকার তেজ বদ্ধ থাকিয়া সমস্ত ধান্যাদিকে ঝাড়িয়া বাহির করিয়া দেয়। এবং মৃত্তিকার তেজ আবদ্ধ থাকায়, মৃত্তিকা মধ্যস্থ ধান্য গাছের মূলে তেজ প্রদান করে। উহাতে ধান্য সত্বর বর্দ্ধিত হওয়ার আহার পায়। এতদ্ব্যতীত মই দ্বারা মাটী সমান, ও তৃণাদিও অনেক পরিমাণে জব্দ, ও ক্ষুদ্র ঘাস্যের অঙ্কুর বা চারাত সমূলেই নষ্ট হইয়া যায়। জমি ভিজা থাকিলে কদাচ মই দিবে না। যোয়ে মই দেওয়াই নিয়ম।

কৃষক, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

মাট কড়াইয়ের চাষ।

(২)

মাট কড়াই এক প্রকার ক্ষুদ্র মূল বিশেষ। আমেরিকা মহাদেশ ইহার প্রথম জন্মস্থান। তথা হইতে ইংরাজি ১৭১২ সালে বিলাতে সর্ব্বপ্রথম ইহার চাষ আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা যে ভারতবর্ষে এ চাষ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার চাষের ভূমির পরিমাণ অল্প নহে। বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজি ১৮৮৪ সালে এক মান্দ্রাজ প্রদেশেই দুই লক্ষ কুড়ি হাজার চারশত বিঘা জমীতে মাট কড়াইয়ের চাষ হইয়াছিল, এবং ঐ সনে নাগারি নামক একটা সামান্য রেলওয়ে ষ্টেসনে ৯ হাজার মণ মাট কড়াই বোঝাই হইয়াছিল। আরও এই মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতেই ১৮৪৮ সালের এই মাট কড়ায়ের তৈল প্রথম বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহার ব্যবহার এত

বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে ফ্রান্স দেশের "অলিভ" বা "জলপাই" তৈলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই চাষ যত বৃদ্ধি হইবে ততই মঙ্গল।

মাট কড়াইয়ের উপকারিতা।

মাট কড়াই হইতে প্রধানতঃ ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ বিশিষ্ট তৈল বাহির হয়। এই তৈল দেখিতে বেশ পরিষ্কার এবং অনেক দিন রাখিয়া দিলেও নষ্ট হয় না। মাট কড়াই তৈল (বাদাম তৈল নামেও অভিহিত হয়) ঔষধের জন্য, সুতা, কাপড় ইত্যাদির কল পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান ও মিঠাই করিবার জন্য বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বালানি কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ গুণ ইহাতে কালি পড়ে না। ফ্রান্স দেশে মাট কড়াই ও জলপাই তৈল লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে মাট কড়াই ভাল বলিয়া জানা গিয়াছে। হিন্দুস্থানীরা ডালা মাথায় করিয়া রাত্রে পথে পথে হাঁকিয়া যে "চানাচুর" বিক্রয় করে, তাহার প্রধান উপকরণ এই মাট কড়াই। ইহার খইল বলদ প্রভৃতির উত্তম খাদ্য এবং জমীর পক্ষেও উত্তম সার। শুকনা গাছগুলি গরুকে খাওয়াইলে গরু দুগ্ধবতী হয়। এইরূপ মাট কড়াই হইতে অনেক প্রকার উপকার হয়।

চাষ।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টি হইলেই জমিতে বেশ করিয়া চাষ দিবে, এবং যত দিন না বীজ বপন করা হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে আগাছা সকল তুলিয়া ক্ষেত্রটীকে পরিষ্কার রাখিবে। যে জমিতে ক্ষার ও চুণের ভাগ বেশী থাকে, তাহাতে মাট কড়াই ভাল উৎপন্ন হয়। পচা গোবরের সার যত অধিক পরিমাণে ক্ষেত্রে ছড়ান হইবে, ততই ফসল বেশী হইবে।

আষাঢ় মাসের শেষ কিম্বা শ্রাবণ মাসের প্রথমে অথবা বৃষ্টি না হইলে শ্রাবণের শেষে জমি আর একবার বেশ করিয়া চাষ করিয়া বীজ বপন করিবে। ভূমি উর্ব্বরা হইলে খুব পাতলা করিয়া এবং অনুর্ব্বরা হইলে খুব ঘন করিয়া বীজ বপন করা উচিত।

বপনযোগ্য বীজগুলি বেশ ভারি ও পুরন্ত শুঁটি যুক্ত হওয়া চাই। প্রথমতঃ বীজগুলি লইয়া দিবা ভাগে রৌদ্রে ও রাত্রিতে শিশিরে চার দিন রাখিবে, তাহা হইলে বীজে পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকিবে না। পালং-শাকের বীজ যেরূপ পাত্রে ছাই দিয়া রাখিয়া তদুপরি খড়কুটা চাপা দেওয়া হয়, তদ্রূপ করিবে, বেশীর ভাগ উক্ত খড় কুটার উপরি খানিক

গোময় দিয়া পাত্রের মুখটি বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় ৩।৪ দিন রাখিয়া শুঁটি গুলিকে বাহির করিয়া খুব সাবধানের সহিত খোসা ছাড়াইতে হইবে। উপরকার কঠিন আবরণ সহিত পুতিলে অনেক 'কলা' বাহির হয়। কিন্তু কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া বীজগুলি বাহির করিবার সময় দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন ফটা রংয়ের পাতলা ছালটী উঠিয়া না যায়। তাহা হইলে আর অঙ্কুর বাহির হইবে না। তিন বিঘা জমীতে বপন করিতে ৩০ আড়ি বীজ লাগিবে।

বীজ পোতা হইলে ইহাকে দুইটী শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করার বিশেষ আবশ্যক; নতুবা সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে। প্রথম দিবাভাগে কাকে ক্ষেত্র হইতে সমস্ত বীজ বাহির করিবে, দ্বিতীয়তঃ রাত্রে শৃগালের উপদ্রব। প্রথমটীর জন্য জমির মধ্যস্থলে একটী বংশদণ্ডে মৃত কাক কিম্বা তাহার ডানা বাধিয়া রাখিবে, দ্বিতীয়টীর জন্য—রাত্রে পাহারা দিবে। বেশী দিন থাকিতে হইবে না, চার পাঁচ দিনের মধ্যে অঙ্কুর বাহির হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবে, তখন কোন ভয়ের কারণ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে জমি শুষ্ক হইলে জল দিবে। মাঘ ফাল্গুন মাসে গাছ গুলি শুকাইতে আরম্ভ করে। তখন কতকগুলি শুঁটী তুলিয়া পরীক্ষা করিবে। যদি শুটী শক্ত হয় ও ভাঙ্গিলে কুচিকুচি হইয়া যাঁয়, এবং দানার উপর ঈষৎ লাল বর্ণের ছাল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জানিবে ঠিক হইয়াছে।

মাটকড়াই তুলিবার নিয়ম :—

সন্ধ্যাবেলা একবার জমি অল্প ভিজাইয়া দিয়া, পরদিন গাছগুলি উপড়াইয়া ফেলিবে। পরে ছোট খুন্তি কিম্বা নিড়ান দিয়া মাটী খুঁড়িয়া শুঁটিগুলি বাহির করিবে। পরে গাত্রস্থ মৃত্তিকা পরিষ্কার করিয়া বিক্রয়ার্থ উহা যথা ইচ্ছা প্রেরণ করা যাইতে পারে। (বলিতে ভুলিয়াছি মাটকড়াইয়ের শুঁটী জমীর উপরে না হইয়া আলুর ন্যায় মাটীর ভিতরে জন্মায়)। যাহা হউক, এখানে ১২৯২ সালের কৃষি গেজেট হইতে ইহার আয় ব্যয় উদ্ধৃত হইল।

তিন বিঘা জমীতে মাট কড়াই চাষ করিতে কম বেশী যে খরচ পড়ে, তাহার হিসাব—

৬ বার লাঙ্গল দিবার খরচ	...	...	...	৪॥০
২৪ গাড়ি সার দিবার খরচ	...	...	...	৬৲

৩৫ গাড়ি বীজের মূল্য	...	...	...	৩৷৹
বপনের খরচ	...	...	...	১৷৹
দুইবার হাত দিয়া নিড়ানের খরচ	...	...	...	২৷৹
জল সেচন খরচ	...	...	...	৬৲
জমীর খাজানা	...	...	...	৪৲
কুলির মজুরি বা আধ গাড়ি পরিমিত ফসলের মূল্য ...			...	১৭৷৷৹
		মোট খরচ		৪৫৲

ফসলের হিসাব :—

৩ বিঘা জমীর উৎপন্ন প্রায় তিন গাড়ি কড়াইয়ের মূল্য—(৩৬/৹ মণ)	১০৫৲
৫৬ মণ খড়ের (শুষ্ক গাছের) মূল্য—	১০৲
মোট—	১১৫৲
খরচা বাদ কৃষকের আয়	৭০৲

প্রতিবাসী, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭।

অমৃত তুসনিকা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আর কহি যুন মনের কল্পনা কর দুর।
কল্পনা কৈতব দেহে হয়ত অযুর ॥
আর এক য়াছে দেহে মায়া মুগ্ধ জনা।
সংসার ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলে বঞ্চনা ॥
এ সব কহিব পরে এবে যুন য়ার।
অংসরূপে মহাবিষ্ণু সকলে বিহার ॥
বৃন্দাবন বেহার আর গোচারণ লিলা ॥
বাসুদেব দ্বারে ইহা সকল করিলা ॥
প্রকট বেহার পুর্ন্ন জত বৃন্দাবনে।
কেবা কবে কার দ্বারে কেহু নাহি জানে ॥
বৃন্দাবনে নন্দ যুত পুর্ন্ন সাস্ত্রে কয়।
ইহাতে সন্দেহ চিত্ত আমার অঁছয় ॥
বসুদেব পুত্র থুঞা গেল নন্দঘরে।
এই কথা সর্ব্ব সাস্ত্রে জানয়ে সংসারে ॥

পুর্ন ভগবান য়বতার জেহ কালে।
অংস রূপে বিষ্ণু আসি সব তাহে মিলে॥
ইহার সিদ্ধান্ত এক যুন স্থির হঞা।
ক্ষগাক্ষগ লক্ষত্র তিথি তাহে মিসাইঞা॥
ভাদ্র য়ষ্টমি যুক্ল পক্ষ জান দুই ক্ষগ।
সময় জানিঞা দুহে হইলা সংজোগ॥
দৈবকি নন্দ জেহো য়াইলা বৃন্দাবনে।
জসদা যুতিকা মধ্যে তাহার গমনে॥
চদ্ধ্য দণ্ড রাত্তি সেসে তাহার গণন।
সেইক্ষণে মেঘে বিদ্যুত কৈল আকর্ষণ॥
লবিণ মেঘেতে জৈছে সোদামিনি খেলে।
সেই মত বিষ্ণু দেহে মদন সেবুলে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
বিষ্ণু দ্বারে করে সব জগত পালন॥
যুর্য্যের কিরণে জৈছে ব্রহ্মাণ্ড জলে স্থলে।
এই মত ভগবান সর্ব্বজিবে বুলে॥
আর এক অপূর্ব্ব কথা শুণ স্থির হঞা।
না কর প্রকা·ক্ষরেখ হৃদএ ভরিঞা॥
মহাতেজ পুর্ন ম··ন ফেরে বৃন্দাবণে।
অন্নে নাহি জানে ইহা রাধিকা সে জানে॥
আর এক রহস্য কথা যুণ সর্ব্বজণে।
বৃন্দাবণে রাসলিলা করে দুই জণে॥
রাধাকৃষ্ণের নহে না জানে গুপিগণে।
কেবা এই নিত্ত বাস করে কার সণে॥
ইহার সন্দেহ মোর খণ্ডাহ কৃপা করি।
তব মুখে এই বাক্য সুনিব বিস্তারি॥
মদন মহন মথন করে জেই জন।
তার সঙ্গে করে বাস নবিন মদণ॥
বর্ন ভেদে জান তত্ত সিদ্ধান্তের সার।
অন্তরে বুঝিয়া রেখ্য না কর বিস্তার॥
রকারে রাধিকা রক্ত বর্ন সেই হয়।
কঃকারে কন্দর্প বিন্দু বিদ্যুত রূপি তায়॥
যেই দুই করে বাস আর নিজ নিত্য লিলা।
তে কারণে লিলা রাধাকৃষ্ণ না জানিলা॥ (ক্রমশঃ)

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২য় ভাগ] আষাঢ়, ১৩০৮। [৯ সংখ্যা।

৺কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অদ্য আমরা পাঠকবর্গের নিকট, বীরভূম নিবাসী একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিব। ইনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু তিনি নিজে রচনা করিয়া নিজের প্রাণেই তৃপ্তি লাভ করিতেন, অপরকে শুনাইয়া বাহাদুরী লইবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। সেই জন্য তিনি এত দিন জনসাধারণের নিকট অপরিচিত। এমন কি, তাঁহার বন্ধু-বর্গের মধ্যেও অনেকেই তাঁহার এতগুলি সুন্দর সুন্দর গীত রচনার কথা আদৌ জানিতেন না। এই সঙ্গীত-রচয়িতার নাম কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের অন্তর্গত মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে আপন মাতামহ গৃহে সন ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, তৃতীয় দিবসে সূতিকাগারেই তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়; সুতরাং তিনি মাতামহীর যত্নে আশৈশব প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কল্‌সা নামক গ্রামে কালীপ্রসন্নের পিতৃ ভবন। পিতা ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুরে কোন গদীয়ানের পক্ষে মহরীর কর্ম্ম করিতেন। কালীপ্রসন্ন, তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর আদ্যজাত সন্তান। শ্বশুর কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধ ও কালীপ্রসন্নের প্রতি মমতা বশতঃ, ক্ষেত্রনাথ, কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ক্ষেত্রনাথের, সত্যপ্রসন্ন, নিত্যপ্রসন্ন ও দুর্গা-প্রসন্ন, এই তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানটী শৈশবেই

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় উভয়েই সুশিক্ষিত—সত্যপ্রসন্ন বীরভূম জজ কোর্টে ওকালতী ও নিত্যপ্রসন্ন সিউড়ী মিউনিসিপাল আফিসে চাকুরী করেন।

কিছু কাল পর, মাতামহ কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, কালীপ্রসন্নের মাতামহী কালীপ্রসন্নকে লইয়া সিউড়ীর দক্ষিণ, অদূরবর্ত্তী আড্ডাহা নামক গ্রামে স্বীয় পিতা পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহাতে কালীপ্রসন্নের সিউড়ীতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সুবিধা হইল—প্রত্যহ চারি মাইল পথ হাঁটিয়া সিউড়ী যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

কালীপ্রসন্নের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তিনি সিউড়ী বঙ্গবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। আবশ্যকীয় পুস্তক ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইলে তিনি সিউড়ী আফিসের পরিত্যক্ত কাগজ সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই পুস্তক সমূহের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

কালীপ্রসন্নের মেধাশক্তি প্রবল ছিল; সেই জন্য অতি অল্পকাল মধ্যেই স্কুলের একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া শিক্ষক ও তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বনামখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর স্নেহময় সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। বাবু দ্বারকানাথ তাঁহাকে আপন শিশু পুত্র ও কন্যাগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিলেন। কালীপ্রসন্নও এই অভয় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতে কালীপ্রসন্ন আমৃত্যু দ্বারকা নাথ বাবু বা তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেরই সমধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন।

বাঙ্গালা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চারি টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে বীরভূম জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পাঁচ বৎসর মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন স্কুলে সর্ভে শিক্ষা করিতে হইত। কালীপ্রসন্ন এ বিষয়ে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত সিউড়ী মিউনিসিপালিটির ম্যাপ এখনও মিউনিসিপাল আফিসে রক্ষিত আছে।

এই সময় কেন্দুয়া-নিবাসী নবীনচন্দ্র গোস্বামীর কন্যার সহিত কালীপ্রসন্নের বিবাহ হয়, কিন্তু এই স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কালীপ্রসন্নকে F. A. পড়াইবার জন্য বাবু দ্বারকানাথ বিশেষরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে শুধু অর্থ সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ পত্র দিয়া তাঁহার বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু কলিকাতার জল বায়ু আদৌ সহ্য না হওয়ায় কালীপ্রসন্নকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় চিরকালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হয়।

এ দিকে অর্থের অনাটনে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাতামহীর সাগ্রহ অনুরোধে বৎসর মধ্যেই তাঁহাকে কাটোয়ার নিকট নওয়াপাড়া নিবাসী যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে। শিশু ভ্রাতাগুলির অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত; মাতামহী ও তাঁহার পিতা পরেশনাথ তখনও বর্ত্তমান। ফলতঃ পোষ্য সংখ্যা অল্প নহে। এই দুঃসময়ে বাবু দ্বারকানাথের অনুগ্রহে তিনি বাঙ্গালা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই চাকুরীতে তিনি আস্থাবান ছিলেন না, অর্থের দারুণ অনাটন হওয়াতেই তিনি ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময় জমীদার বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়,সিউড়ী হইতে দিবাকর নামক সাপ্তাহিক পত্র ও 'শব্দ জ্ঞান কল্পদ্রুম' নামক অভিধান প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন স্কুলের শিক্ষকতা ব্যতীত, দক্ষিণাবাবুর শিশু সন্তান গুলিকে গৃহে শিক্ষাদান এবং পত্রিকা সম্পাদন ও অভিধান সঙ্কলনে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই জন্য তাহার অর্থের অভাবও কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইত। কালীপ্রসন্ন এইরূপে সিউড়ীর দুই সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ভদ্র পরিবারের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলেন।

পাঁচ বৎসর বাঙ্গালা স্কুলে চাকুরী করার পর, প্রধান শিক্ষকের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি তাহা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিলেন—বিশেষতঃ পূর্ব্বাবধি তাঁহার এই কার্য্যে আদৌ আস্থা ছিল না। এদিকে দক্ষিণা বাবুরও প্রেস বন্দ হইয়া গেল।

তদনন্তর, তিনি কুণ্ডলার অন্যতম জমীদার নবদ্বীপেন্দু বাবুর নিকট ৩ বৎসর কার্য্য করিলে, সিউড়ী জিলা স্কুলে অস্থায়ীরূপে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কার্য্যকাল ফুরাইলে, সিউড়ী ফৌজদারী আফিসে কিছু দিন শিক্ষানবীশ স্বরূপ থাকিয়া, মিউনিসিপাল আফিসে

২৫ টাকা বেতনে টেক্স দারোগা ও খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন।

১৩০২ সাল, অগ্রহায়ণ মাসের ঊষাকালে, কালীপ্রসন্নের শয়ন গৃহের দ্বারে একটী ক্ষিপ্ত কুক্কুর অপর একটী কুকুরকে মারিয়া তাহার উপর রক্তমুখে বসিয়া আছে। কালীপ্রসন্ন যেমন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিবেন, অমনি কুক্কুরটী নিমেষ মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও দক্ষিণ হস্ত, হাঁটু ও স্কন্ধ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল। কালীপ্রসন্ন ইত্যবসরে সেই ক্ষিপ্ত কুক্কুরটীকে ধরিয়া তাহার উপর বসিয়া চাপিয়া ধরিলেন। ইতিমধ্যে, তাঁহার ভ্রাতারা আসিয়া তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু পাছে অপর কাহাকেও কামড়াইয়া দেয় বলিয়া তিনি কুক্কুরটীকে একবারে না মারা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন না। ধন্য সহিষ্ণুতা! কিয়ৎক্ষণ পর তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন এবং ৩ দিন ক্রমাগত ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিলে পর খাঁকীবাবার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আপাততঃ বেশ আরোগ্য লাভ করিলেন। তাহার পর, তিনি রীতিমত আফিস যাতায়াত করিতেন।

এইরূপে ৩ মাস কাটিয়া গেল, ১৫ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহার উরুস্থলে বেদনা অনুভব হইয়া জ্বর হয় এবং ১৬ই প্রাতঃকাল অবধি জলাতঙ্কের সূত্রপাত হয়। এত দিনের মধ্যে তিনি একদিনও স্নান করেন নাই; কিন্তু অদ্য শরীরে বিষম জ্বালা অনুভব হওয়ায় জল সিঞ্চন করিলেন, তাহাতে অসুখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। ১৭ই সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার অন্তিমকাল সন্নিকট বুঝিতে পারিলেন এবং দুই ভ্রাতা সত্য ও নিত্য, স্ত্রী প্রভৃতি সকলকে একত্র করিয়া 'গুরু' ও 'কালী' নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, এক পোয়া আন্দাজ জল গলাধঃকরণ করিলেন। কিন্তু তখন জলাতঙ্ক নাই। গৃহে, নবদ্বীপ হইতে আনিত দেব দেবীর পট, গুরুর পাদুকা ও শিবাদির পূজা, সজ্ঞানে বসিয়া সমাপন করতঃ সকলকে 'কালী কালী,' 'গুরু গুরু' বলিতে নির্দ্দেশ করিলেন এবং নিজে সত্যপ্রসন্নের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। দোল পূর্ণিমা, গ্রহণ মুক্ত হইতে তখনও পাঁচ ছয় মিনিট বাকী আছে, এমন সময় তাঁহার নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া একেবারে রোধ হইয়া গেল—বদন হইতে 'কালী' 'গুরু' শব্দ আর পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত না হইয়া অভ্যন্তরে

বিলীন হইয়া গেল—কালীপ্রসন্নের মস্তক শ্লথভাবে ভ্রাতৃক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল।

কালীপ্রসন্ন এইরূপে অকালে ৪১ বৎসর বয়সে একটীমাত্র শিশুসন্তান, বিধবা স্ত্রী ও ভ্রাতাদিগকে কান্দাইয়া তাঁহার বহু আকাঙ্খিত 'নিত্যধামে' চলিয়া গেলেন।

কালীপ্রসন্নের বংশ তালিকা যথা—১১ দৈবকিনন্দন, ১০ লোকনাথ, ৯ বল্লভ, ৮শ্রীরাম, ৭ রাজেন্দ্র, ৬ হরেকৃষ্ণ, ৫ কৃষ্ণকান্ত, ৪ রামজয়, ৩ রামধন,

২ ক্ষেত্রনাথ।

১মা স্ত্রী, কর্ত্তিকচন্দ্রের ১মা কন্যা   ২য়া স্ত্রী, কার্ত্তিকচন্দ্রের ২য়া কন্যা।

১ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।   শ্রীসত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

২ শ্রীনৃসিংহ হরি মুখোপাধ্যায়।   নিত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার কুলগুরুর মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসী স্বামী দুর্গানন্দ স্বরস্বতীর নিকট তিনি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে দৈনিক দুই একটী করিয়া গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্র গ্রহণের পর মোটে তিনি ৩ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দুই কিম্বা আড়াই ঘণ্টা নিদ্রার পর সমগ্র রাত্রি গৃহাভ্যন্তরে জপ ও সাধনা করিতেন। তাঁহার শিষ্য ভ্রাতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী স্থাপিত পানুড়িয়া ও চাকদহ গ্রামের হরি-সভায় তিনি নিয়মিত রূপ বক্তৃতা করিতেন ও সাধারণ গ্রামবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেতেন।

গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও কালীপ্রসন্ন স্বয়ং তত ভাল গায়ক ছিলেন না; তবে তিনি সুন্দররূপ বাজাইতে পারিতেন। উচ্করণ নিবাসী কালী-চরণ রায় প্রভৃতির ন্যায় দেশ বিখ্যাত গায়কগণ, তাহার নিকট গীত রচনা করাইয়া লইতেন।

কালীপ্রসন্নের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল,—তিনি সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি যথাসম্ভব ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাড়ী জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম ছিল।

এই কয়েকটী মাত্র কথা, কালীপ্রসন্নের বাহ্যিক দরিদ্র-জীবনের ক্ষুদ্র

ইতিহাস। জীবনে বিশেষ কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, কেবলমাত্র দারিদ্র্যের সহিত নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রাম সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের দারুণ অশান্তি। কিন্তু এই সংগ্রামে কে জয়ী হইয়াছিল, পাঠকগণ, কালীপ্রসন্নের রচিত সঙ্গীতাবলী হইতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অর্থহীন জীবনের কি সুন্দর চিত্র দেখুন।

বাউলসুর।

১। অর্থহীন জীবনে কি কাজ আছে।

২। তার কি কাজ বেঁচে।

৩। অর্থ নাই কাছে, কেবল নাম আছে, যেমন থাট সাড়ী কুলবালায় ব্যস্ত ক'রে তুলেছে।

৪। যার হাতে অর্থ নাই, কেউ কথা কয়না ভাই, লক্ষ্মী ছাড়া বাড়া পাপ আর সংসারেতে নাই; ধর্ম্মকর্ম্ম গণ্য মান্য অর্থের পাছু সব গেছে।

৫। অর্থহীনের সংসারে সুখ নাই, মুখে অযাত্রা সদাই, মায়ে নিন্দে লজ্জাভয়ে ভাই বলেনা ভাই; পুত্র কন্যা কাছে যায় না আদর নাই বাপের কাছে।

৬। দৈবাৎ অর্থহীন নরে, গেলে সুহৃদের ঘরে, তারা কয়না কথা তুলে মাথা আদর থাক্ দূরে; তারা ভেবে সারা, লক্ষ্মীছাড়া আমার কিছু চায় পাছে।

৭। ঘরে গিন্নীর কাছেও তাই, কথা বলে আর কাজ নাই, মিষ্ট কথায় কষ্ট সদাই শিষ্ট আলাপ নাই; বলে, ছারকপালে ম'রে গেলে হাড় জুড়ায় আর প্রাণ বাঁচে।

৮। আবার যদি তারই অর্থ হয়, অমনি হেসে কথা কয়, (তখন) কর্ত্তা ছাড়া নাইকো কথা, কর্ত্তা সমুদয়; এখন ভাল মন্দ সকল কথাই হচ্ছে সব কর্ত্তার কাছে।

৯। গতিক সব দেখে শুনে, কালীপ্রসন্ন ভনে, অর্থ বিনা সব অনর্থ জান্লাম এত দিনে, আমি গুরুর চরণ ধরব এঁটে, পরমার্থ যাঁর কাছে।

'অর্থ নাই' অথচ 'নাম আছে' এমন ব্যক্তির সহিত, থাট সাড়ী-পরিহিতা কুলবালার ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত ভাবের সহিত উপমা কত স্পষ্ট ও জীবন্ত। তিনি স্বয়ং অর্থহীন, তাই তিনি মাকে বলিতেছেন,

সুরট মল্লার—একতালা।

১। নাই মা আমার টাকার তোড়া, ব'লে কিগো তারা, ভবদারা পূজা নিবে না নিবে না

২। দিতে নানা উপহার, করি স্তুপাকার, কিনিবার আমার সাধ্য ত হ'লো না।

৩। কোথা পাব গো মা রত্ন অলঙ্কার, মুক্তকেশী মুণ্ডমালী মুক্তাহার, রতন খচিত মুকুট মাথার, নুপুর রচিত মরকত সোণা।

৪। শববাসনা কোথা স্বর্ণাসন পাব, দিগ্বসনা কোথা কাশ্মীরী শাল্‌ব, অট্টহাসা কোথা পট্টবাস পাব, জেনেও কি কিছু জান না ;
(আমায়) যা দিয়েছ দিতে তাই দিব শঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী কোথা আনব চুরী করি, জবা বিল্বদল অর্ঘপাদ্যবারি, দিতে পারি যদি কর মা করুণা।

৫। মনঃপ্রাণ ভক্তি ক্ষিতি অপ্ শূন্য, অনল অনিল, তত্ত্ব অন্য অন্য জগন্ময়ী জগন্মধ্যে তোমা ভিন্ন, কে আছে দিব বল না ;
বারিনিধি বারি বারিদে যেমন, বারম্বার আকর্ষণ-বরিষণ, 'গঙ্গাজলে' যথা গঙ্গার অর্চ্চন', তোরি দিয়ে তেমনি তোরি উপাসনা।

৬। যাকে যা দিতে দিয়েছ সেত তাই দিয়েছে, বেশী দিতে কে কোথা পেয়েছে, তোর মনোমত কে দিতে পেরেছে, জগতে কি ছাড়া তোমা, মুদ্রাহীন অতি ক্ষুদ্র আয়োজনে, কালীপ্রসন্নের তরে পূজা কেনে, নিবে না জননী কেন কি কারণে, সে শ্রীপাদ পদ্ম পূজিতে পাবে না।

আবার,—

পিলু—পোস্তা।

১। যেমন আছে আমার কাছে তেমনি দিব ব্রহ্মময়ী

২। চাইলো বেশী কোথায় পাব দিস নাই ত মা ইহা বই।

৩। তোরি নিয়ে তাকেই দিব আমার কেবল ঢেঁড়া সই,
যেমন দিবি তেমনি দিব বেশী দিতে পারি কই।

৪। করেছ ভিখারীর ছেলে, পুঁজী রাঙ্গা পদ ঐ ;
সাধ করে কি সাধেশ্বরী ভূতের বোঝা মাথায় বই।

৫। মা আমার ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী লোকে বলে কৃপাময়ী
বুঝিতে নারি এ চাতুরী, আমি কি তোর ছেলে নই।

৬। ভোগাতে ভোলাবে কালীপ্রসন্ন তায় ভুলে কই,
(যেন) মরণকালে, কালী বলে চরণ পানে চেয়ে রই।

স্থানান্তরে,—

রামপ্রসাদী সুর।

১। চাইনে তারা টাকার তোড়া।
২। এ যে বিষের হাঁড়ি দিশেহারা।
৩। অকিঞ্চিৎ অনর্থ অর্থ পরমার্থ পথের খাঁড়া;
ভজ্‌লে তারে বিপদ বাড়ে, অহঙ্কারে পূর্ণ করা।
৪। মুদলে আঁখি, সকল ফাঁকি, থাকবে চাকী ঘরে পুরা;
রাঙা চরণ, অমূল্য ধন, হৃদে যেন হই না হারা।
৫। শ্রীনাথ দত্ত, পরমার্থ, আছে আমার হৃদে ভরা;
সে যে নিদানের বল, পথের সম্বল, কি ধন আছে ইহার বাড়া।
৬। কাজ কি আমার এমন ধনে নিধনে যার সঙ্গ ছাড়া;
(আমায়) দিস্ যদি ধন, অভয় চরণ, তবেই জানি কৃপা করা।
৭। কালীপ্রসন্ন কয়, কাজ কি সুখে, পাছে তোকে ভুলি তারা।
আমি থাক্‌বো দুঃখে, ডাক্‌ব তোকে, হাঁক্‌বো মুখে তারা তারা।

কালীপ্রসন্ন 'মুক্তি' অপেক্ষা 'ভক্তি' ধনেরই সমধিক প্রয়াসী,

রামপ্রসাদী সুর।

১। কাজ কি আমার মুক্তি লয়ে।
২। ও সে বেশী কিসে ভক্তি চেয়ে।
৩। সালোক্য সামীপ্য তারা, সারূপ্য সাযোজ্য পেয়ে;
আমার কি কাজ আছে জলধিতে জলবিম্ব মিশাইয়ে।
৪। চাঁদের শোভা চাঁদ কি জানে, চকোর জানে সুধা পিয়ে;
চিনিতে কি স্বাদ বুঝে মা, খাদক বুঝি চিনি খেয়ে।
৫। ভক্তের হৃদে কি আনন্দ, বুঝে বা কে বুঝায় ক'য়ে;
মা জানে না সে আনন্দ চিদানন্দময়ী হ'য়ে।
৬। ভবানী ভ্রূকুটী ভঙ্গী, ভূধর তার পিতা হ'য়ে
জানে না, তা শিব জেনেছেন, ভক্তি ভরে হৃদে থু'য়ে।
৭। চ'লে মুক্তি মুক্তকেশী, শ্রীনাথ দিলেন যুক্তি কয়ে
কালীপ্রসন্নের কর মা কৃপা, শ্রীচরণে ভক্তি দিয়ে।

গৌরী রাগিণীতে কালীপ্রসন্ন গাইতেছেন।

১। একি তেমনি ধারা মেয়ে।
২। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁর চরণ পানে চেয়ে।
৩। তন্ত্র মন্ত্র বেদ বেদান্ত, (যাঁর) অন্ত না পায় ক'য়ে,
তুমি কি করিবে অন্ত দিনান্তে তাঁয় ধেয়ে।
৪। ব্রহ্মাণ্ড গঠিলা ব্রহ্মা (যাঁর) চরণধূলি পেয়ে,
তত্ত্বরূপার তত্ত্ব কেবা সমর্থ নির্ণয়ে।
৫। পঞ্চ প্রেত মঞ্চে যাঁরে মরে ব'য়ে ব'য়ে;
থাকেন যখন যেমন, তখন তেমন, নানা সৃষ্টি হ'য়ে।
৬। কালীপ্রসন্ন কয়, কালী আমার ভবার্ণবের নেয়ে;
অকূল-নিস্তারী চরণ তরি দিবেন বেয়ে।

'মা'য়ের ছেলে' কালীপ্রসন্ন, মায়ের বলে কত বলীয়ান দেখুন।

একতালা—জঙ্গলা।

১। চেন না আমারে শমন, তাই কি তুমি নিতে এলে।
২। আমি কালা মেয়ের ছেলে, থাকি মায়ের কোলে,
বদন ভরে ডাকি মা মা ব'লে।
৩। দাঁড়াও দাঁড়াও একবার মা মা বলে ডাকি,
এলেন কি জননী নয়ন মুদে দেখি,
কাল ভয় হরা কাল হৃদি চড়া, তারা আমার এই বিপদ কালে।
৪। মহাকাল ধরেন যে সম্পদ হৃদে, যে পদে বিপদে পতিত বিপদে
(সেই)শমন দমন পদে, শমনরে বিপদে,শরণ লয়েছি ভয়কি কালে।
৫। চাইলে ছুতে যদি পারিস রে কৃতান্ত, বৃথা যপি তবে কালী সোঢ়া মন্ত্র
বৃথা অহঙ্কার, করি শ্যামা মার, কালী কালবারিণীর ছেলে ব'লে।
৬। বৃথা ধরি কালী নামের কবজ পাটা, বৃথা ধরি হৃদে কালী রূপের ছটা
(বৃথা) কালী নামের মালা,হৃদি করি আলা, কালীপ্রসন্নের গলে দোলে।

এমন মা যে কালীপ্রসন্নের আদরের তাহার আর কথা কি? তাই তিনি আদর করিয়া ডাকিতেছেন।

রামপ্রসাদী সুর।

১। আদরিণী শ্যামা মা'রে।

২। ডাক দেখি মন আদর করে।

৩। আদর মুখে আদর হাসি, আদর রাশি সুধাধরে
(তাইতে) আদর করে সদানন্দ প্রেমানন্দে হৃদে ধরে।

৪। আদর মাখা তনু মায়ের, অনুমানে বুঝে কেরে
সেই আদরিণীর আদর পেলে অনাদরের আদর বাড়ে।

৫। কালীপ্রসন্ন কয় এ আদরের, কদর বুঝি সাধ্য কিরে;
যাঁর আদর তাঁর পদে দিয়ে, শরণ লওগে চরণ ধরে।

একস্থানে বলিতেছেন।

পিলু—জৎ।

১। ভেবেছ কি কথার কথা খেপা হওয়া খেপা মন।

২। খেপা সাজা, নয়ক সোজা, কত রোজা খেপার বোঝা ব'ন।

৩। কপ্নি ঝুলি নামাবলী, ছেঁড়া কাঁথায় সেজে সঙ্;
বল্‌লে খেপা, হয় না খেপা, কেবল, খেপায় তারে খেপা জন।

৪। ভিতরে কাজল, বাইরে আজল, বদমাইসির নিদর্শন;
এ খেপামি খেপ্‌হারান, সে খেপানয় সাধারণ।

৫। খেপার মত যে খেপেছে, সে করে কি আড়ম্বন;
সে অন্তরেতে চিন্তা করে চিন্তামণির শ্রীচরণ।

৬। অন্তরে অন্তরে খেপা, খেপা খেপীর সঙ্গে রণ,
খেপার খেপা গুরুদত্ত পরমার্থ রত্নধন।

৭। ধরবে কালী প্রসন্ন সেই, খেপা খেপীর শ্রীচরণ;
যেন ফিরতে না হয়, ফের খেপে আর, এই খেপেই খেপের মতন।

কালী প্রসন্ন নানা বিষয়ের উপমা দিয়া গান রচনা করিয়াছেন; সেই বিষয় গুলি তাঁহার একান্ত আয়ত্তাধীন।

মুলতান—একতালা।

১। ওযুধ খেয়ে দেখ মন।

২। হবে ভবব্যাধি একবারে নিবারণ।

৩। মন তোমারে বলি ত্যজরে সন্দেহ, হরি নাম মধু কর অবলেহ,
সংসার বাসনা চূর্ণ তাহে দেহ, দেহ হবে রে শোধন।

৪। নিবৃত্তি লঙ্ঘন কর দেখি মন, বিপাক অপাক হবে না,
ত্যজ বিষয় কুপথ্য, হরি তত্ত্বতথ্য, সুপথ্যেতে পিত্ত রবে না ;
চিন্তামনি চূর্ণ অষ্টমূর্ত্তি রসে, চতুর্ম্মুখ তাহে জ্ঞান খলে মিশে
অভয়া বটিকা বেন্ধে অবশেষে, কর দেখিরে সেবন।

৫। মনরে বালামৃতে গুরু মন্ত্র মথে মর্দ্দন কর রে,
(তবে) যাবে রে যন্ত্রণা, বলি সুমন্ত্রনা, ভালবাসি ব'লে মন তোরে,
কালী প্রসন্ন এ ভব রোগে চিররোগী, ঔষধ সেবনে সতত বিরাগী,
শ্রীনাথ অনাথ নাথ বিধানেন তার লাগি নিদানে শ্রীচরণ।

কৃষ্ণ-কালী বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করা গেল ;—

মুলতান—আড়াঠেকা।

১। একবার দেখিহে বাঁকা আঁখি।
২। কাল এলোকেশী রূপে দাঁড়াও দেখি।
৩। (একবার) বাঁশী ত্যজি অসি ধর কালশশী, করাল বদনে অট্ট অট্টহাসি,
রণ মত্ত বেশে রণ রঙ্গে ভাসি, রুধির ধারে মাখি।
৪। বিপরীত রসে, মাতি রতি রসে, মহাকাল হবেন শ্রীমতী।
(তোমার) শ্রীরাস মণ্ডল, সহস্র কমল, রাসময় হবে সংপ্রতি ;
ধরিয়ে ঐ পদ হৃদয়কমলে, শবছলে দেহ রবে ক্ষিতি তলে,
দৈত্য দর্পহারী রিপুদৈত্য দলে সমুলে নাশ দেখি।
৫। (আমার) স্নেহ মায়া হবেন নন্দ যশোমতী, ব্রজাঙ্গনা যত সুমতি,
প্রণয় সুঠাম, দাদা বলরাম, ভক্তি হবেন শ্রীবৃন্দা দূতী ;
আশা নদী হবে যমুনা পাথার, রাখাল বেশে সব ইন্দ্রিয় আমার
দাস হ'য়ে সবে লবে সেবাভার, কিছু না রবে বাকী।
৬। মনোজবা ফুলে ভক্তি বিল্বদলে, তুলব মনে মনে যতনে,
(করি) মনোজরকত চন্দন চর্চ্চিত অর্চ্চনা করিব চরণে ;
প্রেম অশ্রুজলে অর্ঘ্যপূর্ণ করি, পূর্ণানন্দে পাদ পদ্মে দিব হরি,
কালীপ্রসন্নের বাঞ্ছা দিগম্বরী, সতত হৃদে রাখি।

আবার, সামান্য বিষয়ের সহিত গভীরতর বিষয়ের তুলনা কেমন প্রাঞ্জল।

বাউল সুর।

কৃষ্ণপ্রেম অতলনদী, নিরবধি স্নান কর আনন্দ হয়ে।
।। দেহমন ঠাণ্ডা হবে, দেখতে পাবে, পাপের ময়লা যাবে ধুয়ে।

প্রেমের হিল্লোলে ভেসে, হেসে হেসে, যাও যদি উজান বেয়ে,
বারেক তায় মগ্ন হ'লে, অগাধ জলে, থাক্‌বেরে আনন্দে শুয়ে।
নদীতে যে নেমেছে, সেই ডুবেছে, তবু লোকে যাচ্ছে ধেয়ে;
ছাড়েনা কোনও মতে, ছুট্‌ছে পথে, উঠ্‌ছে আবার আছাড় খেয়ে
জলেতে কুমীর আছে, ধরবে পাছে, ইষ্ট কবচ নাওরে গায়ে;
কালীপ্রসন্ন শরণ, শ্রীনাথ চরণ, বইছে তরি ভবের নেয়ে।

ঐ

১। শ্রীগুরু মন্ত্র ইঁটে, জ্ঞান ঢেঁকিতে, সুর্কি কুটে দালান করিরে।
২। রিপু ছয় ঋতু যোগে, কিসের লেগে, ভবরোগে ঘুরে মরিরে।
৩। শ্রীগুরুতত্ত্ব কাঠে, দাওনা এঁটে, বিবেচনা সূত্র ধরি;
সাধনা করাৎ ধরে, দাওনা চিরে, বেশ হবে বিশ্বাসের কড়িরে।
৪। ভক্তিচূণ খাসা সাদা, গাদা গাদা, মনভাঁটিতে জড় করি;
লাগিয়ে দশটি রাজে, চিত্ত মেজে, সোজা কর মাটাম ধরিরে।
৫। সুষুম্না শিকল আঁটা, চৌকঠাটা, মিছে কেন থাকে পড়ি
চিত্ত সংযম কপাটে, দাওরে এঁটে, একদমে দম, কব্জা জুড়েরে।
৬। শ্রীচরণ টালীযুড়ে, ছাত পিটারে, বদলাতে হবে না কড়ি;
কালীপ্রসন্ন ভনে, এক কাঠামে, কাল কাটাব মজা করিরে।

আবার,—

বাউল সুর।

১। ভাবরে কিসের জন্য, নূতন ধান্য, কেটে আয় নবান্ন করিরে।
২। খাঁটি শ্রীচরণামৃত, দুগ্ধকত, রেখেছি মন বাটী পূরিয়ে।
৩। পূর্ণপ্রেম অশ্রু জলে, নারিকেলে ছড়াও কুচি কুচি করি;
কর তায় মুঠোখণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, তত্ত্বকাণ্ড খণ্ড করিরে।
৪। কৃষ্ণনাম সস্তা চিনি, নাওরে কিনি, দিয়ে পরমার্থ কড়ি,
মাখতায় ভক্তি কলা, মনরে ভোলা, এই বেলাতে যোগাড় করিরে।
৫। রাধানাম নবাৎ মেখে, মনের সুখে, আনরে পান ফল চারি,
কালীপ্রসন্ন বলে, কাজ কি গোলে, ব'সে যানা তাড়াতাড়িরে।

ঐ

১। (?)দার উপর খেজুরকারী তোর চল্‌বে না।
২। ব্রহ্মাকল্পতরুর কলম কোনও মতে টল্‌বে না।

৩। কর্ম্মফলে খণ্ডিবারে করছ যত ক্রম, সেটা কেবল মনের ভ্রম,
তোমার লণ্ডভণ্ড কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড পরিশ্রম ;
তোমার মুঠোর উপর দুটো দিলে, পড়বে—হাতে ধরবে না।

৪। মরুস্থলে রত্ন মিলে থাক্‌লে কপালে, ভাঙ্গা কপালের ফলে,
মেরু শিরে খুঁজলে কানা কড়ি না মিলে, ঘরে বসে রত্ন ফলে,
ধাইলে ধন ত মিলবে না।

৫। গেলে ছট্‌কে ঘটী হাতে ক'রে সাগরের কূলে,
বেশী জল তুলবেরে বলে ;
ছুট্‌লে দৌড়ে ক' হাঁড়ী জল তুল্‌তে পারিলে,
(তোমার) যেমন ঘটী তেমনি পাবে, বেশী জল ত তুলবে না।

৬। অকার্য্য অসাধ্য কিছু নাইক তোমাতে, কেবল ধনমদে মেতে
ভাবছ মনে আর সেখানে, হবে না যেতে,
কালীপ্রসন্নের মন ভুলছে কালে, কালত তারে ভুল্‌বে না।

সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে কালীপ্রসন্ন বড়ই ত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাই

একতালা—মুলতান।

১। (তারা) আর কতদিন দীনে, কৃপাক্ষে হেরিবিনে, কৃপাময়ী তাই বল না।

২। (আর) ক'দিন এমন করে, কান্দব মা সংসারে,
আমার আসার আশা কিছু হলো না।

৩। (ঘোর) সংসারে বিবাদ, হলো প্রতিবাদ, প্রতিবাদ কিছু করলি না ;
(তারা) বাঁচতে ভবে আর, তিলার্দ্ধ আমার, নাইক সাধ গো ত্রিলোচনা।

৪। পরিবার বর্গের, পূরল না মা সাধ, দিবা রাত্রি এই গঞ্জনা ;
আমার কপালের দোষ, সবাই করে রোষ,
(কেউ) দোষী কি অদোষী দেখ্‌লে না।

৫। প্রভাত কালে উঠি, অর্থ লাগি ছুটি, দিনান্তেও ছুটী মিলে না ;
উপায় কর'লাম যা মা তারা, কর'লাম উদর সারা,
উদরের দ্বার আর পূরলোনা।

৬। (হাতে) নাই মা পুঁজি পাটা, ঘট্‌ল বড় লেঠা,
গরিব বলে যমেও নিলে না ;
(ওমা) আসলে উষুলে, ফাজিল উঠ্‌লো ঠেলে,
হিসাব দিব কিসে মিল্‌লো না।

৭। আমার সদাই প্রাণ জ্বলে, বাঁচি একবার ম'লে,
(দেখ্‌ছি) প্রাণান্তেও প্রাণত গেল না;
কালীপ্রসন্নে বিদায় দিয়ে ভবদায়, মুক্তি কর হর-ললনা।

প্রবন্ধের কলেবর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। কালীপ্রসন্নের নানাবি বিষয় অবলম্বনে ছয় শতেরও অধিক গান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সে সমুদয় গীতাবলী হইতে দশ পনরটি গানে রচয়িতার ক্ষমতার সম্যক্ পরিচ প্রদান করা অসম্ভব। এই নিমিত্ত আমরা যথা তথা হইতে তাঁহার সাংসারিং ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাপক কয়েকটি মাত্র সঙ্গীত উপহার দিয়া অদ্যকার মত ক্ষান্ত থাকিলাম। কালীপ্রসন্নের সমস্ত গীতাবলীই অপ্রকাশিত. কেবল মাত্র একটি কালীকৃষ্ণ বিষয়ক গান 'বঙ্গবাসী'র 'সঙ্গীতসার সংগ্রহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ঠে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আরও দুইটি গান শুনুন,—

রামপ্রসাদী সুর।

১। মা আমায় কাঁদাবে কত।
২। যত হ্যাঁচকন্দুলে ছেলের মত।
৩। মা মা বলে কেন্দে তোরে, ডাকলে আর কান্দতে হয় নাত;
মা তোর নামে, কান্নার সীমে, ভবকান্না নয় মা হত।
৪। মায়ে মেলে মা মা বলে, মায়ের পিছুই ধায় মা সুত;
অম্‌নি বাহুতুলে, নেন্ মা কোলে, শান্ত করেন কত মত।
৫। দিস্‌বা না দিস্, অভয় চরণ, ডাক্‌তে তবু ছাড়ব নাত;
(আমার) আর কে আছে, যেতে কাছে,
(হয়) পর কি পরের অনুগত।
৬। কান্না শুনে কান না দিলি, কেবল কান্না দিলি যত তত;
কি দোষেতে দোষী কালীপ্রসন্ন তোর পদে এত।

আড়া মুলতান।

১। আমার অশৌচ হয়েছে।
২। শমন এসনা, এসনা এসনা কাছে।
৩। পিতা দুটি মাত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম পুত্র, জন্মমাত্র তারা হত হয়েছে;
(ভাই) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সপত্নি দুজনে পুত্রশোকে পরলোক গিয়েছে।

৪। ওরে ক্রিয়াকর্ম্ম যত, হয়েছে সব হত, অনুগত যত গতরে ;
ওরে সেই শোক ভরে, বৃদ্ধ পিতা ঘরে, মোহ নামে তিনিও হতরে ;
পিতৃশোকে আমার মায়া মা মরেছে ;
সন্ধ্যাদি বন্দনা সব বন্ধ করেছে ;
শুনরে কৃতান্ত, হতে অশৌচান্ত কালান্ত বাকী আছে।

৫। আমার অজ্ঞানান্ধ ঘোর, হয়েছেরে ভোর,
জ্ঞানালোক দেখা দিয়েছে,
আনন্দ কোকিল কাকলি কূজনে দুরাশা কুতন্দ্রা গিয়েছে।
দেখে শুনে সব হয়েছি বিরাগী, হয়েছিরে গতকালী গৃহত্যাগী
কালীপ্রসন্নে ছুঁওনা, তাইতে করি মানা, কি জানি ছোঁও পাছে।

কালীপ্রসন্নের গুরুতত্ব, মানসপূজা, বৈরাগ্য, ব্রহ্মসঙ্গীত, শিব সঙ্গীত ; আগমনী, কৃষ্ণকালী, কালীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, গঙ্গা, কালী, ষট চক্রভেদ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে অতি সুন্দর সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদী ও বাউল সঙ্গীতগুলি অতি সুমিষ্ট। পাঠকবর্গের কৌতূহল হইলে আমরা ক্রমশঃ কালীপ্রসন্নের সমগ্র সুন্দর সুন্দর গীতাবলী বীরভূমিতে প্রকাশিত করিতে পারি।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

প্রণয়।

১

রতন স্বরগ চ্যুত—পবিত্র প্রণয়,
স্বরগে তোমার জন্ম
স্বর্গীয় তোমার কর্ম্ম
দুর্গম তোমার মর্ম্ম—
মধুর নিশ্চয়,
তোমার প্রকৃত সুখ মানবের নয়।

২

প্রণয়রে ! শুন্যে তুমি স্বর্গের সোপান,
কত ঋষি তপোবনে
কত যোগী যোগাসনে
কত সাধে নিশি দিনে—
পায়না সন্ধান,
কখন কি ভাবে তুমি কোথা অধিষ্টান।

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধু কালীপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী যুক্ত বাবু নিত্যপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এই জীবনী সংগ্রহে আমার সম্পূর্ণরূপ সাহায্য করিয়াছেন এবং কালীপ্রসন্নের রচিত সমগ্র প্রকাশিত গীতাবলী আমার যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন।

৩

অন্ধের নয়ন তুমি অজ্ঞানের জ্ঞান,
তুমি কৃপা কর যারে
সংসার ভুলাও তারে
শিখাইয়ে দাও তারে
সুখের বিধান,
বিরলে বসিয়ে গায় তব গুণগান।

৪

নির্ম্মল প্রণয় চায় পবিত্র পরাণ,
রূপের প্রণয় নয়
গুণের প্রণয় নয়,
কুলের প্রণয় নয়
কিম্বা ভাগ্যবান,—
সে পথে অভাগা কত পেয়ে যায় ত্রাণ।

৫

বুঝেনা মানব কিসে অঙ্কুর তোমার,
বুঝেনা তোমার গতি
জানেনা তোমার রীতি
কি ভাবে তোমার স্থিতি
বুঝে উঠা ভার,
জানেনা মানব তুমি কিসে হও কার।

৬

অনুমানে বুঝি তুমি কঠিনের নও;
কঠিন স্বভাব যার
বিফল সাধনা তার
মিছা সহে দুখ ভার
(তবে) কেন আশা দাও,
তুমিও কঠিন আহা আশ্রিতে কান্দাও।

৭

কুটীল সংসারী মিছে করে আবাহন;
সংসারে ডুবিয়া থাকে
তবু মনে সাধ রাখে
তব গুণ গায় মুখে
প্রণয়ী যে জন;—
রাখিতে তোমার মন দিতে নারে মন।

৮

প্রণয় পবিত্র নিধি সংসারের সার;
সরল প্রণয়ী জন,
পবিত্র প্রণয়ী মন
অমূল্য প্রণয় ধন—
সৃষ্টি বিধাতার,
যে বুঝে তোমায় তার মর্ম্ম বুঝা ভার।

৯

অস্তিত্ব তোমার বুঝি সংসারেতে নাই
গঠিত শূন্যের ধূলে
পালিত শূন্যের কোলে
স্থাপিত প্রেমের মূলে—
তব ভিত্তি নাই,
স্থায়িত্ব, ভিত্তির সনে সচঞ্চল তাই।

১০

তবে কেন তব নামে এহেন মাধুরী;
সংসারী বিরাগী বেশে
বিজনে বিপিনে পশে
ভূপতি তোমার বশে
পথের ভিখারী,
পাগলের বেশে যাপে দিবস শর্ব্বরী।

১১

এ হেন পবিত্র ভাবে কলঙ্ক প্রকাশ;
দম্পতী তটিনী তটে
তোমারি ক্ষমতা রটে
তোমারি মাধুরী বটে
বাড়ায় উচ্ছ্বাস
পারেনা লভিতে, কেন লয় অবকাশ।

১২

প্রণয়রে ঐটুকু কলঙ্ক তোমার,
সাধিয়ে একান্ত মনে
পুলিনে প্রান্তরে বনে
কেন্দে কেন্দে দুটি জনে
আসেনাক আর;
মূর্খতায় রাখে শুধু কলঙ্ক তোমার।

১৩

রে প্রণয়! ও কলঙ্ক ধরি না তোমার
প্রণয়ে কান্দিতে হয়
সে দোষ তোমার নয়
ধর্ম্ম তুমি, প্রেমময়
নামটি তোমার
অমূল্য রতন তুমি সংসারের সার।

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্‌ সোভান

বীরভূমে সেন্সস বা জনসংখ্যা।

১৯০১

প্রথম প্রস্তাব।

দশ বৎসর পরে আমাদের দেশে আবার সেদিন সেন্সস বা জনসংখ্যা হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে ১৮৭২,-৮১,-৯১ সালে আরও তিন বার রীতিমত সেন্সস হইয়া গিয়াছে। রাজার পক্ষে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় অবগত হইবার, সেন্সসের ন্যায়, আর কোন কার্য্যকরী অনুষ্টান আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান রাজত্বেও 'আদম সুমারী' বা লোক সংখ্যা হইত।

এই সেন্সসে যে শুদ্ধ প্রজার সংখ্যা অবগত হওয়া যায়, তাহা নহে। ইহাতে, দেশের সমাজতত্ব, ভাষাতত্ব, জাতিতত্ব, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি বা অবনতির কারণ, জাতীয় ব্যবসায় বা জাতীয় অবলম্বন প্রভৃতি জটিল ঐতিহাসিক তথ্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিবার, সেন্সস প্রধান উপকরণ।

বর্ত্তমান ১৯০১ সালের সেন্সসের ফলাফল আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। ইহাতে বীরভূম জেলার ১৮৯১-১৯০১ এই দশ বৎসরের ইতিহাস প্রকটিত আছে।

এই প্রবন্ধটি সমগ্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত বীরভূম জেলার সেন্সস রিপোর্টের মর্ম্মানুবাদ। এই রিপোর্ট বা বিবরণীর আকার বৃহৎ, আমরা ক্রমশঃ সমগ্র রিপোর্টের, সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিবার আশা করি। এই রিপোর্টখানি ভবিষ্যতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমাদের সদাশয় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার শ্রীযুক্ত এ, আহাম্মদ এস্কোয়ার সি, এস্, বাহাদুর তৎ-পূর্ব্বেই 'বীরভূমি'তে প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে

সমধিক উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট যে আমরা কি পরিমাণে ঋণী, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাস্তবিকই অক্ষম। *

জেলার ইতিহাস (১৮৯১-১৯০১) এবং জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি।

সীমানা পরিবর্ত্তন—বিগত দশ বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৯১ সালের সেন্সসের পর, জেলার সীমানার বা আয়তনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সিংনগর, রাজবাড়ী ও গোপালপুর, এই তিনখানি গ্রাম বীরভূম জেলার সীমানার মধ্যে অবস্থিত হইলেও, পাকুড় সবডিবিজনের শাসনাধীনে ছিল। শুদ্ধ এই তিনটি গ্রাম, ১৮৯৫-৯৬ সালে বীরভূমের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া নলহাটী থানার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আয়তনের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না, পূর্ব্ববৎ ১৭৫৩ বর্গ মাইলই রহিল। কিন্তু ঐ তিনখানি গ্রামের লোক সংখ্যা (৪২১ জন), গত সেন্সসে পাকুড়ের অধীনে হইয়াছিল বলিয়া, এক্ষণ তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, বীরভূমের সেন্সসের জনসংখ্যা ৭৯৭৮৩৩+৪২১=৭৯৮২৫৪ ধরিয়া লইতে হইবে।

নলহাটী ব্যতীত জেলার অধীনস্থ থানা গুলিরও সীমানা বা আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্বে মুড়ারই একটি আউট্‌পোষ্ট ছিল; ১৮৯৯ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নলহাটীর কতকাংশ মুড়ারই আউট্‌পোষ্টের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া নলহাটী ও মুড়ারই এই দুইটি স্বতন্ত্র থানার সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই জন্য, পূর্ব্ব সেন্সসে ৮টি থানা দেখান হইয়াছিল, এবার হইল নয়টি, যথা সিউড়ী, দুবরাজপুর, বোলপুর, সাকুলীপুর, লাভপুর, রামপুরহাট, মৌড়েশ্বর, নলহাটী ও মুড়ারই। তবে, আউট্‌পোষ্টের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে ছিল ৮টি, এক্ষণ হইয়াছে ৪টি। দুনিগ্রাম, বেঙ্‌চাতরা, ও সাঁইথিয়ার যে আউট্‌পোষ্ট ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে,—আর মুড়ারই ত স্বতন্ত্র থানা হইয়াছে। বর্ত্তমান ৪ঠি আউট্‌পোষ্টের মধ্যে, রাজনগর ও মহাম্মদবাজার সিউড়ী থানার, ইলামবাজার বোলপুর থানার এবং খয়রাশোল দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত।

* বীরভূমির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবার জন্যও ইনি দয়া করিয়া আমায় কালেক্টারী ও ফৌজদারী উভয় আফিসের পুরাতন দপ্তর হইতে আবশ্যকীয় কাগজ পত্র দেখিতে পাইবার এবং কালেক্টারী লাইব্রেরীর পুস্তক সমূহ আবশ্যক মত ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। জানিনা, এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত কি বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। লেখক।

বীরভূম জেলার অধীনস্থ থাকিয়াও কোন কোন মহাল মুর্শীদাবাদে রাজস্ব প্রদান করিত, ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বীরভূমে রাজস্ব প্রদান করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতেও অবশ্যই জেলার সীমানা বা আয়তনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

আভ্যন্তরিক উন্নতি—এই কয় বৎসরে সমগ্র জেলায়, ১৮৭০ সালের ৬ আইন প্রচলিত হওয়ায় এবং ঘাটোয়ালী জমি, জমীদারগণকে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়ায় জমীদারগণ অবশ্য লাভবান হইয়াছেন।

আলোচ্য এই দশ বৎসর মধ্যে, নূতন সব্‌রেজেষ্টারী আফিসের সৃষ্টি, দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা,নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, সহরে ও পল্লিগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিবিধ আয়োজন, বিদ্যালয় এবং সাধারণের হিতকরী অন্যান্য অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, কোন নূতন রেলরাস্তা নির্ম্মাণ অথবা আম্‌দানী রপ্তানী করিবার কোন সুবিধাজনক বন্দোবস্ত ও সাধারণের অভ্যাসগত প্রকৃতির উন্নতিকল্পে কোন পরিবর্ত্তন, এ সকল কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য ঃ—বিগত দশ বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর দুইটি তালিকা প্রদত্ত হইল——

মৃত্যু তালিকা।

বৎসর	জ্বররোগে	বিসুচিকা রোগে	উদরাময় রোগে	বসন্ত রোগে	অন্যান্য কারণে	মোট সংখ্যা	প্রতি মাইলে মৃত্যু সংখ্যার হার।
১৮৯০-৯১	১২৯৯৪	৪৩৫	১৪৪	১৭	৫৮৮৪	১৯৪৭৪	......
১৮৯১-৯২	১৮৮৫৬	১১১৪	১২৯	৪	৬২৩৩	২৬৩৩৬	৩০·৭২
১৮৯২-৯৩	১৮৭৮৯	২০৯৬	১৫৮	২৩	৫২৩১	২৬২৯৭	৩২·৯৬
১৮৯৩-৯৪	১৬০৩০	৩৮০	১১১	৫	৬৬৪৬	২৩১৭২	২৯·০৪
১৮৯৪-৯৫	১৯৮৯০	২৫১৭	১৫১	৮	৬১২০	২৮৬৮৬	৩৫·৯৫
১৮৯৫-৯৬	১৯০২১	১৫৭৬	১১৭	৩৮	৫৬৯৬	২৬৪৪৮	৩৩·১৫
১৮৯৬-৯৭	১৮৬৫৮	১৪১৬	১১৭	১৯৯	৫৭৩০	২৬১২০	৩২·৭২
১৮৯৭-৯৮	১৫৬৪৪	১২৮৪	৮৯	১৭৪	৬৫৪৭	২৩৯৩৮	২৯·৭৩
১৮৯৮-৯৯	১১৩৮৩	১৭২	৭৩	৩৯	৫৪৯[illegible]	১৭১৫৭	[illegible]·৫০
১৮৯৯-১৯০০	১৩৪৩৫	২৯২	৬১	৪	৬৭৩৪	২০৫২৬	২[illegible]৭১

জন্ম তালিকা।

বৎসর	মোট	প্রতি মাইলের জন্ম সংখ্যার হার।
১৮৯১-৯২	...	২৭·৮৩
১৮৯২-৯৩	...	৪০·৬২
১৮৯৩-৯৪	...	...
১৮৯৪-৯৫	...	৩২·৪৯
১৮৯৫-৯৬	২৮৮৮৮	৩৬·২০
১৮৯৬-৯৭	২৯৫৩০	৩২·৭২
১৮৯৭-৯৮	৩১৯৮৩	৪০·০৭
১৮৯৮-৯৯	৩৫০৫৪	৪৩·৯১

মারিভয় অথবা দেশব্যাপী অপর কোন সংক্রামক পীড়া এই দশ বৎসর মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। ১৮৯১—৯২ সালে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিবাসী-গণের স্বাস্থ্যের অবস্থা হীনতর ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের সূত্রপাত হইয়া নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তদনন্তর কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া মার্চ্চ মাসে (১৮৯২) পুনরায় আবির্ভূত হয়। জেলার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক এই জ্বর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; সুখের বিষয়, মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও, তত লোক হানি হয় নাই। ইহার পর বৎসরও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা সমভাবেই প্রচলিত ছিল। উপরন্তু, লাভপুর, সাকুলীপুর ও বোলপুর থানায় বিসূচিকা রোগের প্রাদু-র্ভাব হইয়াছিল। আজীমগঞ্জ ও কাটোয়া হইতে প্রত্যাগত তীর্থযাত্রিগণ সেই রোগ আনায়ন করে, পরে সংক্রামতা প্রযুক্ত, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ১৮৯০-৯১ সালের বীরভূমে অত্যল্প বারিপাতেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের এতাদৃশ প্রাচুর্ভাব হইবার কারণ বলিয়া সূচিত হয়।

১৮৯৩-৯৪ সালে অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ভালই ছিল—মৃত্যুসংখ্যাও কম। সাধারণতঃ জ্বর রোগেই অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এই বৎ-সর জ্বর রোগে মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম।

১৮৯৪-৯৫ সালে জন সাধারণের স্বাস্থ্য আবার অবনতি প্রাপ্ত হয় এবং জ্বর ও বিসূচিকা রোগে বহু লোকে প্রাণত্যাগ করে। অন্যান্য বারের ন্যায় বোলপুর থানায় জ্বর রোগে মৃত্যু সংখ্যাই অধিক। রামপুরহাটে বিসূচিকার

প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল—২৫১৭ জন রোগীর মধ্যে ১৯৮৫ জনের মৃত্যু ঘটে।

১৮৯৫-৯৬ সালে স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্ব বৎসরের স্থায়; বিসূচিকার প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও জ্বর পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে।

১৮৯৬-৯৭ এই বৎসর অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল। কিন্তু বোলপুর, সিউড়ী, লাভপুর ও দুবরাজপুর, এই কয় থানার অন্তর্নিবিষ্ট গ্রাম সমূহে জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া লোক হানি হয়। বোলপুর, লাভ-পুর, সাকুলীপুর ও নলহাটী থানায় জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত বিসূচিকা রোগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

ইহার পর, তিন বৎসর ধরিয়া, জন সাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবশ্য ভালই ছিল বলিতে হইবে। এই দশ বৎসরের তালিকায়, ১৮৯৮-৯৯ সালের মৃত্যু সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। পূর্ব্ব দুই বৎসর সামান্য বৃষ্টিপাতের পর ১৮৯৭ সালে সর্ব্বত্র সমভাবে ধীরে সুস্থে বৃষ্টিপাত হওয়ায় স্থানে স্থানে জল জমিয়া দুষিত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি করিতে পারে নাই; অধিকন্তু, লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অবস্থার সচ্ছলতা হইয়া উঠিল। ১৮৯৬-৯৭ সালের শেষাংশে এবং ১৮৯৭-৯৮ সমগ্র বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ ও আহার্য্য দুর্মূল্য হইলেও সাধারণ মৃত্যু সংখ্যার তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই।

জন্মতালিকা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বড় একটা আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ প্রথম কয় বৎসরের। কারণ জন্ম বিবরণী সংগ্রহ প্রণালীটাই তত কার্য্যকারক নহে। তত্রাচ আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে, মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা জন্মসংখ্যা বরাবরই অধিক; এমন কি, শেষ দুই বৎসরের অর্থাৎ ১৮৯৮-৯৯ ও ১৮৯৯-১৯০০ সালের মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা জন্মসংখ্যা প্রায়ই দ্বিগুণ। পূর্ব্ব সেনসসের জনসংখ্যা অপেক্ষা এবার যে ১০৩২৭৫ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে, বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দেশের বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা, বিশেষতঃ মারিভয় বা অপর কোন দেশব্যাপী সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

বীরভুম জেলা মধ্যে সিউড়ী মিউনিসিপালিটি ভিন্ন অপর কোন মিউনি-সিপালিটি নাই। এই দশ বৎসর মধ্যে এই সহরের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি তত মনোযোগ করা হয় নাই। জেলার প্রাকৃতিক গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্যাংশে পয়ঃপ্রণালী

বা জল নিকাসের অসুবিধার কথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সার-ডোবা, গৃহস্থের ব্যবহৃত ময়লা জল, অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও অন্যান্য আবর্জ্জনা প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়, এই গুলিই অস্বাস্থ্যের মূল। গ্রাম-বাসিগণ ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তাঁহারা স্বয়ং এই সকলের প্রতিবিধান করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

অধিবাসিগণের বৈষয়িক অবস্থাঃ—বীরভূমের অধিবাসী কৃষিজীবী; সেই জন্য ইহাদের বৈষয়িক অবস্থার বিষয় অবগত হইতে হইলে জেলার কৃষিকার্য্যের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নেত্রপাত করিতে হয়। বীরভূম জেলার অধিকাংশ স্থলই উন্নতাগত, এই জন্য এখানে কখনই অজন্মা হয় না, সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেও 'জোল' জমীতে আবশ্যকমত শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্যের জন্য এই প্রকার ভূমিই উপযুক্ত, ধান্যও সেইজন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মোটামুটী বলিতে গেলে, এই কয় বৎসর লোকের অবস্থা ভালই ছিল বলিতে হইবে, এবং অনেক উন্নতি লাভও করিয়াছেন। তবে এক্ষণ জমিদার হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সকলেরই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকদিগেরই যত কিছু কষ্ট—তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়ে সঙ্কুলান হয় না, এদিকে তাহাদের বাবুয়ানীর আদর্শ সামান্য কৃষকদিগের ন্যায় ছোট খাট নয়। ফলে, ইহাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হইতে পাইতেছে না।

১৮৯১-৯২ সালে প্রায় চতুর্থাংশ ফসল উৎপন্ন হইল না। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদন হওয়ায় সমগ্র জেলার খরচ সঙ্কুলান হইয়াও অনেক উদ্ধৃত্ত ছিল। তদনন্তর তিন বৎসর ধরিয়া শস্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী ৩বৎসরেও শস্য সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও অত্যন্ত মহার্ঘ ও সুবিধামত দরে প্রজারা শস্য বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হইয়া উঠিল। তবে, দৈনিক মজুর ও সাধারণ ভদ্রলোকদিগের চূড়ান্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কারণ মজুরের দৈনিক বেতন অথবা যে সকল ভদ্রলোকের তত ভূসম্পত্তি নাই, অধিকাংশ চাকুরীর উপর নির্ভর, তাহাদের বেতনের বৃদ্ধি নাই, অথচ আহারীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে; ১৮৯৬-৯৭ ও ১৮৯৭-৯৮ সালে ত প্রায় দুর্ভিক্ষই হইয়াছিল। ১৮৯৭—৯৮ সালে গভর্ণমেণ্ট অনেক

টাকা দান দিয়া ভদ্র সাধারণ ও সমর্থ মজুরদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

এদিকে অসমর্থ, খঞ্জ, অন্ধ ও বৃদ্ধ নীচ জাতিদিগকে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার হইতে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে শস্যোৎপন্ন হইলে এই কষ্টের মোচন হয়। কিন্তু অন্যত্র দুর্ভিক্ষ প্রশমিত না হওয়ায় দ্রব্যাদির মূল্যের বিশেষ কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইল না। তবে পরবর্ত্তী কয় বৎসর ধরিয়া প্রচুর শস্যোৎপন্ন হওয়ায় অধিবাসিগণের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে; কর্ম্মচারী ভদ্রলোক, দৈনিক মজুর ও অপরাপর সকলেই এখন সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং সর্ব্বত্রই উন্নতির মৃদু হাস্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

অধিবাসীগণের স্থানান্তরে গমন ও ভিন্ন দেশ হইতে বিদেশীয়গণের আগমন ঃ— বীরভূমে বাস করিবার জন্য ভিন্ন জেলা হইতে আগত লোক সমূহ গণনা করিবার নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কতকগুলি সাঁওতাল মজুর জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত বীরভূমে আসিয়া চিরস্থায়ী রূপে বাস করিয়াছে। ১৮৮১ সালে এই জেলায় সাঁওতাল সংখ্যা মোট ১৪১৭২ জন ও ১৮৯১ সালে ৩৪১৮৪ জন ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সেন্সসে যে সকল সাঁওতাল 'হিন্দু' বলিয়া অভিহিত, 'ক্রিশ্চিয়ান' নহে, শুদ্ধ তাহাদেরই সংখ্যা ৪১৫০০ জন, এতদ্ব্যতীত সাঁওতাল পরগণার সন্নিহিত গ্রাম সমূহে ধান্য ছেদনের সময় অনেক সাঁওতাল মজুর খাটিতে আসিয়া বর্ষারম্ভে প্রত্যাগমন করে।

রেল থাকায়, বিহার অঞ্চলের কতক লোক এদেশে আসিয়াছে। পশ্চিম দেশ হইতেও অনেক লোক রেল-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আসিয়া দোকান খুলিয়া ব্যবসায় করিতেছে, আবার কেহ কেহবা ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিবার কোন উপায় নাই।

বীরভূম হইতে যে সকল লোক স্থানান্তরে গমন করে, তাহার কোন হিসাব রাখা হয় না। চা-বাগানে অথবা ভিন্ন জেলায় খাটিবার জন্য অনেক মজুর বিদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু সংপ্রতি এখানে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন 'কুলীডিপো' বর্ত্তমান না থাকায়, সেই সকল কুলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। রামপুরহাটে পূর্ব্বে একটি কুলীডিপো বা কুলী সংগ্রহের আড্ডা ছিল, কার্য্যাভাবে এক্ষণ তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ সেখানে

কয়েকটি মাত্র বিশ্রাম-গৃহ (Rest-house) আছে; ভিন্ন স্থান হইতে আনীত কুলীদিগকে রেলে চালান দিবার পূর্ব্বে এই গৃহে তাহাদিগকে বিশ্রাম করিবার অবসর দেওয়া হয় মাত্র।

১৮৭২ সাল হইতে মোট লোক সংখ্যার এবং ১৮৯১ সাল হইতে প্রতি থানার লোক সংখ্যার তারতম্য ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ বা আলোচনা—

বীরভূমের জন সংখ্যা।

১৮৭২ সালে	৮৫৩৭৮৫
১৮৮১ সালে	৭৯২০৩১
১৮৯১ সালে	৭৯৮২৫৪
১৯০১ সালে	৯০১৫২৯

১৮৯১ সালের লোক সংখ্যা অপেক্ষা এইবার লোক সংখ্যায় ১০৩২৭৫ বা শতকরা ১২.৯ জন হিসাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বারের সেন্সসে (১৮৮১ সালের) যে, ১৮৭২ সালের সেন্সস অপেক্ষা লোক সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল,১৮৭৯-৭২ সাল হইতে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া যে ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি দেশ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় তাহার প্রধান কারণ। ১৮৮১-৯১, এই দশ বৎসর ধরিয়াও জেলার দক্ষিণাংশে জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্য লোকক্ষয়ও বিস্তর হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৮৮৪ সালে বীরভূমে রীতিমত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৯১-১৯০০, এই দশ বৎসর মধ্যে, কিন্তু ঐরূপ বিশেষ কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; উপরন্তু অধিবাসীগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা বরাবরই অত্যন্ত ভাল ও বৈষয়িক অবস্থা বর্দ্ধিষ্ণু দেখা যাইতেছে। এই সকল অনুকূল কারণ পরম্পরা বর্ত্তমান থাকায়, এই দশ বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। আর এক কথা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেন্‌সেস অপেক্ষা এবার সেন্সসের কার্য্য প্রায়ই যথাযথ শুদ্ধ রূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, বাদ পড়িতে পায় নাই। জন সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া, ইহাও একটি প্রধান কারণ সন্দেহ নাই।

অগ্রেই বলা হইয়াছে, কেবল মাত্র নলহাটী থানাটি, মুড়ারই ও নলহাটী এই দুই স্বতন্ত্র থানায় বিভক্ত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত অপর সকল থানারই আয়তন পূর্ব্বেরই আছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৮৯১ সাল হইতে প্রতি থানার লোক সংখ্যার তারতম্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

থানার নাম	১৮৯১ সাল	১৯০১ সাল	বৃদ্ধি			
সিউড়ী	১২৬২০৮	১৩৯৮১৭	১৩৬০৩	অর্থাৎ	শতকরা	১০.৮.
দুবরাজপুর	১১৯৪৭২	১৩৭৯৬৪	১৮৪৯২	„	„	১৫.৫০
বোলপুর	৯৮৭৮১	১১৫৭৪৯	১৬৯৬৮	„	„	১৭.২.
সাকুলীপুর	৬৮১৪৫	৭৭৫৫৮	৯৪১৩	„	„	১৩.৮.
লাভপুর	৫৭৬২৩	৬৪২৮১	৬৬৫৮	„	„	১১.৫
রামপুরহাট	৯৩৪৩৪	১০২৮১০	৯৩৭৬	„	„	১০.
মৌড়েশ্বর	৮৬৪২৮	৯৩৮৩৯	৭৪১১	„	„	৮.৫
নলহাটী ও মুড়ারই	১৪৮১৬৩	১৬৯৫১১	২১৩৪৮	„	„	১৪.৫

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সকল থানায় বৃদ্ধির হার সমান নহে। জ্বর এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির নিমিত্ত, দুবরাজপুর, বোলপুর ও সাকুলীপুর এই তিন থানায় ১৮৮১ সালের সেন্সস অপেক্ষা ১৪৯১ সালের সেন্সসে লোক সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি থানাতেই এইবার সর্ব্বাপেক্ষা জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। লাভ-পুর, মৌড়েশ্বর, রামপুরহাট ও নলহাটী থানায় ১৮৯১ সালের সেন্সসে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বর্ত্তমান সেন্সসেও বৃদ্ধির হার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী। মৌড়েশ্বরে এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় বৃদ্ধির হার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। মৌড়েশ্বর থানার পশ্চিমাংশ সমগ্রই অনুর্ব্বর ও জঙ্গলময় এবং আবাদী অপেক্ষা পতিত জমীই অধিক, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কম হইবার ইহাই যে প্রধান কারণ, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। গত সেন্সসে নলহাটী থানায় জনসংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; এবারেও বৃদ্ধির হার কম নহে। জেলার মধ্যে এই অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে রবিফসলের চাষ হইয়া থাকে, জমীও উর্ব্বরা; এই থানার মধ্যে (লুপ্‌ ও আজীমগঞ্জ) দুইটি রেললাইন বর্ত্তমান। এই সকল কারণ বশতঃ এখানে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মোটের উপর বলিতে গেলে, বীরভূমের প্রকৃতিগত সুবিধাই এতাদৃশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

প্রতি থানায়, বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যার হার এবং

হ্রাস-বৃদ্ধির কারণঃ—এই স্থানে ১৮৮১ সাল হইতে প্রতি থানায় প্রতি বর্গমাইলে কত লোক, তাহার একটী তালিকা প্রদান করা গেল।

থানার নাম	১৮৮১ সাল	১৮৯১ সাল	১৯০১ সাল	
সিউড়ী	৪০৭.৫২	৪০৫.৮১	৪৪৯.৫৭	(৮)
দুবরাজপুর	৪৬০.২৪	৪৩৪.৪৮	৫০১.৬৮	(৬)
বোলপুর	৪১৯.২৩	৩৮৪.৩৬	৪৫০.৩৮	(৭)
সাকুলীপুর	৫০৪.৬১	৪৬০.৪৪	৫২৪.০৪	(৪)
লাভপুর	৪৫২.৫৭	৪৯৩.৫০	৫৪৯.৪১	(৩)
রামপুরহাট	৪৬৯.০৩	৫০৩.৭৯	৫৪৯.৭৯	(২)
মোড়েশ্বর	৪৪৮.৬৬	৪৭৫.৭২	৫১৫.৫৯	(৫)
নলহাটী ও মুড়ারই	৪৮৫.১৩	৫২৫.২৯	৬১৪.১৬	৬০৮.৮৩ / ৬২০.৮২

দেখা যাইতেছে, নলহাটী থানাতেই বর্গমাইল হিসাবে লোক সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তা হইবারই কথা,—নলহাটী থানার মত সুবিধাজনক স্থান আর কোন থানার মধ্যে নাই। ইহার ভূমি উর্ব্বর ও পূর্ব্বাংশে সমতল, দুইটি রেল লাইন থাকায় গমনাগমনের সুবিধার ত কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। রামপুরহাট ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে—নলহাটীর ন্যায় নানাবিধ সুবিধা এই থানাতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে, লাভপুর; লাভপুর থানার পূর্ব্বাংশ সমতল এবং কৃষিকার্য্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী। আর এক কথা; লাভপুর এলাকা মধ্যে গণুটিয়া রেশমের কুঠী থাকায় তথায় অনেক মজুর কর্ম্ম করিবার সুযোগ পায়। গতবারের সেন্সসে লাভপুরে লোক বৃদ্ধির ইহা একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাকুলীপুর, বোলপুর ও দুবরাজপুর থানায় অপরাপর থানা অপেক্ষা দেশব্যাপী জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সেই জন্য সমতল উর্ব্বর ভূমি, বিশেষতঃ অজয় নদীর তীরবর্ত্তী শস্যপ্রসূ উর্ব্বর ভূমি থাকা সত্বেও, এই সকল থানায় জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই। এই তিন থানার অন্তর্নিবিষ্ট স্থান সমূহে যে সকল নীলকুঠী ও গালার কারবার ছিল, তাহা এক্ষণ একপ্রকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। তদ্ব্যতীত, অজয় নদীর পরপার হইতে কয়লার খনি আরম্ভ হওয়ায়, অনেক মজুর চলিয়া গিয়া বর্দ্ধমান জেলার অধীনস্থ স্থান সমূহে একপ্রকার চিরস্থায়ী রূপে বাস করি-

তেছে। কৃষিকার্য্য এ অঞ্চলের লোকের প্রধান উপজীবীকা হইলেও, অবশ্য স্বীকার করেতে হইবে যে, বীরভূমের পশ্চিমাংশ, পূর্ব্বাংশের ন্যায় উর্ব্বর, সমতল ও চাষের পক্ষে তত উপযোগী নহে। এই নিমিত্ত, এই সকল থানার লোক সংখ্যার হার, পূর্ব্বাংশে অবস্থিত থানা সমূহ অপেক্ষা তুলনায় ন্যূন হওয়া বিবিত্র নহে। সিউড়ী থানার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ সাঁওতাল পরগনার সংলগ্ন। এই জন্য এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ বশতঃ সিউড়ী থানার লোক সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা কম বলিয়া বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

পৌরাণিক চিত্র।

নলদময়ন্তী।

নলের প্রায়শ্চিত্ত।

এ সংসার বড়ই ভীষণ স্থান। তুমি যে কোন কার্য্য কর না কেন, তোমার কার্য্যে সকলে সন্তুষ্ট হইবে না। কেহ নিন্দা করিবে, কেহ বা প্রশংসা করিবে। এই জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী উদ্দেশ্য দেখিয়া কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করেন। কার্য্যের ফল যাহাই হউক না কেন, তোমার উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তবে তাঁহাদের মতে তুমি নিন্দনীয় নহ। আর তোমার কার্য্যের ফল যতই শুভদায়ক হউক না কেন, যদি তোমার উদ্দেশ্য অসাধু হয়, তবে তুমি নিন্দনীয়। অপর শ্রেণী ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করে। তোমার উদ্দেশ্য সৎ হইতে পারে, কিন্তু তোমার কার্য্যের ফল যদি কাহারও পক্ষে অনিষ্ট-কর হইল, তবে তুমি তাহাদের চক্ষে শত ধিক্কারের পাত্র হইলে! আর এক কথা, সকল কার্য্যের ভালমন্দ দুইটা পার্শ্ব আছে। সাধুগণ তোমার ভাল দিক্‌টাই দেখিবেন, দুষ্ট ব্যক্তি মন্দ দিক্ ভিন্ন ভাল দিক্ দেখিতে পাইবে না। মনে কর, তুমি একজনকে একটা পরামর্শ দিলে। ইহাতে তোমার ভাল মন্দ দুই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কেহ ভাবিল, তোমার উদ্দেশ্য সৎ, আবার কেহ বা ভাবিল, তোমর উদ্দেশ্য অসৎ ভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপে দুই ভাবে কার্য্যের বিচার হওয়ায় সংসারে কত অশান্তি, কত মনোমালিন্য, কত লাঞ্ছনা ও কত প্রতারণা অহরহ ঘটিতেছে। নল ও দময়ন্তীর

কার্য্য সম্বন্ধে দুই শ্রেণীর লোক দুই প্রকার বুঝিল। নলের প্রতি দময়ন্তীর ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন। আর নল যে দৌত্য কার্য্যে তাঁহাদের সহিত কোন রূপ প্রতারণা করেন নাই, দেবগণ ইহাও বুঝিলেন। এইজন্য তাঁহারা প্রণয়ী যুগলের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কাল কিন্তু অন্যরূপ বুঝিল। তাহার মতে, দেবগণ উপস্থিত থাকিতেও দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। অতএব নলদময়ন্তী দণ্ডার্হ। নলকে রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট ও দময়ন্তী সঙ্গ হইতে বিচ্যুত না করিলে কলির ক্রোধের শান্তি হইবে না। এখন একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, নল বা দময়ন্তী কলির ত কোনরূপ অপমান বা অপকার করেন নাই। তবে তাঁহাদের প্রতি কলির ক্রোধ হয় কেন? যাঁহাদের অপমান হইয়াছে বলিয়া কলির এত ক্রোধ, তাঁহারা ত কৈ অপমান বোধ করেন নাই। তাঁহারা ত নলদময়ন্তীর প্রতি অতীব প্রীত হইয়াছেন। তবে কলির ক্রোধের কারণ কি? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, পরের অনিষ্ট করাই দুষ্টের স্বভাব। তুমি তাহার অনিষ্ট না করিলেও সে তোমার অনিষ্ট করিবে। সে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধে কেমন করিয়া কার্য্য করিবে? তাই কোন দূরদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন,

অপরাধো নমেঽস্তীতি নৈতৎ বিশ্বাস কারণম্।
বিদ্যতে হি নশংসেভ্যো ভয়ংগুণবতামপি॥

কিন্তু সংসারে পাপের প্রাধান্য যতই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, আর পুণ্যের যতই অনাদর হউক না কেন, যদি কেহ সামান্য মাত্রও অধর্ম্মাচরণ না করিয়া অবহিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সহজে কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। নল ধার্ম্মিক হইলেও একবারে নির্দ্দোষ ছিলেন না। শাস্ত্র-বিগর্হিত দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার অত্যধিক আসক্তি ছিল। তাহা ছাড়া, ধর্ম্মকর্ম্মাচরণের সময় বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও তিনি যে খুব সতর্ক ছিলেন, এমন বোধ হয় না। কলি তাঁহার এই শেষোক্ত অতি সামান্য দোষ পাইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। সংসারের ইহাই নিয়ম। দুষ্টেরা অতি সামান্য ছল পাইলেই অনিষ্ট করিয়া বসে। সুতরাং যাহাতে অতি সামান্য মাত্রও পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে অতি সতর্ক হওয়া উচিত। নলের উপরি উক্ত দুইটি দোষ ছিল বলিয়াই কলি তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিয়াছিল।

দ্যূতক্রীড়ায় অত্যধিক আসক্তি থাকায়, নল হৃত-সর্ব্বস্ব হইলেন। তিনি "সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভূষণ সকল পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র বস্ত্র পরিধায়ী ও অনাবৃতাঙ্গ হইয়া সুহৃদ্গণের শোক-বৃদ্ধি করতঃ অতি বিপুল সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন"। প্রজাগণ ধীরভাবে নলের এই নির্ব্বাসন দেখিল। নূতন রাজা ঘোষণা করিল, "যে ব্যক্তি নলের প্রতি সম্যক আস্থা করিবে, সে আমার বধ্য হইবে।" পৌরগণ পুষ্করের এই ঘোষণা দ্বারা নলের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বিবেচনা করিয়া নলকে আর কোন রূপে সমাদর করিল না। রাজা নল নগরের বহিঃপ্রদেশে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকিলেন, কিন্তু তিনি সৎকারার্হ হইয়াও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সৎকৃত না হইয়া ত্রিরাত্র কাল জলমাত্র আহারে জীবন ধারণ করিলেন।" ভারতীয় প্রজাবৃন্দের এইরূপ এক দিকে অন্ধ রাজভক্তি ও অপর দিকে স্বাধীনতার একান্ত অভাব দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই। যে রাজা এতদিন তাহাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তিনি নিঃসম্বল, পথের ভিখারী। নূতন রাজার ভয়ে কেহই তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! আপন জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকার করা পাশ্চাত্য দেশে বিরল নহে; আমাদের দেশেও নহে। তবে রাজাদেশ অবহেলা করিয়া অপরের সাহায্য করা ভারতে বিরল। ভারতে কয়জন ফ্লোরা ম্যাক্‌ডোনাল্ড দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার প্রধান অথবা একমাত্র কারণ এই যে, রাজা হিন্দুর চক্ষে দেবতা, তাঁহার আদেশ যতই অন্যায় বলিয়া বোধ হউক, তাহা অবহেলা করিলে মহাপাপ! এই জন্যই নল বা যুধিষ্ঠিরের অন্যায় নির্য্যাতনে প্রকৃতিপুঞ্জ নীরব ছিল। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পানিপথ বা পলাশী প্রজার হৃদয় বিচলিত করিতে পারে নাই। আজি যদি অপর কোন রাজা ভারত আক্রমণ করেন, তবে ইংরাজ যে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট কোন সাহায্য পাইবেন, তাহাত আমার বোধ হয় না। আর ইংরেজকে দূর করিয়া অপর কেহ যদি ভারতের অধীশ্বর হয়েন, তবে ভারতের প্রজা যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে, ইহাই বা কিরূপে মনে করি? দুই চারিজন কন্‌গ্রেস করিয়া চীৎকার করিলে প্রজার হৃদয় হইতে বহু সহস্র বৎসরের সংস্কারের অপনোদন হইবে না। দেশের সমস্ত লোককে সাহেব না করিতে পারিলে যে তাহারা রাজনীতি বুঝিবে, তাহাত বোধ হয় না। তাহাতে সুফল হইবে কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

যাহা হউক, নলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তিনি নানা কষ্টে পতিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি বা অপর কেহ বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা তাঁহারই দোষে হইয়াছে, তিনি স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতেছেন। তাঁহার নিজের কোন দোষ নাই, সমস্তই কাল কর্ত্তৃক ঘটিতেছে, এই বিশ্বাসেই নল হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বন মধ্যে যখন তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি হারাইলেন, তখন দময়ন্তীকে বুঝাইলেন,

যেষাং প্রকোপাদৈশ্বর্য্যাৎ প্রচ্যুতোঽহমনিন্দিতে।
প্রাণযাত্রাম্নবিন্দেয়ং দুঃখিতঃ ক্ষুধয়ান্বিতঃ॥
যেষাংকৃতে ন সৎকারমকুর্ব্বন্ ময়ি নৈষধাঃ।
ইমেতে শকুনা ভূত্বা বাসোভীরু হরন্তি মে॥

"আমি যাহাদের কোপহেতু ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি এবং ক্ষুধাপীড়িত দেহে অতিকষ্টেও প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছি না; হে ভীরু যাহাদের নিমিত্তে নিষধবাসী প্রজা সকল আমার সমাদর করে নাই, তাহারাই পক্ষী হইয়া আমার বস্ত্র হরণ করিলে।"

আবার নিজদোষ স্খালনের জন্য দময়ন্তীকে বলিতেছেনঃ—

হে ভীরু, আমার যে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করি, এ সকল আমি স্বয়ং করি নাই, কলি করিয়াছে।"

মমরাজ্যং প্রণষ্টং যন্নাহং তৎকৃতবান্স্বয়ম্।
কলিনা তৎকৃতং ভীরু যচ্চত্বামহমত্যজম্॥

নল পুষ্করকে বলিতেছেন,—"আমি যে পূর্ব্বে তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছিলাম, তাহা তোমার শক্তি দ্বারা হয় নাই, কলি সেই কার্য্য করিয়াছিল।"

কর্কোটক নামক নাগেরও ঐ বিশ্বাস।

ন ত্বয়াতৎকৃতংকর্ম্ম যেনাহং বিজিতঃপুরা।
কলিনাতৎকৃতংকর্ম্ম ত্বঞ্চমূঢ় ন বুধ্যসে॥

"হে নল, আপনি যাহার নিমিত্তে প্রবঞ্চিত হইয়া মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন, সে মদীয় বিষ দ্বারা কষ্ট ভোগ পূর্ব্বক আপনার শরীরে বাস করিবে।"

আর দময়ন্তী স্ত্রীলোক, তিনিত বলিবেনই, নলের কোন দোষ নাই,

"ক্ষুদ্রাশয় দ্যূতনিপুণ কুটিল কোন নীচ প্রকৃতি প্রবঞ্চকেরা সেই সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ রাজাকে আহ্বান পূর্ব্বক অক্ষক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য ও সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়াছে।"

অদৃষ্টে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই নল এত কষ্টেও একবারে বিষণ্ণ হয়েন নাই। তাঁহার নিজের দোষে যে এত অনর্থ ঘটিল, নল তাহা বুঝেন নাই। অদৃষ্টে এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে বড়ই প্রবল ছিল। ইহাতে সুফল ও কুফল উভয়ই ফলিত। আমার বিশ্বাস, কোন মত যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক না কেন, তাহা হইতে যে কোন মঙ্গল হইবে না, এমন নহে। সংসারের কোন পদার্থই একবারে সম্পূর্ণ অনিষ্ট-কর নহে। অদৃষ্ট বা দৈবের শক্তির নিকট পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নহে, এই বিশ্বাসে, একদিকে যেমন মানবকে বিপদে চঞ্চল ও অভিভূত করিতে পারে না, অপর দিকে তেমনি তাহাকে স্বকীয় দোষের সংশোধনে অনবহিত করিয়া উন্নতির পথ রোধ করে। সেই জন্য অক্ষ ক্রীড়া যে মহা দোষের, এত নির্য্যাতনেও নল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বৃহদশ্ব মুনিও তাহা বুঝেন নাই। তিনি নলের সমদশাপন্ন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—

"হে নৃপতে পুরুষার্থ কখনই স্থায়ী নহে, এই ভাবিয়া তাহার উৎপত্তি বা বিনাশে আপনার চিন্তা করা উচিত হয় না। আপনি এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। দৈব্য-বৈষম্য-প্রযুক্ত পুরুষকার বিফল হইলে সত্বগুণাশ্রয়ী ব্যক্তিরা আত্মাকে বিষাদিত করেন না।"

নলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কলিই যত অনর্থের মূল, পুষ্করের কোন দোষ ছিলনা। এই ভাবিয়া পুষ্করকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। পুষ্করকে দোষী জানিয়া নল যদি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ ভারতের নিত্য ঘটনা হইয়াছে। প্রায় প্রতি বৎসরই ভারতের কোন না কোন স্থানে স্বল্পাধিক শস্য হানির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শুভ সংবাদ এই যে, মহাপ্রাণ ইংরাজজাতি, জীবন রক্ষার্থে সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন, এবং অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের আয়োজন বিপুল। ইংরাজ বণিক ও ধনীগণও ভারতের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোটী কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দান করিতেছেন। এই দৈব বিড়ম্বিত দেশের সাহায্য বিষয়ে ইংরাজ রাজপুরুষ এবং ধনি সন্তানগণ যে প্রকার মহানুভবতা, পরদুঃখকাতরতা এবং সার্ব্বজনীন প্রেম দেখাইয়াছেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য। যাহাতে দুর্ভিক্ষ ভবিষ্যতে সংহারক-মূর্ত্তিতে প্রকাশ না হয়, তাহার জন্য রাজপুরুষগণ যথোচিত চিন্তিত। নানা প্রকার উপায়ের প্রস্তাবনা ও সমালোচনা হইতেছে। ইউরোপের জাতিমাত্রেরই একটী বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্য তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র অগ্রণী ও বিজয়ী। কোন রূপে বাধাবিঘ্ন বা দুর্ঘটনা তাঁহাদের পথরোধক হইতে পারে না। সকলই নিয়তির নির্ব্বন্ধ বলিয়া তাঁহারা বদ্ধহস্ত থাকিবার লোক নহেন। তাঁহারা কর্ম্মবীর, আর আমরা বাক্যবীর। 'উদ্‌যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' এই তাঁহাদের মূল মন্ত্র, "দৈবেন দেয়ম" এ কথা তাঁহাদের কোষ্ঠীতে স্থান পায় না। তাই আজ ইংরাজ রাজপুরুষগণ দুর্ভিক্ষের মূল অন্বেষণ ও তন্নিবারক উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত আছেন। সম্প্রতি যে শিক্ষা-সংস্কারক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ দমনেচ্ছা সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছে। কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সবিশেষ বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য মতামত সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু যিনি যতই বলুন বা করুন, ভারতের দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র কৃষিজাতই যে দেশের সম্বল, সে দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব কখনই একেবারে নিবারিত হইতে পারে না। অবশ্য কৃষিব্যাঙ্ক ও কৃষিবিষয়ক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দ্বারায় বহু পরিমাণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কৃষি প্রধান দেশে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান বৎসরে রুসিয়ার কৃষকবর্গকে যে দুর্ভিক্ষ নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। দুর্ভিক্ষের শোকাবহ ফল নিবারণের জন্য রুসিয়ার জার (সম্রাট) নানাপ্রকারে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতবর্ষেও যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ হইত না, এখনই কেবল অনাহারীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এরূপ নহে। দুর্ভিক্ষও হইত, লোকক্ষয়ও প্রচুর হইত। তবে বর্ত্তমান সময়ে দুর্ভিক্ষ যেমন নিত্য ঘটনা হইয়াছে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তেমন ছিলনা। এতৎ সম্বন্ধে বাবু পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে আগামী বারে প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন পৃথ্বীশ বাবুর দুর্ভিক্ষ বিষয়ক পুস্তিকা পাঠ করেন। মক্রশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, এম এ।

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

২য় ভাগ]　　　শ্রাবণ, ১৩০৮।　　　[১০ম সংখ্যা।

সরফরাজ খাঁ।

সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালের শেষ সময় হইতেই তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ যখন পারস্যাধিপতি নাদের সাহ বিপুল বিক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে বিচরণ করিতে-ছিলেন, তখনই সুজাউদ্দীন পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎ-পুত্র সফররাজ অবিরোধে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করিয়া, নাদেরের অনুমতি পত্রানুসারে, পিতৃ প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীসভার পরামর্শ ক্রমে গত বর্ষ ত্রয়ের বাকী রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য মধ্যে নাদেরের নামে মুদ্রা প্রস্তুত ও স্তোত্র পাঠের অনুমতি প্রদান করেন। মাতামহের অনুকরণে সরফরাজও বাহিরে ধর্ম্মনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন। কোরাণ পাঠার্থী ও অন্যান্য ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে সরফরাজ বেতন প্রদানে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু তাঁহার বাহ্যাড়ম্বর মাতামহ মুরশিদের অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক ছিল। এমন কি, তিনি সর্ব্বদাই দুই সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত করিতেন।

পুত্র, মাতৃস্নেহের অধিকার লাভে কখনই বঞ্চিত হয় না সত্য, কিন্তু সরফ-রাজ, জননীর নিকট হইতে যে পরিমাণ বাৎসল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সকল পুত্র মাতার নিকট লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সরফরাজের জননী, জিনেত্ অলনিসা, পুত্রকে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করাইতে ভালবাসি-তেন না। এই কারণেই সুজার শাসন সময়ে, সরফরাজ, সর্ব্বদাই মুর্শিদা-বাদে বাস করিয়া স্নেহময়ী জননীর অকৃত্রিম স্নেহসম্ভোগ দ্বারা দীর্ঘকাল

অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ বিহারের শাসনকর্ত্তার পদশূন্য হইলে সুজা, স্বীয় পুত্রকে সেই পদ প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হন, কিন্তু বেগম জিনেত্‌ অলনিসার অগাধ স্নেহবাৎসল্য কোন ক্রমেই পুত্রের স্থানান্তর বাসের সম্মতি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। ঢাকার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াও সরফরাজ মাতৃস্নেহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে প্রতিনিধি দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।

ইতিহাস পাঠে সরফরাজের দুই একটী রাজোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহার অসদ্গুণের তুলনায় সে গুলি অকিঞ্চিৎকর বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সত্য বটে সরফরাজ কিঞ্চিৎ তেজস্বী ও সাহসী বীরপুরুষের ন্যায় অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সত্য বটে—সময়ে সময়ে তিনি "কার্য্যের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্রের অনুসরণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার দেহে যে সকল অসদ্গুণ অবস্থিতি করিত, তাহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর মূল্য অতি অল্প সন্দেহ নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন যে, সরফরাজের প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে এই ছিল যে, তিনি সুরাপান করিতেন না বা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। * তাঁহার স্বল্পকাল ব্যাপী রাজত্বকালের পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, সুজার যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, সরফরাজ তাহাদের অধিকাংশেরই উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় পরায়ণতারূপ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সরফরাজ অন্তঃপুরের আমোদে বিশেষ অনুরক্ত থাকিতেন। কথিত আছে যে, তাঁহার অন্তঃপুরে বহু প্রকারের পঞ্চদশ শত স্ত্রীলোক রক্ষিত হইত। সেই সকল রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া নবাব, রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সুখভোগে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। * ইন্দ্রিয়দোষ বাঙ্গলার নবাবগণের নিজস্ব ও অনুল্লঙ্ঘনীয় হইলেও সরফরাজ এবং

---

* "In short all that could be said in this favour was that he was neither a drunkard nor an oppressor." History of Bengal, by C. Stewart. p. 271.

* "He was also much addicted to the pleasure of *haren*; and his seraglio is said to have consisted of 1500 women of various discriptions; amongst whom he dissipated much of his time and entirely neglected business."

History of Bengal, by C. Stewart, p. 271.

সিরাজদ্দৌলা এই দোষের অধিকারী সূত্রে নবাব সমাজের যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কোন কালে যে সে কলঙ্ক রাশির ক্ষয় হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এই ভয়ঙ্কর দোষের জন্যই উক্ত নবাবদ্বয়ের শাসনকালে বাঙ্গলায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। দেশে যত কিছু বিপ্লব, যত কিছু ষড়যন্ত্র, যত কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায় সমস্তেরই প্রধান কারণ উক্ত নবাবদ্বয়ের কলুষিত চরিত্র। সিরাজের চরিত্র বর্ণন বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অদ্য আমরা সংক্ষেপে সরফরাজ খাঁর প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকবর্গকে প্রদান করিব।

সরফরাজের ঔদ্ধত্যে ও অসচ্চরিত্রায় সুজাউদ্দীনের সযত্ন প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রী-সভার সভ্যমণ্ডলী ও বাঙ্গলার তৎকালীন অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ নবাবের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুজাউদ্দীন মন্ত্রীসভার সভ্যগণের পরামর্শ ব্যতীত কদাচ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরফরাজকেও উক্ত সভার সভ্যমণ্ডলীর মন্ত্রণাক্রমে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দিয়া যান। কিন্তু "চোর না শুনে ধরম কাহিনী"। পিতার মৃত্যুর পরই পুত্র বিপরীত ভাব অবলম্বন করিলেন। কমলা যখন যাহার প্রতি অপ্রসন্না হন, তখনি তাহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং বন্ধু ও গুরুজনের সদুপদেশ তাহার কর্ণে কর্কশ ও বিষবৎ প্রতীয়-মান হয়। সে তৎকালে হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিপদ্ সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে। সরফরাজেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। নবাব ইন্দ্রিয় লালসা ও বিদ্বেষ বুদ্ধির তাড়নায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইয়াছিলেন। পিতার আমল হইতে যাঁহারা রাজদ্বারে বিশেষ সম্মানিত হইয়া আসিতে-ছিলেন, যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব নবাবের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ পরিগণিত হইতেন, সরফরাজ একে একে তাঁহাদের প্রায় অধিকাংশকেই অপমানিত করিতে আরম্ভ করেন। প্রভুশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি পুঞ্জের মাননাশে প্রবৃত্ত হইলে স্বতঃই প্রজাকুল অচিরে সে শক্তির অনিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া থাকে। সে কালের জমীদার ও পদস্থ প্রজাগণের দিল্লীর দরবারে বিশেষ সম্মান, প্রতি পত্তি এবং পদমর্য্যাদা ছিল। দেশের লোকের একতা ছিল; দশে মিলিয়া বাদসাহের নিকট কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিলে সম্রাট সে প্রস্তাব কোন-মতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু সে সময়ে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ নানা কারণে নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং তৎকালে

সরফরাজের অনিষ্ট চিন্তায় প্রজাবর্গের চেষ্টা কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নহে। কি কারণে সরফরাজের প্রতি মুর্শিদাবাদবাসী ব্যক্তিগণ খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন, এইবার আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শেঠদিগের সহিত মনোবিবাদ, এবং হাজি আহাম্মদের প্রতিকুলাচরণই সরফরাজের রাজ্যচ্যুতি, এমন কি মৃত্যুরও প্রধান কারণ। শেঠদিগের সহিত নবাবের মনোবিবাদের কারণ সম্বন্ধে শেঠেরা বলেন যে, মুরশিদ কুলী খাঁ মৃত্যুকালে শেঠদের নিকট ৭ কোটী টাকা জমা রাখিয়া যান। সরফরাজ সেই টাকার জন্যে ফতেচাঁদ জগৎশেঠকে * বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন এবং একদা এই সূত্রে নবাব উক্ত জগৎ শেঠকে অপমান সূচক বাক্যও প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য যে, সেই জন্যই ফতেচাঁদ সরফরাজের অনিষ্ট চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। সরফরাজের প্রতি জগৎশেঠের বিদ্বেষের কারণ সম্বন্ধে হলওয়েল, অর্শ্মে ও ষ্টুয়ার্ট প্রমুখ প্রধান প্রধান ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী † রূপের গৌরবে তৎকালে বাঙ্গলায় বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠেন। প্রস্ফুটিত পুষ্পভারাবনতা লবঙ্গ লতার মনোমোহন সৌগন্ধ যেরূপ সমীরণ সঞ্চালনে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই জগৎ শেঠের পুত্র বধূর অনুপম রূপলাবণ্যের কথাও লোকপরম্পরায় দেশ বিদেশে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। এমন কি, একদা সেই শেঠ রমণীর রূপলাবণ্যের কাহিনী নবাব সরফরাজেরও শ্রুতিগোচরে আইসে। নবাব সেই একাদশ বর্ষীয়া হিন্দু রমণীর অশ্রুতপূর্ব্ব রূপমাধুরীর কথা অবগত হওয়ায় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কেবল মাত্র একবার সেই রূপের ছবিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দর্শন লালসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ফতেচাঁদকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য যে, ফতেচাঁদ এই হৃদয় বিদারক সংবাদ শ্রবণে বিশেষ ব্যথিত হইয়া নবাবকে এরূপ অন্যায় অনুরোধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দেন এবং ইহাতে হিন্দুর জাতিনাশ ও বংশ মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়াও নবাবের নিকট প্রকাশ করেন, কিন্তু দুর্বৃত্ত সরফরাজ কিছুতেই ক্ষান্ত হন নাই। অধিক কি, অবশেষে বলপূর্ব্বক জগৎশেঠের বাটী

* হীরানন্দের অধস্তন ৩য় পুরুষ ও মাণিক চাঁদের পোষ্যপুত্রই প্রথম জগৎ শেঠ হন।

† অর্শ্মে, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতির ইতিহাসে এই রমণী ফতেচাঁদের পুত্রবধূ এবং হলওয়েলের পুস্তকে ফতে'দের কনিষ্ঠ পৌত্রের স্ত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

হইতে সেই লাবণ্যময়ী শেঠ রমণীকে আনয়ন করাইয়া দর্শনান্তে পুনঃ প্রেরণ করেন। অনেকে উক্ত শেঠ রমণীর প্রতি সরফরাজের অসদ্ব্যবহারের ইচ্ছা ও তাহাকে অঙ্কশায়িনী করিবার কথাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। * যাহাই হউক, ইহাতে শেঠদিগের মর্য্যাদার বিশেষ হানি হয় এবং সরফরাজের এই ব্যাপারে বঙ্গভূমি চমকিত হয় ও দুর্বৃত্ত নবাবের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত সকলেই বদ্ধপরিকর হন।

তিন চারিজন বিশ্বস্ত বন্ধুর কুপরামর্শে সরফরাজ হাজি আহাম্মদের প্রতিকূলেও হস্ত প্রসারণ করিতে ক্রটী করেন নাই। হাজি আহাম্মদ এক সময়ে একটী রমণীকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণার্থ স্থিরসংকল্প হইলে সরফরাজ স্বীয় পুত্রের সহিত সেই কামিনীর পরিণয় সম্পন্ন করেন। ইহাতে সরফরাজের প্রতি হাজি আহাম্মদের ক্রোধের সঞ্চার হয়। এইরূপ নানা কারণে সরফরাজের পিতার মিত্রবর্গ (মন্ত্রীসভার সভ্যগণ) সরফরাজের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন। এমন কি, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত অবশেষে বিপক্ষদল সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সময় দিল্লীশ্বর বিশেষ হীনপ্রতাপ হইয়াছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বেই পারস্যরাজ নাদের সাহ ভারতের রুধির পান পূর্ব্বক তাহাকে অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট রাখিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন মাত্র।

তিনি দিল্লীশ্বরকেও অব্যাহত রাখেন নাই, দিল্লী জয় করতঃ ৯ কোটী মুদ্রা, বহুসংখ্যক মণিমুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহু মূল্য অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লীশ্বর দুর্ভাগ্য মহম্মদ সাহকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারত পরিত্যাগ করেন। সুতরাং দিল্লীশ্বরের তৎকালীন দুর্ব্বলতা সহজেই অনুমেয়।

এসময়ে, দেশের দশ জনে মিলিয়া উক্ত বাদসাহের নিকট একটা অন্যায় প্রস্তাব করিলেও যে তিনি সহসা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইবেন,

* "The young woman was sent to the Palace in the evening, and after staying there a short space, returned, unviolated indeed, but dishonoured to her husband, History of Bengal, by C. Stewart. p. 271.

[ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের এ উক্তির অনুকূলে আমরা মত প্রকাশ করিতে পারি না, কারণ কোন মুসলমান গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তির পোষকতা দৃষ্ট হয় না।]

এরূপ আশা কখনই করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, সরফরাজের ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া ও মন্ত্রি-সভার সভ্যগণের উত্তেজনায় মুরশিদাবাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্র যোগে বিহারের বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁকে মুরশিদাবাদের নবাবের মস্‌নদে উপবেশন করাইবার পরামর্শ করিয়া দিল্লী দরবারে উপস্থিত হন। যথাকালে তাঁহাদের আবেদন সম্রাটের শ্রুতিগোচর এবং অচিরে তাঁহাদের প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত হয়। তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে আলিবর্দ্দীর স্বপক্ষে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা তিন প্রদেশের সুবাদারীর সনন্দলাভ করেন। আলিবর্দ্দীও রাজ্যলাভের আশায় সম্রাটকে বার্ষিক নির্দ্ধারিত রাজস্বের অধিক ১ কোটী মুদ্রা ও সরফরাজের সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এ দিকে সরফরাজের বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রই একরূপ স্থির হইয়া গেল, কিন্তু সরফরাজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

এই সময় বাঙ্গলার বহুসংখ্যক সৈন্যকে তাহাদের কার্য্য হইতে অপসৃত করা হয়। পরে সেই অবসর প্রাপ্ত সৈন্যগণ পাটনায় প্রেরিত হইয়া আলিবর্দ্দীর অধীনে নিয়োজিত হয়। অতঃপর শুভদিনে, শুভক্ষণে আলিবর্দ্দী, সরফরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পাটনা পরিত্যাগ কালে আলিবর্দ্দী এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, তিনি ভোজপুরের জনৈক জমীদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। নবাব সরফরাজের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত কপট-সদ্ভাব প্রদর্শনে ক্রটী করেন নাই। পাটনা হইতে কিছু দূরে পৌছিয়াই আলিবর্দ্দী নিজ পক্ষ সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দকে এক স্থানে সমবেত করেন এবং হিন্দু কর্ম্মচারীগণের এক হস্তে তুলসীপত্র অন্য হস্তে গঙ্গাজল পাত্র ও মুসলমান কর্ম্মচারীর তরফে কোরাণ:প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে, "আপনি যাহাকে আপনার শত্রু বলেন, আমরাও তাহাকে আমাদের শত্রু বলিয়া এবং আপনার মিত্রকে নিজের মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিব। আপনার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে, আমরাও তাহার অংশ গ্রহণ করিব। আপনি আমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন, আমরা অদম্য উৎসাহের সহিত তাহাতেই প্রবৃত্ত হইব।" অতঃপর আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ বাঙ্গলার দিকে ধাবিত হইলে আলিবর্দ্দী সরফরাজকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে—

"আপনি আমাদের পরিবারবর্গের প্রতি যথেষ্ট অপমান প্রদর্শন

করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ অপমানের হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অন্যত্র রাখিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, কিন্তু এখনও আমি আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহি।" *

এ দিকে হাজি আহম্মদ, আলিবর্দ্দীর সহিত রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিষয় সম্পাদনের নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিবার ব্যপদেশে মুর্শিদাবাদ হইতে বাহির হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আলিবর্দ্দী সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। আলিবর্দ্দীর প্রশংসনীয় চরিত্রে আমরা প্রধানতঃ দুইটি কলঙ্কের রেখা দর্শন করিতে পাই। প্রথম—প্রভু পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান এবং নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গিরিয়ার সমরাঙ্গনে অবতরণ ও প্রভু পুত্রের জীবননাশের হেতু ; দ্বিতীয়—মনকরার ময়দানে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয়ে ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ-বধ। আলিবর্দ্দী প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার দ্বিতীয় কলঙ্ক উল্লেখ করিব।

অসচ্চরিত্রতার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সরফরাজ ও সিরাজের নাম সমধিক পরিজ্ঞাত, মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী তীরস্থ বিশ্ববিখ্যাত পলাশী প্রান্তরে যেমন আলিবর্দ্দী দৌহিত্র সিরাজের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইয়াছিল ; ভাগীরথী তটবর্ত্তী সুবৃহৎ গিরিয়া প্রান্তরেও সেইরূপ মুর্শিদ কুলীর দৌহিত্র সরফরাজেরও সৌভাগ্য-তপনের সঙ্গে সঙ্গে জীবলীলার অবসান হয়।

আলিবর্দ্দী ও সরফরাজের সৈন্য, মুর্শিদাবাদের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে প্রসন্ন সলিলা ভাগীরথীর তীরে এক প্রশস্ত ময়দানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। এই সুবিস্তৃত ময়দানে গিরিয়া নামক একটী পল্লী আছে, তদনুসারে এই সমগ্র ময়দানটীও গিরিয়া নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণ গিরিয়া জঙ্গীপুর সবডিভিসন হইতে অধিক দূরে নহে। এই গিরিয়ার নাম স্মরণ হইলেই এখনও সেই দুর্ভাগ্য সরফরাজকে মনে হয়, কারণ এই গিরিয়াই সেই হতভাগ্য নবাবের স্মৃতিচিহ্ন ও বধ্যভূমি। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ গিরিয়া প্রান্তরেই মুরশিদ কুলীর বংশের সহিত মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের সকল সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য নিঃশেষিত হয়। এই গিরিয়া যুদ্ধে † আলিবর্দ্দী চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা কিছুতেই লয় হইবার নহে। দেশের হিত

* Stewert's History of Bengal, P. 273-74.

† এই গিরিয়া প্রান্তরেই ১৭৬৩ খৃঃ মীর কাশিমের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাঠক যথাস্থানে তাহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

ও দেশের মঙ্গল সাধনের মূলে যদি আলিবর্দ্দীর বাসনা না থাকিত,তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ ক্ষেত্রেও আলিবর্দ্দী চরিত্রের প্রশংসাই করিতাম। সত্য বটে, সরফরাজ অসচ্চরিত্র ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার অসদ্ব্যবহারে দেশের অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই বলিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ নবাব,—যাঁহার পিতার অন্নে আলিবর্দ্দী চিরজীবন প্রতিপালিত, সেই প্রভু পুত্র নবাব সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহার বিরুদ্ধে সামান্য কারণে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া অস্ত্রধারণ, আলিবর্দ্দীর ন্যায় ইতিহাস বিখ্যাত ধর্ম্মভীরু নবাব চরিত্রে চিরদিনই কলঙ্ক ঘোষণা করিতে থাকিবে, যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে গিরিয়া প্রান্তর রণবাদ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি মাংসলোলুপ জন্তুগণ ভবিষ্যতের আশায় মনে মনে মহানন্দ পোষণ করিতে লাগিল। হস্তীর বৃংহিত,তুরঙ্গমের হ্রেষারবে অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ সরফরাজের প্রধান সেনাপতি গাওস খাঁ আলিবর্দ্দীর সৈন্যের বিরুদ্ধে ভাগীরথী পার হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হইলে একবার সন্ধির কথাবার্ত্তা হয়। আলিবর্দ্দী সরফরাজকে বলেন, যদি আপনি আপনার মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে আমি আপনার আজ্ঞাধীন থাকিতে পারি। সরফরাজ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহার নবীন বন্ধুবর্গ কিছুতেই তাঁহাকে উক্ত সন্ধির সর্ত্তে বাধ্য হইতে দিলেন না, সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষই যুদ্ধার্থ পুনরায় প্রস্তুত হইল। আলিবর্দ্দীর সেনাপতি নন্দলালের সহিত গাওস খাঁর যুদ্ধারম্ভ হইলে আলিবর্দ্দী স্বয়ং দুই দল সৈন্য লইয়া সরফরাজের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজও স্বয়ং এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বীরের ন্যায় কিছুক্ষণ সমরাঙ্গনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিপন্ন হন। তাঁহার হস্তীচালক প্রভুকে বিপন্ন দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগে উদ্যত হয়, কিন্তু রণে মত্ত প্রভুর তিরস্কারে সে হস্তীপৃষ্ঠে প্রভুকে লইয়া সমর ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়। সরফরাজ মহাবীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার অদম্য সমরপিপাসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনবায়ুর অবসান কাল ক্রমশঃই অপ্রশস্ত হইয়া আসিতে আরম্ভ হইল। জগৎ শেঠের কুলবধূর অব্যর্থ অভিসম্পাতের ফলে ও অশীতিপর স্থবির জগৎ-

শেঠের দুঃখাশ্রুপাতে সরফরাজের রাজ্যলক্ষ্মী বিচলিতা হইয়াছিলেন, সুতরাং জগদীশ্বর শীঘ্রই যেন তাঁহার পাপের প্রতিফল প্রদানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অনতিবিলম্বেই আচম্বিতে একটী বন্দুকের গুলি সরফরাজের মস্তকে পতিত হইল! নবাব তৎক্ষণাৎ সেই হস্তিপৃষ্ঠেই মৃত্যুর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। হস্তিপালক সরফরাজের শবদেহ লইয়া রাজধানীতে গমন করিল। গোরাস খাঁর অধীনস্থ আফগান সৈন্য ব্যতীত সকলেই চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ১৭৪১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সরফরাজের মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবস প্রাতে (১৫ই সাকার ১১৫৩) আলিবর্দ্দীও নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি রাজপ্রাসাদে গমন না করিয়া প্রথমতঃ সরফরাজের মাতা জিনেত্ অলনিসার বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বেগমের বাসভবনের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণানন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক জনৈক খোজাকে উক্ত বেগম সকাশে প্রেরণ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন—

"ভাগ্যে যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাই সংঘটিত হইল। আপনার অবজ্ঞাত ভৃত্যের অকৃতজ্ঞতার কাহিনী ইতিহাসে অক্ষয় ভাবে চিরদিন লিখিত থাকিবে, কিন্তু আপনার অধম ভৃত্য শপথ করিয়া বলিতেছে যে, যতদিন তাহার জীবন থাকিবে, ততদিন সে কোন প্রকারে আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবে না।

আপনার ভৃত্য এ আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতেছে যে, আপনি স্বীয় ক্ষমাগুণে কালক্রমে অধীনের কুকার্য্য বিস্মৃত হইবেন। অধীনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রমাণ স্বরূপ এ দাসের সম্পূর্ণ অধীনতা, চিরবাধ্যতা, ও প্রগাঢ় ভক্তি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" (Stewart)

এদিকে হস্তিপালক সরফরাজের মৃত দেহ লইয়া রাজধানীতে পৌছিলে সরফরাজের পুত্র মীর্জ্জা আমানি নাক্তাখালি নামক স্থানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পিতার সেই মৃত দেহ সমাধিস্থ করেন। *

---

* At midnight his (Sarfarez's) son Mirza Amany caused it to bee buried in a private manner at Nuktakhaly.

নাক্তাখালি নসীপুরের সন্নিকট, সাহানগরের থানার পূর্ব্বাংশে, আপাততঃ জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। এখানে কতকগুলি সমাধি রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী যে সরফরাজের সমাধি, তাহা এক্ষণ নির্ণয়ের উপায় নাই।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান শাসনকর্ত্তা (নবাব) গণের সমাধিগুলি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন রাজধানীর অনেক প্রাচীন কথা মনে আনিয়া দেয় ও বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের শ্মশানত্ব প্রতিপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে।

কাঠরার ধ্বংসমুখে পতিত মসজিদের সোপানাবলীর নিম্নদেশে মুর্শিদাবাদ স্থাপয়িতা চির নিদ্রায় অভিভূত, তদীয় জামাতা অশেষ গুণালঙ্কৃত মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ ডাহাপাড়া গ্রামের রোশনীবাগ নামক রমণীয় উদ্যানে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন। লালবাগের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম কুলে খোসবাগ নামক স্থানে বঙ্গের আদর্শ নবাব সুপ্রসিদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজের সহিত চিরশায়িত রহিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগ্য সরফরাজের সমাধির এক্ষণ অনুসন্ধান করা বড়ই কঠিন।

ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ মাস কাল রাজত্ব করিয়া সরফরাজ সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে মুর্শিদাবাদের কোন নবাবই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন নাই।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রধান প্রধান দুর্ভিক্ষের তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ	শাসনকর্ত্তা
১৭৬৯-৭০	গঙ্গা নদীর নিম্ন উপত্যকা	কার্টিয়ার
১৭৮৩ ৮৪	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	ওয়ারেণ হেস্‌টিংস্‌
১৭৯০-৯২	মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিয়দাংশ	লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌

যাঁহার অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা প্রভাবে মুর্শিদাবাদের বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, অল্পদিন হইল, আমাদের মুর্শিদাবাদের সেই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় বি এ, মহোদয় সরফরাজ বংশীয়দের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের ৩য় নবাব হতভাগ্য সরফরাজের সমাধির কতকটা অনুসন্ধান পাইয়াছেন শুনিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম।

খৃষ্টাব্দ	দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশ	শাসনকর্ত্তা
১৮২৩-২৫	মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কতকাংশ	লর্ড আমহার্ষ্ট্
১৮৩২-৩৩	মান্দ্রাজ, বোম্বাই, হায়দারাবাদ	লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্
১৮৩৭-১৮৩৮	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ রাজ পুতানা	লর্ড অক্ল্যাণ্ড্
১৮৬০-৬১	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব	লর্ড ক্যানিং
১৮৬৫-৬৬	উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর বঙ্গ, মান্দ্রাজ, মহীশূর, হায়দারাবাদ, বোম্বাই	সার্ জন্ লরেন্স্
১৮৬৮-৬৯	রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, পঞ্জাব	লর্ড লরেন্স্
১৮৭৩-৭৪	বিহার, বাঙ্গালা, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	লর্ড নর্থব্রুক্
১৮৭৬-৭৮	দাক্ষিণাত্য, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা পঞ্জাব	লর্ড লিটন্
১৮৯৬-৯৭	পশ্চিম ভারতবর্ষ, মধ্য প্রদেশ,	লর্ড এল্গিন্
১৮৯৯-১৯০০	পশ্চিম ভারতবর্ষ, রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কতকাংশ	লর্ড কর্জ্জন্

এতদ্ব্যতিরিক্ত স্বল্পস্থানব্যাপী দুর্ভিক্ষ অনেকগুলি ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদের উপায় ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে। যাহাতে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন আক্রমণ অথবা প্রচণ্ডতা কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়, তাহাও সাদরে গ্রহণ করা উচিত, এবং তদ্বিষয়ক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। কৃষিশিক্ষা বিস্তার ও কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাবনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সকলেরই সবিশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছেন। কৃষি ও কৃষক উভয়েরই উপর রাজার সস্নেহ দৃষ্টি সূচিত হইতেছে। আমাদেরও এ বিষয়ে কিছু কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে।

গবর্ণমেণ্টের সাধু সঙ্কল্পে আহ্লাদিত হইয়া কেবল মাত্র জয়ধ্বনি করিলে চলিবে না। ডাক্তার ঔষধ নির্দ্দেশ করিলেই ব্যাধি দূরীভূত হয় না; রোগীরও যথা সময়ে এবং যথা মাত্রায় ঔষধ সেবন করা চাই। রাজা আমাদের উপকার করিতে প্রস্তুত, আমাদেরও উপকৃত হইবার জন্য সমধিক প্রস্তুত

হইতে হইবে। কঠিন প্রস্তরময় স্থানে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয় না, কিন্তু সুকর্ষিত ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফলদায়ক হয়। আমরা যদি রাজার সাধু উদ্দেশ্যের জন্য সম্যক্ রূপে প্রস্তুত না হই, তবে সমস্তই পণ্ড হইবে। এবং নিরাশার নিবিড় তিমির নিবিড়তর হইবে। রাজার সহকারী হইলেই নিশ্চিত সুফল লাভ করিব, অন্যথা অদ্য যে হাহাকার, কল্যও সেই হাহাকার! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শত বৎসর পূর্ব্বে কি দুর্ভিক্ষের কারণ সজীব অবস্থায় ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়েই সহসা তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছে? অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সম্ভব কি তখন ছিল না? কোন নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ফলে অনতিব্যবহিত ঋতুবিকার বর্ত্তমান কালে উপর্য্যুপরি সংঘটিত হইতেছে কি? বিজ্ঞানবিৎ উত্তর দেন যে, এত অল্প সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। সে কালেও অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ছিল, এখনও অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে তৎকালে দুর্ভিক্ষ পরম্পরা সুদূর-ব্যবস্থিত ছিল, এখনই বা তাদৃশ হয় না কেন? ইহার কারণ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন। কিন্তু এই কারণ নির্দ্দেশ অযথা সংক্ষিপ্ত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক।

মোগল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক বাণিজ্যের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি। একেবারেই ছিল না। যে শস্য হইত, তাহা সমস্তই দেশের ব্যয়ে নিয়োজিত হইত, এবং অতিরিক্ত দেশেই সঞ্চিত হইত। অগত্যা কোন সময়েই শস্যের মূল্য অত্যধিক হইত না। সাধারণ লোকেরা যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য শস্যের বিনিময়ে ক্রয় করিত। বস্ত্রের জন্য নগদ পয়সা ব্যয় করিতে হইত না। জমিতে যে কার্পাস জন্মিত, তাহা হইতে স্ত্রীলোকেরা অবকাশমত সূতা প্রস্তুত করিত, এবং ঐ সূতা হইতে তন্তুবায় দ্বারা ধান্যের বিনিময়ে বস্ত্রবয়ন করান হইত। অবশ্য সে বস্ত্র এখনকার মত চাকৃচিক্যশালী হইত না, কিন্তু অধিককালস্থায়ী হইত।

চাকর নিযুক্ত করিতে হইলে তাহার জন্য ধান্য বা জমির বন্দোবস্ত করা হইত। যে প্রকারেই হউক, ধান্যের ব্যয় ও হস্তান্তর দেশের মধ্যেই হইত। এক ছটাকও বিদেশে যাইত না। কয়েক মাস গত হইল, ষ্টেট্স্‌ম্যান সংবাদ পত্রে দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ধান্য সঞ্চয় সম্বন্ধে কতকগুলি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদকের মত এই যে, ধান্য সঞ্চয়ে প্রজা সাধা-

রণকে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরাজ সম্পাদকেরা আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন। অবাধ বাণিজ্যের স্রোতে ধান্য সঞ্চয় কখনই সম্ভবপর নহে। যে দেশ হইতে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময়েও বিদেশে প্রায় সমভাবে শস্যের রপ্তানি হইতে থাকে, সে দেশে কখনই ধান্য সঞ্চয় হইতে পারে না। যাহারা সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারা নিজের আবশ্যক মত সঞ্চয় করে। যাহারা শ্রমজীবী, দরিদ্র, এবং স্বল্পমাত্র জমি অধিকার করিয়াছে, তাহারা সঞ্চয়ের উপযুক্ত শস্য একত্র করিতে কোন কালেই পারে না। দুর্ভিক্ষ কাহাদের ? যাহারা সঞ্চয়ক্ষম, দুর্ভিক্ষ তাহাদের কেশ-স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা দরিদ্র,এবং সঞ্চয়ে অক্ষম, তাহারাই দুর্বৎসরে নিষ্পিষ্ট হয়। সামান্য অর্থনীতির মত অনুন্ধান করিলেই প্রস্তাবিত বিষয়ের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সহজেই জ্ঞানবান্ হওয়া যায়। আমার প্রচুর শস্য আছে, আমি কেন অতিরিক্ত সঞ্চয় করিব ? যখন কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন লক্ষাধিক মণ শস্য বিদেশের জন্য ক্রীত হইতেছে, তখন সময় বুঝিয়া অতিরিক্ত শস্য উচ্চ দরে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ অন্য কোন ব্যবসায় নিয়োজিত করিয়া ক্রমাগত লাভবান্ হওয়া শ্রেয়ঃ, না কীট পতঙ্গ ও অগ্নি দ্বারা শস্যহানির সম্ভাবনা স্কন্ধে করিয়া নিরর্থক সঞ্চয় করিয়া রাখা শ্রেয়ঃ ? এরূপে সঞ্চয় করিলে, পরিশেষে ঘটিবে এই যে, দেশে বহুল শস্য সঞ্চয় হেতু দুর্বৎসরেও আশানুরূপ মূল্য পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ইহা এক্ষণে সুস্পষ্ট যে, যাহারা দুর্ভিক্ষের করায়ত্ত, তাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা নাই, এবং যাহারা দুর্ভিক্ষের বহির্ভূত, তাহাদের অতি-সঞ্চয়ে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ইহাতে কি সঞ্চয় হইতে পারে ?

এই ত গেল শস্য সঞ্চয়ের কথা। অবাধ বাণিজ্যের অনুগ্রহে আরও যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে সকল সম্যকরূপে বিবৃত করা অসাধ্য। বিদেশীয় কল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় আমাদের দেশীয় শিল্প একেবারে বিধ্বস্ত। ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রভাবে দেশী তন্তুবায় 'হা হতোস্মি' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, কত কোটি টাকার ব্যবসা ম্যাঞ্চেষ্টার গ্রাস করিয়াছে। এ দেশ হইতে পাট যাইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমরা কেবল পাটগাছ পচাইয়া জলবায়ু দূষিত করিতেছি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ দেশব্যাপী ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছি। এবং এই প্রকারে যৎসামান্য অর্থের জন্য যকৃৎ

প্লীহার দোষে শরীরকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু তাহাকে পরিপাটি করিয়া সূত্র প্রস্তুত করি, এ ক্ষমতা নাই। এমন কি রেড়ির বীজ এ দেশ হইতে চালান হয়, এবং বিলাত হইতে পরিস্কৃত তৈল আমাদের দেশে আমদানী হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার হরীতকী প্রভৃতি অতি সামান্য জিনিষ এ দেশ হইতে রপ্তানী হয়, এবং তাহা হইতে টিংচার, রঙ্ প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ বিলাতে প্রস্তুত হয়, আমরা কিন্তু সে সকল এ দেশে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারি না। আমাদের অক্ষমতা সকল দিকেই পরিলক্ষিত হয়!!! ছুরি, কাঁচি, কল্‌কব্জা, গ্ল্যাস, টিন্ ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য বিদেশ হইতে আসিতেছে। আমাদের এখনও কিন্তু একটী প্রধান বিষয়ে যথেষ্ট সাহস আছে। এখন পর্য্যন্ত এ দেশ হইতে ধান্য রপ্তানী হইয়া ইংলণ্ড কি জর্ম্মণি হইতে চাউল প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আসিতেছে না, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়!! পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা অনায়াসে বিনা অর্থব্যয়ে পাওয়া যাইত, সে সমস্তই আজকাল ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়াছে। সুতরাং অর্থের আবশ্যক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থ ভিন্ন সামান্য অভাবও পরিপূরণ করিবার উপায় নাই। অর্থাগমের উপায়ও সঙ্কীর্ণ। অনেকে বলিতে পারেন যে, যে সময় সূতা কাটিতে, কাপড় প্রস্তুত করিতে, এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় হইত, সেই সময় এক্ষণে অপর কোন অর্থকর বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নাই।

এ স্থলে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যথেষ্ট সংখ্যার ধনাগমের পথ আছে কি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এ দেশ হইতে ধান্য রপ্তানী হইয়া বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী হয় না, এইমাত্র আমাদের অহঙ্কারের কারণ আছে। যদি সকল পথই কণ্টকাকীর্ণ হয়, তবে কোন্ পথই বা অবলম্বন করা যায়। সূতা ও কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব নহে, ছুরী, কাঁচি, কাচ প্রভৃতি আমাদিগকে বিদেশ হইতে আনিতে হয়। তবে কি কেবল কতকগুলি শস্য উৎপাদন করিয়া বিদেশে পাঠাইলেই ধনবান্ হওয়া যায়? কেবল মুটে মজুরের কার্য্যে আর কত অর্থ আছে? নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আনীত হইলে, ধনক্ষয়ের পথ যে বিস্তৃত হইবে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যখন ধনাগমের পথ অপ্রশস্ত, অথচ সকল জিনিষই ক্রয় করিতে হইবে, তখন সে অভাব বোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে,

এবং জীবন-সংগ্রাম অধিকতর কষ্টকর হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি আছে? ক্ষুদ্র জাপান জাতীয় জীবনের গূঢ় তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইয়াছে। তাই আজ জাপানের সর্ব্বস্থানই সজীব। জাপানের চেষ্টা এই যে, আবশ্যকীয় দ্রব্য মাত্রেই জাপানে প্রস্তুত করিতে হইবে। বিদেশ হইতে যত অল্প জিনিষ আনীত হয় ততই মঙ্গল। জাপান স্বাবলম্বন মন্ত্রে দীক্ষিত,এবং জাপানের যুবকগণও নবীন উৎসাহে উৎসাহিত। বৎসর বৎসর অনেক ধীমান যুবক রাজকোষ হইতে সাহায্য পাইয়া শিল্প শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতেছেন। ধনিসন্তানগণ নিজ ব্যয়ে দলে দলে জর্ম্মাণি ও আমেরিকা প্রভৃতি বিশ্বকর্ম্মার দেশে যাইয়া নানাবিধ কার্য্যে সুশিক্ষা লাভ করিতেছেন। আমাদের যে ব্যক্তির বৎসরে ৩৬৫৲ টাকা আয় আছে, তাঁহার শ্যালক পুত্রও ঘোর বাবু ও গর্ব্বিত হন, এবং তাঁহার পরিচয়ে সকলেরই মুখে একই কথা—ত্রিশ দিনে ত্রিশ টাকা!!! যাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্যরূপ সংস্থান আছে, তাহার বাড়ীতে সকলেই স্ফীতোদর, শীতাতপাসহিষ্ণু, প্রবাস-ভীরু, আলস্য পরায়ণ ও অকর্ম্মণ্য। পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি ঘরে বসিয়া মাথায় মাথায় ঠুকিতে থাকে, এবং পরস্পর গণ্ডগোলে অগ্নি উৎপাদন করিয়াও পরিশেষে মারামারি ও কাটাকাটি করিয়া সোণার সংসারকে শ্মশানে পরিণত করে। এই প্রকারে কত সম্ভ্রান্ত পরিবার যে পথের ভিখারী হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভ্রাতৃদ্রোহ ভারতের একটী প্রধান রিপু। জাপানে কেহই অপরের অনিষ্ট চেষ্টা করে না। সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে ব্যস্ত। অনলস কর্ম্মপ্রাণ জাপান যুবক মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে আগ্রহান্বিত। আমরা সৎকর্ম্মে নিশ্চেষ্ট, এবং পরস্পরের অনিষ্ট চিন্তায় আসক্ত। ইংরাজীতে একটী সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে—সয়তান অলস ব্যক্তির জন্য সর্ব্বক্ষণ একটা না একটা দুষ্কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে, আর গবর্ণমেণ্ট চিরকালই আমাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায়। পরের দয়ার উপর জোর জবরদস্তি নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি পুনঃ পুনঃ বিরাট সাহায্য না করেন, তবে আমাদের আর কি উপায়ে নিস্তার আছে? ভিক্ষা দেওয়া না দেওয়া যখন গৃহস্থের ইচ্ছাধীন, তখন ভিক্ষা না পাইলে অনুতাপ করা নিরর্থক। যাহাতে ভিক্ষা না করিতে হয়, তাহারই উপায় করা উচিত। কিন্তু এই উপায় চিন্তার

ভাণ করিয়া কেবল মাত্র গবর্ণমেণ্টকে সকল দিকে গালি দিলে কোনই সদুপায় হইবে না। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সময়ে অসময়ে, কারণ সত্ত্বে ও নিষ্কারণে গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়া শান্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। হোম চার্জ্জ—কখন কেহ কাগজ কলমের দ্বারা নিবারণ করিতে পারিবে না। রাজকীয় উচ্চকর্ম্মে ইংরাজ মণীষিগণ গবর্ণমেণ্টের মেরুদণ্ড স্বরূপ অবশ্যই নিযুক্ত থাকিবেন। সুলভ পূণ্যের বিজয় পতাকা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে উড্ডীন থাকিবে। কেবল মাত্র আক্ষেপ উক্তিতে এবং লেখনী পরিচালনে অভাব মোচন হইবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষত্ব দেখাইতে হইবে। শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্যের বিস্তার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সকল সময়ে স্মরণ রাখা উচিত, যে কেবল কৃষির উন্নতি হইলেই, দুঃখের অবসান হইবে না। কৃষি যাহাদের প্রধান উপজীবিকা, কোন কালে তাহারা সম্পূর্ণরূপে দুর্ভিক্ষের আয়ত্ত্বের বহির্ভূত হইতে পারিবে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, দেশে যদি কৃষির উন্নতি দ্বারা প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা যায়, তবে দুর্ভিক্ষ কিরূপে হইতে পারে? ইহা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, যে যখন যখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তখন দেশ পালনোপযোগী শস্যও দেশে ছিল, দুর্ভিক্ষের কালে কেবল শস্যের মুল্যেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এবং অর্থাভাবে নিম্ন শ্রেণীর লোকে শস্য ক্রয় করিতে পারে না। যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল, সে কখনও দুর্ভিক্ষে প্রাণবিসর্জ্জন করে না।

আজ কাল যেরূপ রেলপথের বিস্তার হইয়াছে, তাহাতে একস্থানের শস্যাভাব অপর স্থানের উপচয় দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিরাকৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যে দুর্ভিক্ষ হইত তাহাতে স্থানীয় শস্যাভাব সম্ভবপর ছিল এবং প্রায়ই ঘটিত। এক্ষণে সেরূপ শস্যাভাব স্থায়ী হইতে পারেনা, কেবল শস্য দুর্মূল্য হয়। দুর্ভিক্ষ আর সুভিক্ষ, যে দেশ হইতে সকল সময়ে চাউল, গম, বুট প্রভৃতি অজস্র রপ্তানি হইয়া থাকে, সে দেশে দুর্ব্বৎসরে শস্যের মহার্ঘতা একটী নিশ্চিত বিষয়। যদি বলি যে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে রপ্তানি স্থগিত করা কর্ত্তব্য, অমনি চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইবে "অবাধ বাণিজ্য!!। অবাধ বাণিজ্য!!!" সুতরাং দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় ভিন্ন আর নিস্তার কিসে? শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতিরেকে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পন্থা কি আছে! যতই দেশে অর্থের অভাব হইবে, ততই

দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবও নিরবচ্ছিন্ন ঘটিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, "আমরা যথেষ্ট করিয়াছি এবং করিতেছি—দেশে শান্তি আনিয়াছি—যাহাতে আপামর সাধারণ সুশিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং আমাদের অধ্যবসায় তোমাদের সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিয়া রাখিয়াছি। তোমরা চেষ্টা কর সুফল পাইবে, স্বাবলম্বন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও,'দেহি দেহি' শব্দ ত্যাগ কর, ভিক্ষা বৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখ"। আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি ও আলস্যে সমস্ত বিনষ্ট হইতেছে, এবং সোণার ভারতে আমরা সোণা ছাড়িয়া কেবল মাটীর বোঝা বহিয়া মরিতেছি। কত শত দিকে কত শত প্রকার অর্থাগমের উপায় আছে, তাহা দেখিয়াও দেখি না। এস্থলে একটী সুন্দর গল্প মনে পড়ে। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণরাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিরস্কার করিতেছে, এমন সময়ে হরপার্ব্বতী এক গ্রামের মধ্যে দিয়া যাইতেছেন। অদূরে এক ভিক্ষুক দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলেন। ভিক্ষুক সবল ও প্রৌঢ়বয়স্ক, হস্তে ভিক্ষা-পাত্র, এবং তাহাতে মুষ্টিমেয় চাউল আছে। ভিক্ষুককে দেখিয়া পার্ব্বতী হরকে বলিলেন, "হে দেবাদিদেব! তোমার দয়া বিচিত্র! কেহ বা অট্টালিকায় শয়নে, এবং অসংখ্য বিলাস সম্ভোগে আপ্যায়িত, কেহ বা এই প্রখর রৌদ্রে এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত। কেহ বা সুখে বিভোর, কেহ বা দুঃখে ভর্জ্জিত। কেন এরূপ অসম ব্যবহার?" মহাদেব উত্তর করিলেন—"দেবি, আমার দয়া সর্ব্বত্রই সমান। ভোগ-সুখের উপায় সকলের সমক্ষেই বিস্তৃত রহিয়াছে। কেহ বা চেষ্টা ও কর্ম্ম দ্বারা সুখলাভ করে, আর অলস মন্দধীগণ অবহেলা করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের দক্ষিণ হস্তের উপান্তে রত্নভাণ্ডার থাকিলেও তাহারা ঐ রত্ন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না।" এই বলিয়া, মহাদেব পথিমধ্যে সহস্র মুদ্রাপূর্ণ এক ভাণ্ড রাখিলেন। ভিক্ষুক দূর হইতে দেখিল যে, অপূর্ব্ব কান্তি দুই জন স্ত্রী পুরুষ বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। সে তখন ভাবিল যে, ইঁহারা নিশ্চয়ই বিপুল ধনের অধীশ্বর, সুতরাং অন্ধ হইয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে করিতে চলিলে, ইঁহাদের আর দয়ার সীমা থাকিবে না। আজ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া জীবনের সঞ্চয় করিয়া লইব, এই সঙ্কল্প করিয়া ভিক্ষুক দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধতার ভাণ করিল, এবং চীৎকার করিতে করিতে হরপার্ব্বতীর

সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তখন হরপার্ব্বতী রত্নভাণ্ডার প্রত্যাহার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ।

জয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জয়পাল দিল্লী হইতে নির্ব্বিঘ্নে যশল্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিরূপে আলাউদ্দীনের জীবন বিনাশের জন্য অলক্ষ্যে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং আলউদ্দিনও শরাঘাতে আহত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিলেন; তৎসমুদায় বিবৃত করিলেন। খিলিজী সম্রাটের মৃত্যু হইলেই যে রতনসিংহের মুক্তি হইবে, এ বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে সোৎসুকনেত্রে তাঁহারা চিতোররাজের অবরোধ মোচন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে রতন সিংহের নিকট হইতে পত্র আসিল, রাজপুতরাজ জয়াকে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দিল্লীগমন করিতে আদেশ করিয়াছেন। প্রেমিক যুগলের হৃদয়াকাশে যে ক্ষীণ আশালোকের সঞ্চার হইয়াছিল, সহসা তাহা ঘোর বিষাদ তমসে আচ্ছন্ন হইল। এই আকস্মিক দুঃসংবাদে সকলেই চিন্তান্বিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। জয়ার আত্মীয়গণ কুলে কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া জয়াকে দেবালয়ে আত্মবলি দিয়া বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়াও জয়া প্রশান্ত বদনে কহিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, যখন দেখিব আর কোন উপায় নাই, তখন নিশ্চয়ই আমি এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি পবিত্র রাজপুতকুলে কলঙ্করেখা স্পর্শ করিতে দিব না। কিন্তু এখনও বিপদ দূরে—এখনও আমার প্রিয়তম জয়পাল নিকটে থাকিয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কেন এ জীবন পরিত্যাগ করিব?"

তখন সকলে একমত হইয়া শীঘ্র জয়পালের সহিত জয়ার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন এবং তজ্জন্য আয়োজনও হইতে লাগিল। পরে বিবাহের দিন চতুর্দ্দিক্‌ হইতে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন। জয়ার

মাতুল কন্যা সমর্পণ করিলেন এবং রীতিমত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। এই ঘোর বিষাদেও দম্পতিযুগলের বদনমণ্ডল আনন্দশ্রী ধারণ করিল।

বিবাহের পরদিবস জয়া বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য একটি প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া পার্শ্বস্থ গৃহে দুই জন ব্যক্তির অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন এবং এই কথোপকথনের মধ্যে স্বীয় নাম ও জয়পালের বিষয় শ্রবণ করিয়া উৎসুক হইয়া কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শুনিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মাতুল ও মাতুলানী তাঁহাদেরই সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন। জয়ার মাতুল তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"জয়া কোথায়?"

তাঁহার পত্নী উত্তর করিলেন, "তাহারা অন্য দিকের বারাণ্ডায় আছে।"

"নিশ্চয় বলিতেছ?"

"হাঁ নিশ্চয়ই। আমি এই মুহূর্ত্তে দেখিয়া আসিলাম, নব দম্পতী কথোপকথনে অতিশয় মত্ত। সম্ভবতঃ তাহারা এখন সেই স্থানেই থাকিবে।"

"এ বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

"এ বিবাহের লক্ষণ শুভ নহে। যতদিন জয়া জীবিত থাকিবে, ততদিন দিল্লীর সম্রাট তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে, সুতরাং আমাদের কুলে কলঙ্কসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী।"

"তবে দুই জনেরই বিনাশ সাধন করা কর্ত্তব্য। কেন না, জয়পাল জীবিত থাকিলে অবশ্যই ইহার জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে।"

"জয়পাল প্রকৃত রাজপুত—মরণে তাহার ভয় নাই—মৃত্যু তাহার ক্রীড়ার সামগ্রী।"

"কিন্তু উহাদের বিনাশ সাধনের উপায় কি?"

"উপায় আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, কল্য আহারের সময় আমি তাহাদের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিব এবং সন্দেহ নিরাকরণের জন্য সেইরূপ খাদ্য তোমার জন্যও স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র তাহাতে বিষ থাকিবে না। তাহারা এক্ষণে আনন্দে উন্মত্ত, সুতরাং এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া সেই বিষ মিশ্রিত খাদ্য আহার করিবে এবং আমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া করিয়া ক্রোধ, ভয় এবং ঘৃণায় জয়ার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় গৃহস্থিত একটী তক্তপোষের নীচে লুকায়িত হইলেন এবং

তাহার উপর এরূপ ভাবে একখানি কাপড় ফেলিয়া দিলেন যে, কেহ তাহার ভিতর লুকাইয়া আছে, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায় না। পরক্ষণেই জয়ার কক্ষের দ্বারে পদধ্বনি শ্রুত হইল, এবং জয়ার মাতুল কক্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ষড়যন্ত্র নিরাপদ ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে জয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া জয়পালের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণনা করিলেন। ক্রোধে জয়পালের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু জয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—'জয়পাল! এ ক্রোধের সময় নহে, আমাদিগকে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে, তোমার ও মাতুলের খাদ্য একপ্রকার হইবে, সুতরাং কৌশলক্রমে সেই খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া মাতুল মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, এবং তাঁহার পত্নীকে তাঁহার অনুমৃতা হইতে হইবে, সুতরাং অনায়াসেই আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে।"

জয়পাল এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দাবানল পরিপূরিত প্রশান্ত সাগরের ন্যায় বাহ্যাকৃতিতে হৃদয়ভাব গোপন করিয়া জয়ার আত্মীয় ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সহাস্য মুখে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রথমে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের সম্মান জন্য ঐকতান বাদ্য আরম্ভ হইল। পরে সুন্দরী ষোড়শী নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। পরিশেষে যাদুকরেরা আসিয়া নানাবিধ ভোজবিদ্যা দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করিল। প্রথমে তাহারা একটি লোককে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উপর একখানি চাদর দিয়া মাটীতে রাখিয়া দিল ও কিছুক্ষণ পরে চাদরখানি অপসারিত হইলে সেই লোকটি সুস্থ শরীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হইল, যেন তাহার শরীরে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই। তদনন্তর দুইটি পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেকটিতে এক একটি লোক প্রবেশ করিল এবং সমাগত জনগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আপনারা যে জন্তু দেখিতে চাহিবেন, আমরা তাহাই দেখাইব।" তৎপরে দর্শকগণ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, সেই সেই জন্তু দেখাইতে আদেশ করিলেন, ঐন্দ্রজালিকেরা একে একে তাহাই দেখাইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা

নানা প্রকার কৌতুক প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে জয়ার মাতুল সকলকে আহারের জন্য আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিতগণ সকলে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। এই গোলমালে জয়পাল খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন এবং সন্দেহ দূর করণের জন্য অতীব আগ্রহের সহিত আহার করিতে লাগিলেন। জয়ার মাতুলও অসন্দিগ্ধ চিত্তে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল জয়া খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতুলপত্নী তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "জয়া এই প্রকারে কি তুমি নিমন্ত্রিতগণের অভ্যর্থনা করিবে? তুমি আহার না করিলে সকলেই ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত বিবেচনা করিবেন।"

জয়া। "এই খাদ্য দ্রব্যে কেমন একটী গন্ধ। আমার ইহা ভাল লাগিতেছে না।"

"সে কি? তুমি ইহা ভালবাস বলিয়া তোমার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে। বিশেষত আমি স্বহস্তে পাক করিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, ইহা অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

"যদি অতি উপাদেয়ই বিবেচনা কর, তুমিই ইহা ভক্ষণ কর।" তখন জয়ার মাতুলানীর মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। এদিকে তীব্র বিষের প্রভাবে জয়ার মাতুল অল্পক্ষণ মধ্যেই হতচেতন হইয়া পড়িলেন এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমাগত ব্যক্তিবর্গ সকলেই বিচলিত হইলেন। কেহই কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না। মৃতের পত্নীও লোকলজ্জা ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তখন সকলে দৈব বিড়ম্বনা মনে করিয়া সৎকার জন্য মৃতদেহ নদীতীরে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ মৃতের পারলৌকিক সুখের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জয়ার মাতুল পত্নীকেও সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ভয়ঙ্কর শ্মশানদৃশ্য মনে করিয়া তিনি প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন। পরে লোকগঞ্জনা ভয়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করিল। চিতার উপর মৃতদেহ স্থাপন করিয়া চিতাকাষ্ঠে তাঁহাকে বদ্ধ করিল এবং পরে অগ্নি সংযোগ করা হইল। দেখিতে দেখিতে চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগিনীর চীৎকার সেই শব্দে মিশিয়া গেল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে রতনসিংহের আদেশই নব দম্পতীর একমাত্র উদ্বেগের কারণ হইল। কিরূপে কৌশলে আলাউদ্দিনকে প্রতারিত করিয়া চিতোর-রাজের উদ্ধার সাধন করিবেন, সতত তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জয়া দিল্লী গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। রতনসিংহ সম্রাটকে পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলে দিল্লীশ্বর পুনরায় রতন সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "হিন্দুরাজ! এতদিন পরে তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়াছ। তোমার কন্যা দিল্লীশ্বরী হইবে, ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে এবং তোমাকেও আমি দিল্লীর অমাত্যগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিব।"

বিনীতভাবে রতনসিংহ উত্তর করিলেন "দিল্লীশ্বর! আমি অন্য সম্মানের প্রার্থী নহি। কেবল স্বাধীনতার জন্য আমাকে এই ঘোর অপমাননাজনক কার্য্যে সম্মত হইতে হইল।"

তোমার কন্যা দিল্লীর প্রাকারের মধ্যে আসিলেই তুমি স্বাধীন হইবে, কিন্তু তোমার কন্যা কখন আসিবে, জানিতে চাই।"

যবনরাজ! শুনিলাম, আমার কন্যার বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং সে পরাধীনা। তাহার স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কখনই সে আসিবে না। কিন্তু জয়া রাজপুত কন্যা, কখন পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না।"

রতন সিংহের কথায় আলাউদ্দীনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ভাবিলেন, চতুর রাজপুত তাঁহার সহিত চাতুরী করিতেছে। তজ্জন্য গম্ভীর হইয়া বলি-লেন, "রাজপুত! যদি তোমার কন্যা অদ্য হইতে সাতদিনের মধ্যে না আইসে, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে ও তোমার রাজ্য ছারখার করিব।"

এই বলিয়া সম্রাট্ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজ-পুতরাজও ভাবিতে ভাবিতে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর চারিদিন গত হইল। পাছে জয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, এই ভয়ে রতন সিংহ ভীত হইলেন। তাঁহার কারাযন্ত্রণা দ্বিগুণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন রাজপুত সৈন্য জয়ার নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসিল। পত্রে চিতোররাজ জানিতে পারি-লেন যে, জয়া পরদিন অপরাহ্নে দিল্লীতে উপনীত হইবে এবং তাহাকে কৌশলে তাঁহার মুক্তির আভাষ ছিল। পত্রানুসারে তিনি সম্রাটের নিকট

জয়া ও তাহার সঙ্গিগণের নির্ব্বিঘ্নে নগর প্রবেশের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দিল্লীশ্বর এই সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। অধীর হইয়া কল্পনার নেত্রে কত সম্মোহন ছবি দেখিতে লাগিলেন। বিস্তৃত রাজ-প্রাসাদের একাংশ সজ্জিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং নানা প্রকার বেশভূষা করিয়া সোৎসুক নেত্রে জয়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জয়ার অভ্যর্থনার জন্য একদল সশস্ত্র সৈন্য নগরের বহির্ভাগে সংরক্ষিত হইল। তিনি রতন সিংহকেও অনেকটা স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। দিল্লীর নানাস্থানে মহোৎসব হইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে একজন দূত আসিয়া জয়ার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এবং জানাইল যে, জয়া প্রথমতঃ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। রক্ষিবর্গ সম্রাটের বিরাগোৎপাদনের ভয়ে কোনও আপত্তি না করিয়া তাহাতে সম্মত হইল। দেখিতে দেখিতে একশত শিবিকা দিল্লার ভিতরে প্রবেশ করিয়া রতন সিংহের কারাগারের দিকে যাইতে লাগিল। প্রত্যেক শিবিকা একজন করিয়া আরোহী ও চারিজন বাহক ও দুইজন সশস্ত্র রক্ষি-পরিবেষ্টিত। শিবিকার অভ্যন্তরে স্ত্রলোকের পরিবর্ত্তে রাজপুত বীরগণ অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বাহকগণও শিবিকা ছাড়িয়া তরবারি গ্রহণ করিল ও জয়পালের আদেশে কারাগৃহের রক্ষিবর্গের উপর পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলকে বিনাশ করিল। রতন সিংহও পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনিও স্বভাবজ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই কার্য্য একরূপ নিস্তব্ধতার সহিতই সম্পন্ন হইল। এবং রতন সিংহের কারাগৃহ নগরের প্রান্তভাগে স্থাপিত হওয়ায় তখন কোন প্রকার গোলযোগ হইল না। তৎপরে জয় সিংহ, রতন সিংহ ও জয়াকে মধ্যে রাখিয়া সাতশত রাজপুত সৈন্য লইয়া প্রবল বেগে নগর দ্বারের বহিঃস্থিত সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হওয়াতে মুসলমানগণের অধিকাংশ হত হইল ও অবশিষ্টাংশ পলায়ন করিল। অদূরেই তিনটি অশ্ব সজ্জিত ছিল। জয়পাল, জয়া, ও রতন সিংহ তাহাতে আরোহণ করিয়া তীরবেগে দিল্লী হইতে বাহির হইলেন। এবং ঐ সাতশত রাজপুত সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে রাজপুতানা অভিমুখে গমন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই জয়ার ও রতন সিংহের পলায়ন দিল্লী-

শ্বরের শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। পলাতকগণের অনুসরণার্থ চতুর্দ্দিকে সৈন্যদল প্রেরিত হইল। কিন্তু এইরূপে প্রতারিত হওয়াতে হর্ষবিষাদে আলাউদ্দিনের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। তিনি প্রতি-হিংসার জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার অবস্থা এরূপ হইল যে, তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক হইল।

এদিকে জয়পাল পঞ্চাশৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে নির্ব্বিঘ্নে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া প্রায় বিংশ ক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বতে বিশ্রামার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সেই দিবস রাত্রে একজন সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রায় দুইশত মুসলমান সৈন্য পর্ব্বতের অতিদূরে আসি-তেছে। শুনিবা মাত্র জয়পাল একটি অন্ধকারময় স্থানে পঞ্চবিংশতি জন রাজপুত সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং অবশিষ্টগণ সহ একটি উন্নতপ্রদেশে আরো-হণ করিয়া যবনদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মুসল-মান সেনাদল দুই দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রপশ্চাৎ আসিতেছিল। নিকটস্থ হইবামাত্র প্রথম দলের পঞ্চবিংশতি জন গুপ্তস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে হতাহত হইল। অবশিষ্টেরা পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া দ্বিতীয় দলের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত আসিতে লাগিল। কিন্তু এবারও পর্ব্বতের সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র পূর্ব্বের ন্যায় অনেক সৈন্য হতাহত হইল। কোথা হইতে তীর আসিতেছে, নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, যবন সেনাগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মনস্থ করিল। কিন্তু শত্রুদল সংখ্যায় অল্প, ইহা অবধারণ করিতে পারিয়া প্রবল-বেগে পর্ব্বত সমীপে উপনীত হইল এবং একটি পার্ব্বত্যপথ দেখিতে পাইয়া তদ্দ্বারা উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে জয়পাল স্বীয় দলবল লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অপর দলও পশ্চা-দ্দিক হইতে মুসললানদিগকে আক্রমণ করিল। যবনদল পূর্ব্ব হইতেই ভীত হইয়াছিল। এক্ষণে এই আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের অনেকেই হতাহত হইল। অতঃপর জয়পাল নির্ব্বিঘ্নে চিতোরে উপনীত হইলেন ও সম্রাটের সহ যুদ্ধ অবশ্য-ম্ভাবী মনে করিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই আলাউদ্দিনের মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যে অরাজকতা ঘটিল, জয়পালও নিষ্কণ্টক হইলেন। রতনসিংহ মুসলমান করে কন্যা সমর্পণে প্রতিশ্রুত

হইয়াছিলেন বলিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজ্যভার জয়পালের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজে অবসর লইলেন। তিনি বনগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু জয়া ও জয়পাল কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি রাজপ্রাসাদেই বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই ক্ষুদ্র শিশুর হাস্যে রাজভবন পরিপূরিত হইল।

সম্পূর্ণ।

শ্রীদেবিদাস চট্টোপাধ্যায়।

এ হেন বারতা তুলোনা।

১

যে হাসি গরবে কমলিনী মরে,
সে হাসি কি প্রিয়া জানে না?
পাছে সে ভ্রমর দংশয়ে অধরে
তাই ভেবে প্রিয়া হাসে না।

২

যে তারার হারে নিশা-দেবী সাজে,
সে কি তা সাজিতে পারে না?
কোমল কুসুম পাছে ব্যথা পায়,
তাই ভেবে মালা পরে না।

(৩)

কমলিনী সুখী ভ্রমর ঝঙ্কারে
তারে কি তা ভাল লাগে না?
ভানু ডুবে যায় যখন সে হাসে,
ভ্রমর তখন জাগে না।

(৪)

চকিত হরিণী যে নয়নে চায়,
সে কি সে নয়নে দেখে না?
ব্যাধের তাড়না সহেনি বলিয়ে
তাই মনে ভয় রাখে না।

(৫)

যে রবে কোকিল কানন মাতায়,
সে কি তা গাহিতে জানে না?
পাছে সে কোকিল শুনে লাজ পায়
তাই ভেবে প্রিয়া গাহে না।

(৬)

যে সুধার ধারা সুধাকর ঢালে,
সে কি তা ঢালিতে পারে না?
পাছে সে চকোর করে জ্বালাতন,
তাই ভেবে দান করে না।

(৭)

কুসুমের বনে ভাসে পরিমল
সে কি তা ভাসাতে পারে না?
পাছে সে পবনে ফুল ভেসে যায়,
ভাল বুঝে সেথা আসে না।

(৮)

কলঙ্কী চন্দ্রমা, পঙ্কজ কমল,
সে মুখে এ মুল তুল না!—
সে যেন শুনে না কেন্দে মরে যায়,
এ হেন বারতা তুলো না!

শ্রীমহম্মদ আজীজ উস্ সোভান।
সিউড়ী।

জীবনী সংগ্রহ।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

কলিকাতার খিদিরপুর হইতে আন্দাজ ৪ ক্রোশ দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতা নামক স্থানে এই মহাপুরুষ সন ১২২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রই আমাদের পণ্ডিত দ্বারকানাথ ছিলেন। পরন্তু দ্বারকানাথের আর কয়েক ভ্রাতা এবং ভগ্নী ছিল। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা তত ভাল ছিল না। কিন্তু তিনি দেবভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। দ্বারকানাথের পিতা গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তি দ্বারাও কিছু কিছু পাইতেন।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ প্রথমে পিতার পাঠশালে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎপরে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। ইঁহার সময় সংস্কৃত কালেজে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। তাহা না থাকিলেও মধ্য বয়সে নিজের অধ্যবসায় গুণে বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী পড়িয়া উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কালেজ হইতে বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করিয়া তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে একটী সামান্য পণ্ডিত রূপে তথায় কিছু দিন চাকুরী করেন। তৎপরে উক্ত কালেজ ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কালেজের সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে ইনি বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গুণের বিষয় সংক্ষেপে জানাইতেছি। পাঠক মহাশয় এ প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন যে, গুণের সঙ্গে কার্য্যের অথবা কার্য্যের সঙ্গে গুণের কেমন সুন্দর সম্বন্ধ। তাঁহার প্রধান গুণ ছিল,—

শ্রমশীলতা।

এই জন্য তিনি বহুকাল একরূপ স্বাস্থ্যে ছিলেন, সর্দ্দি জ্বর ইত্যাদি পীড়া ছিল না। ২৫ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত কালেজে ২৫ দিনও ছুটী লয়েন নাই। ঝড় বৃষ্টি, হর্ষ শোক, যাহা কিছু সংসারের বাধা বিঘ্ন পড়ুক না কেন, ইনি সে সমুদায় কাটাইয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে সংস্কৃত কালেজে নিজের কার্য্যে

উপস্থিত হইতেন। এবং শেষদশায় বৃদ্ধ বয়সেও সকলকে সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আরো বলিতেন, "আমি চোর ডাকাতকে যত ঘৃণা না করি, তাহাপেক্ষা আল্‌সে অকর্ম্মণ্য কুড়ে লোকদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি।"

সংস্কৃত কালেজের চাকুরীর পর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংসারে ভ্রাতা ভগ্নী, পুত্র কন্যা প্রভৃতিতে একটী বৃহৎ পরিবার হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যহ নিজে অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন। ইঁহার আর একটী গুণ ছিল,—

গাম্ভীর্য্য।

এই গুণের জন্য ইনি নাটক নভেল গ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই। উক্ত পুস্তক সকলে ছেলে খেলার কথা লিখিত হয়, উহা আবার লোকে পড়ে, ইহাই তাঁহার সংস্কার ছিল। কিন্তু ইতিহাস, জীবন-চরিত, মনো বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল। কোন হাল্‌কা বিষয় পড়িয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন না। লেখা পড়া করা তাঁহার জীবনের এক মহাব্রত ছিল। কখন অন্যায় রূপে সময় নষ্ট করিতেন না; কালেজ হইতে আসিয়া হয় পুস্তক পাঠ, না হয় প্রবন্ধ রচনা করিতেন। এই অভ্যাস জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। রাত্রে ৪ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। যখন ইনি লেখাপড়া করিতে বসিতেন, তখন ইঁহাকে ডাকিতে কেহই সাহস করিত না। পড়িতে বা লিখিতে বসিলে, তাঁহার যোল আনা মন উহাতে ব্যয় হইত; কিছু মন কোন দিকে থাকিত না, কাজেই এসময় ডাকিলে, উত্তর দিতে হইলে ঐ লেখাপড়ার মন তুলিয়া তবে ত উত্তরের জন্য কিছু মন ব্যয় করিবেন। কিন্তু এ ব্যয় করিতে তাঁহার ভাল লাগিত না। কি যেন আটার জোরে মনটা লেখাপড়ার ভিতর এমন আট্‌কান থাকিত যে, উহা তুলিতে গেলে আটার চাড়ে মনটা চড় চড় করিয়া উঠিত, তাহাতে বোধ হয় কষ্ট হইত, তাই কেহ লেখা বা পড়ার সময় তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিতেন। এই জন্য লেখাপড়ার সময় তাঁহার পুত্র কন্যা কিম্বা মাতা পর্য্যন্ত নিকটে গিয়া ডাকিতে সাহস করিতেন না। অন্য সময়ও

প্রায় গম্ভীর ভাবে থাকিতেন। এ গাম্ভীর্য্য ভাব পুস্তকের পাঠক অপেক্ষা পুস্তক বা প্রবন্ধাদি লেখকদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ সহজেই সময়ে সময়ে আসিয়া পড়ে। "লেখকদিগের সাময়িক গাম্ভীর্য্যাবস্থা ভাবী প্রবন্ধের গর্ভাবস্থা" ইহা তিনি বলিতেন, এই জন্য অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া আছেন, তখনও কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। পরন্তু তাঁহার অপর গুণ,—

ন্যায় পরায়ণতা।

নিজের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেন এবং নিজের দেনা কদাচ রাখিতেন না। কোন প্রতিবেশীর নিকট কেহ পাইবে বলিয়া তাগাদায় আসিলে, ইনি সে প্রতিবেশীকে ঘৃণা করিতেন এবং মনে মনে রাগিয়া উঠিতেন। কেহ কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হইলে ইনি তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন। ইঁহার চক্ষের উপর দুর্ব্বলের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে ইনি তাহাকে সহজে ছাড়িতেন না, যে প্রকারে হউক, তাঁহার প্রতিবিধান করিতেন। এ সময় মিতব্যয়িতা উল্টাইয়া যাইত, এজন্য অনেক অর্থ আদালতে অকাতরে ঢালিয়া দিয়া, তবু অত্যাচারীকে দণ্ড দেওয়াইতেন।

ন্যায়পরায়ণতার আর একটী দৃষ্টান্ত এই যে, সংস্কৃত কালেজে চাকুরী হইবার পূর্ব্বে ইঁহার পিতার যেরূপ বার্ষিক, বৃত্তি বিদায় এবং দান প্রভৃতিতে পাওনা ছিল, সে সময় ইঁহারও সেইরূপ পাওনা ছিল, কিন্তু স্বক্ষমতায় অর্জ্জন করিতে শিক্ষা করিয়া সে সকল বৃত্তি লওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "লাখ টাকায় বামনঃ ভিখারি" এ দুর্নাম তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি বলিতেন, "চলিবার শক্তি হইলে আর কিছু ধরিতে হয় না।" এমন কি, সংস্কৃত কালেজে কেহ কখন বৃত্তি পাঠাইয়া দিলেও তিনি উহার অংশ লইতেন না, অপরাপর শিক্ষকেরা উহা অংশ করিয়া লইতেন।

স্বাধীনতা।

ন্যায়ের উপর কিছু নিজের মত দিলে, যেরূপ স্বাধীনতা আসিয়া থাকে, ইঁহার সেইরূপ একটু স্বাধীনতা ভাব ছিল। এজন্য ইনি পুরা সমাজ সংস্কারক না হইলেও, লোকাচারের ব্যাধিযুক্ত কার্য্যগুলি ভাল বাসিতেন না। আচার বেশী হইলেই শুচি বাই রোগে পরিণত হয়, সেইরূপ লোকাচার বহুদিনের হইলে উহার ভিতর অনেক দোষ ধরিয়া যায়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সমাজের প্রথা এই যে, কোন গৃহস্থের কন্যাসন্তান জন্মিবা মাত্র একটী পাত্র স্থির করিয়া উহার বিবাহের সম্বন্ধ ধার্য্য হইয়া যায়। এমন কি, এই সমাজে তিন মাসের বালিকা এবং চারি মাসের বালকের সঙ্গে বিবাহ পর্য্যন্ত হইত দেখিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রথা তুলিয়া দিতে উদ্যত হয়েন, এজন্য অনেক লিখিয়াছেন, অনেক কলহ সহ্য করিয়াছেন ; এমন কি নিজের পরিবার মধ্য হইতে এ প্রথা উঠাইয়া দিয়া দেখাইয়াছেন, এজন্য সে সময় তাঁহার সমাজে কত গোলযোগ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইঁহাকে সমাজে পতিত করিয়াছিলেন, ইনি কিছুতেই উক্ত বিষয়ে প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এক্ষণে উক্ত সমাজে পূর্ব্বের কুৎসিত প্রথা আর নাই বলিলেই হয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৎকীর্ত্তি।

ইঁহার প্রথম কীর্ত্তি এই যে, নিজ গ্রামে একটী ইংরাজী স্কুল খুলেন। কিন্তু উহা অর্থাভাবে বন্ধপ্রায় হইয়া উঠে। এজন্য ধনীদের তোষামোদ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ভাল ফল হয় নাই। শেষে "নিজে যাহা পারিব সেই মত করিব" এই বলিয়া স্কুলটী নিজের পরিবারভুক্ত মত করিয়া লইয়া, মাসে মাসে উহাতে অনেক অর্থ দিতেন। উক্ত স্কুল বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে আসিলে উহাকে কেবল ইংরাজী স্কুল না রাখিয়া, সংস্কৃত এবং ইংরাজী স্কুল করা হয়। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি,—

সোমপ্রকাশ।

ইহা সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র। এই সংবাদ-পত্রের পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ছিল, তাহারা মার্জ্জিত রুচি লইয়া পরিচালিত হইত না। সোমপ্রকাশ সে সময়ে বাঙ্গালীদের, বিশেষ শিক্ষিত সংবাদ-পত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যেমন এডুকেশন গেজেটের "মত" গভর্ণমেণ্ট শুনিয়া থাকেন এবং লোকেও এডুকেশন গেজেটের "এই বিষয়ে" কি মত শুনিবার জন্য যেমন আজকাল ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, সোমপ্রকাশের ঠিক এই অবস্থা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সময়ে ছিল।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ৺অক্ষয় কুমার দত্ত এই দুই মহাপুরুষের যত্নে বাঙ্গালা ভাষা যেমন পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বারা

বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সেইরূপ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। এখনও "সোমপ্রকাশ" জীবিত আছে। কিন্তু ইঁহার পর হইতে আর সে "সোমপ্রকাশ" নাই। এখন বুড়া সোমপ্রকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, ইনি বৃদ্ধাবস্থায় পীড়িত হইয়া জব্বলপুরের সন্নিহিত সাতনা নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তথায় সন ১২৯১ সালে ৮ই ভাদ্র, সোমবারে বিস্ফোটক রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

ফুল ও ফুলের ভাষা।

(পাশ্চত্য সংস্কার)

পশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিরীষকুসুম, নবমল্লিকা, চুতমুকুল, বনলতিকা, মাধবী প্রভৃতির সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই সমস্ত লইয়াই আমাদের গৌরবের ধন মহাকবি কালিদাস। সাধারণ মনুষ্যশরীর পঞ্চভূতে নির্ম্মিত; কালিদাস যে যে উপাদানে গঠিত হউক না কেন, আমরা তন্মধ্যে এই কয়েকটিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি। বলিতে কি, এই সমস্ত কালিদাসের প্রাণ; শুদ্ধ তাহাই কেন, প্রাণ হইতেও প্রিয়তর।

কাহার সহিত কাহার তুলনা! আবার দেশকাল পাত্র ভেদে রুচি পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সকল বিষয়ের মাত্রা আছে; অবস্থানুযায়ী অতিরিক্ত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

করুণাময় জগদীশ্বর প্রকৃতি রাজ্যে কি মহদুদ্দেশ্যে পুষ্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞান বলে এ রহস্য কতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না। কিন্তু সংসারাসক্ত মানব নিচয় যখন সংসারের বিষম জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া যায়, প্রাণমন ক্ষুণ্ণ এবং নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন প্রস্ফুটিত কুসুম অথবা তত্তুল্য কোন মনোরম বস্তু দেখিলে, দেহে কি জানি কেন, কি এক সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার হয় এবং মনপ্রাণ উল্লাসিত এবং উৎসাহিত হইয়া উঠে। অপরের কথা কেন, ক্ষুদ্র মানব শিশু হইতে দেবতা পর্য্যন্ত ইহার গুণে মুগ্ধ, রূপে বিমোহিত। দেবতা গন্ধর্ব্ব, মানব, ভাবুক এবং কবি, সকলেরই মনে উচ্ছ্বাস জন্মাইতে পুষ্পের অপ্রতিহত প্রভাব ও অদ্বিতীয় ক্ষমতা।

সুনির্ম্মল মৃদুমন্দবাহি নদীকন্দর বিধৌত, শাদ্বল সমাচ্ছাদিত, শৈলরাজি পরিবেষ্টিত নিভৃত বনভূমি প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্র। তথায় বিবিধ কুসুম

স্বতই প্রস্ফুটিত হইয়া সুরভি বিতরণ করে। এই স্থানে আগমন করিলে মনে এক অপার্থিব সুদুর্লভ স্বর্গীয় ভাব বিকশিত হয় এবং উচ্ছ্বাসের সুখউৎস সদা উছলিতে থাকে। জীবন্মুক্ত অনাসক্ত যোগী ঋষি তপস্বীগণের এরূপ স্থল সেই কারণে সমধিক অভিলাষানুরূপ। কিন্তু যোগী কিম্বা তপস্বীদিগের কথা স্বতন্ত্র। মানব সংসারে বাস করিয়া নিয়ত বিবিধ ঝঞ্ঝাটে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠে; এই কারণে নগরে অথবা তদ্বৎ অপরাপর জনপদ সমূহে যথায় প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে—মনের শান্তি লাভের নিমিত্ত, জগতের সমগ্র সভ্য সমাজে তত্তৎ স্থানে ফুলের বাগান রাখিবার প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত আছে।

যখন বর্ণ, জাতি বা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জগতের অন্যান্য জাতি নগ্নাবস্থায় গিরিগুহায় পশুবৎ বিচরণ করিয়া কেবল মাত্র উদরপূর্ত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তখন ভারতের আর্য্যগণ উন্নতির ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর সোপানে অধিরোহণ করিতেছিলেন। সুতরাং তৎকালে আর্য্যগণের নিকট পুষ্প অথবা পুষ্পোদ্যানের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই ইহার বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিকুঞ্জ কানন, কাম্য বন, কেলী কানন, বৃক্ষ বাটিকা প্রভৃতি মনোহর সুসজ্জিত উদ্যান সমূহ, প্রাচীন কালে নৃপতিগণের অবসর সময়ে সন্তোষ বিধান করিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, সমগ্র ইউরোপখণ্ড আজকাল যে সমস্ত বিচিত্র মনোহর পুষ্পোদ্যানে পরিপূরিত, তন্মধ্যে অধিকাংশ পুষ্পই ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে নীত হইয়াছে।

গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি অমূল্য বিদ্যাসমূহ পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট প্রথমতঃ শিক্ষা করিয়া, কালক্রমে যেমন অনেক স্থলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান সম্বন্ধেও তদ্রূপ এই নিয়মের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়না। অধুনা, নিকুঞ্জ কানন বলিলে বুঝিতে পারি না, কাম্য বন কি জিনিষ, মনে ধারণা হয় না; আবার পুষ্পোদ্যান বলিলে একটা বিষম ধাঁধা আসিয়া উপস্থিত হয়। আজকালকার আমাদের ফুলের বাগান এক একটী বিলাতী নার্‌সারী। বিলাতী ফুল এবং 'পাতার' সংখ্যাই অধিক—আগাছার মধ্যে যদি কচিৎ দুই একটা ভুলক্রমে দেশী গাছ থাকিয়া যায়, তা বলা যায় না। অশোক কাঞ্চন, চম্পক বকুল, জবা গন্ধরাজ, যুথী মল্লিকা, সূর্য্যমুখী অপরাজিতা প্রভৃতি আর বড় দেখিতে পাই না—ইহারা নার্‌সারীর তালিকায় স্থান পাইবার কোন প্রকারেই উপযুক্ত নহে। শিরীষ কুসুম, চুতমুকুল ত দূরের কথা! এমত ক্ষেত্রে যে ইহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ শিথিল হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? কিন্তু অশোক, চুতমুকুল, নবমল্লিকা, নীলোৎপল অরবিন্দ লইয়াইত পর্ব্বতন মনীষীগণ কন্দর্পের পঞ্চ শর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

'The old order changeth yielding place to new," এটি পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার একটি মূল মন্ত্র। অস্মদ্দেশীয় অনেকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত। অবশ্য যিনি যাহা সুবিধা বুঝেন অথবা যাঁহাতে যাঁহার অভিরুচি, তিনি সেই পথ অবলম্বন করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্য নাই। কিন্তু যে কথায় স্পষ্টতঃ জাজ্বল্য ভাবে যাথার্থ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সে কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। পুরাতন হইলেই যে একবারে অস্পৃশ্য হইল এবং নূতন হইলেই যে তাহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার এমন বিশেষ বিধি কি আছে? নূতন ভাল হইলে গ্রহণ করিব, কিন্তু পুরাতন ভাল হইলেও শুদ্ধ পুরাতন বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিব কেন? ফরাসী গ্রন্থকার Boilean বলিয়াছেন, "পুরাতন এককালে নূতন ছিল, কিন্তু নূতনেরা যে কালে পুরাতন হইতে পারিবে, তাহার স্থিরতা কি"। * কথাটা ঠিক; আর্য্য ঋষিগণ নানাবিধ গভীর গবেষণা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের কৃত কীর্ত্তি সকলের আলোচনা করিয়া, এমন কি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, যাহাতে আমাদের কার্য্য সমুদয় একবারে বিলুপ্ত না হইয়া ভবিষ্যতে 'পুরাতন' বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে?

ফল কথা পুরাতন ভাল থাকিতে তাহা উপেক্ষা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতনের সম্মান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পুরাতনের যথাযথ সম্মান রাখিয়া, নূতনের সমাদর করাই যথার্থ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এ বিষয়ে Sidonius Apolonaris একটি সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা— 'we should read the ancient with respect and the moderns without envy'। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে দেশীয় পুষ্পের এমন কি দোষ দৃষ্ট হইল, যে তাহাকে এক বারে নগণ্য করিতে হইবে? গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বভাবতঃ পুষ্পনিচয় যেরূপ সুন্দর ও সুরভিযুক্ত হয়, তদ্রূপ আর কোন দেশে হয় না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের পুষ্পবৃক্ষ সকল এ দেশে সচরাচর যে প্রকার বিকৃত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। একথা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিলেও সেই একটানা স্রোতের গতি ফিরিয়া বহে না, ইহাই বড় পরিতাপের বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* Curiosities of Literature—"ancient and modern" p. 27. Routeldge's Edition.

বীরভূমি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২য় ভাগ] ভাদ্র, ১৩০৮। [১১শ সংখ্যা।

অনুস্মৃতি।

"অসুর বিবুধ সিদ্ধৈর্জ্জ্ঞায়তে যস্য নান্তং"
"সকল মুনিভিরন্ত শ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ"
"নিখিল হৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী"
"তমজ মমৃতমীশং বাসুদেবং নতোস্মি।" গারুড়ে॥

দুঃখ নিবৃত্তির পর সুখ প্রাপ্তি হউক ইহাই সকলেরই ইচ্ছা, কিন্তু সুখ প্রাপ্তির উপায় অপরিজ্ঞান বিধায় ইচ্ছা করিলেও সকলেই প্রকৃত সুখের সুখী হইতে পারেন না। সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিতে হইলে, সুখ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। পরে তাহার প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে মনুষ্য প্রকৃত সুখের সুখী হইতে পারেন এই মনুষ্য-জীবন-কালই প্রকৃত সুখের তথ্য জানিয়া লইবার উপযুক্ত অবসর। সুখ কাহাকে বলে, দেখিতে গেলে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব যে, সঙ্কল্পাত্মক চিত্তের সাময়িক বৃত্ত্যন্তর বশতঃ সময় বিশেষে বস্তু বিশেষের অভাবের অসদ্‌ভাবই সুখ শব্দবাচ্য হয়। মনে করুন, যাঁহার সুন্দর গৃহ নাই, তিনি একটি উত্তম গৃহ পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন; যাঁহার পশু নাই, তিনি কতকগুলি পশু পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন; যাঁহার রমণী নাই, তিনি একটি সুন্দরী রমণী পাইলে আপনাকে সুখী বোধ করেন; যাঁহার ব্রীহি ও রতন নাই, তিনি ব্রীহি ও রতন পাইলে

করিতে হইলে, জীবনের কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত করিলেও জীব কখনই প্রকৃত সুখের সুখী হইতে পারিবেন না; জীবনকালে জীবের অভাবের ইয়ত্তা নাই, একটি অভাব পূর্ণ হইলেই আবার একটি নূতন অভাব স্বতই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; জীব-সৃষ্টির ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ প্রবাহ, ইহার গতিরোধ হইবার নহে। সেই জন্য সুখী ব্যক্তিগণ যাহার আদি নাই, অথচ যিনি সকলেরই আদি, যাহার কারণ নাই, অথচ যিনি সকল কারণের কারণ, সেই ঈশ্বর, পরম কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সুমনোহর নখকিঞ্জল্কাবধি উচ্চ হাস্য পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ বা আপন আপন সম্প্রদায়ানুসারে চক্রাদি ক্রমে ধ্যানযোগ দ্বারা সঙ্কল্পাত্মক চিত্ত-বৃত্তি সকলকে বিকল্পাত্মক চিত্ত-বৃত্তি সকলে হোম করতঃ প্রারব্ধ ভোগ মাত্র করিয়া আনন্দ-মনা হইয়া থাকেন।

ইহদৃষ্টিতে যাহাকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহাকে প্রকৃত সুখ বলিয়া লওয়া হয় না বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি দৃশ্য বস্তু মাত্রই জীবের সুখের জন্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্তুতঃ মিথ্যা জানি-য়াও জীব মাত্রে উহাতে লিপ্ত হয় কেন? ইহার উত্তরে ইহাই দেখিতে পাইব যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, সেই সমস্তই বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও কোন এক অনির্ব্বচনীয় সত্য পদা-র্থের চির সত্ত্বা বশতঃ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জলপতিত চন্দ্র ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রকৃত চন্দ্রের মধুরিমা যেমন নয়নপথের অতীত হয়, তদ্রূপ জগতীস্থ মায়িক বস্তু সকলে মমতা স্থাপন করিয়া গুরুরূপী পরব্রহ্মের সন্নিধান হইতে দাস বা বন্ধুরূপী জীব সুদূরে পতিত হইয়া থাকেন।

এবম্প্রকার চিত্তবৃত্তি সকলের বিক্ষেপজনিত অভ্যাসই কাল ক্রমে গাঢ় হইয়া অজ্ঞান নামে কথিত হয়। এই অজ্ঞানই সমস্ত দুঃখের জনক। যখন চিরমুনী সকলও কদাচিৎ ধ্যানাভাব হইয়া থাকেন, তখন স্বতঃ ভ্রান্ত জীবের কা কথা!

পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমে আত্মা, কর্ম্ম করিবার জন্যই চিরানুবদ্ধ, এবং কর্ম্মই জীবের সুখ বা দুঃখের হেতু। এবং চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তির পরিচালনই কর্ম্মপ্রবৃত্তি। কর্ম্ম ক্ষয় করিতে না পারিলে দুঃখ নিবৃত্তির অন্যবিধ উপায় নাই। অতএব চিত্তের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তির পরিচালন যতই ক্ষীণ হইবে, জীবও ততই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারিবেন।

ইহজগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহা সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, তমঃ রজ ও সত্ব এই তিনটি গুণের একত্রাবস্থা ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্ট হয় না। কালে ইহাদের প্রত্যেকই প্রধান হইয়া থাকে; অর্থাৎ সত্বের উদয় কালে জীব সাত্বিক, রজোগুণের উদয় কালে জীব রাজসিক, ও তমঃগুণের উদয় কালে জীব তামসিক আচরণ করিয়া থাকে। জীব বহুতর চেষ্টা করিলেও কখনই কালের গতি রোধ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের চিদংশ বিশেষ আত্মা জীবরূপে আকাশে, বায়ুরূপে বায়ুতে, তেজরূপে অগ্নিতে, জলরূপে জলে ও পৃথিবীরূপে পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু কি পৃথিবী, কি জল, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আকাশ কেহই ইহাকে জানে না; তবে আকাশে যে শব্দ গুণ আছে, বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, পৃথিবীতে যে গন্ধ গুণ আছে, অগ্নিতে যে দাহিকা শক্তি আছে ও জলে যে রস পদার্থ আছে, তাহা উক্ত ভূত সকলে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট থাকা বশতঃ হইয়া থাকে। জড়পদার্থে চিদংশের সন্নিধান না হইলে উহাতে চৈতন্য হইতে পারে না। যত প্রকার চেতন পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য জীবনই উত্তম দৃষ্টান্তস্থল; কেন না, মনুষ্য জীবনে মনুষ্য সকলকে হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট দেখিতে পাই, অন্য জীবে হিতাহিত জ্ঞান থাকিলেও তাহা কেবল ভয় বশতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্য জীবনে কাহাকেও ভয় করিতে হইতেছে না, নিজ শরীরে নিজে নিজে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার হইবার সুবিহিত উপায় রহিয়াছে। অন্য কোন জীবের সেরূপ ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। হরিস্মৃতিই সমস্ত সুখের একমাত্র জনক। হরিস্মৃতি অভয়দা, শুভদা ও বিঘ্ননাশিনী; অপর

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদি মধ্যেচ অন্তে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

হরি স্মরণ করিলে কখনই কোন কার্য্যে ব্যর্থমনোরথ হইতে হয় না, হরি সকল দুঃখ কর্ষণ করিয়া সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী রাধার প্রতি মনোধারণা করাইয়া থাকেন, রাধার প্রতি মনোধারণা করিতে পারিলে সকল আপদ দূর হইয়া গেল, সুতরাং তখন সর্ব্বপ্রকার সুখ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সুখ সুখ করিয়া সুখান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয় না; কিন্তু বাঞ্ছনীয় বিষয় লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে, সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গুরুভূত বিশ্বাস

"দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥"

আরও—

"ধ্যানং দৈবত পূজনং জপতপো দানাগ্নিহোত্রাদয়ঃ।
"পাঠোযোগ নিষেবণং পিতৃমখোঽভ্যাগতার্চ্চা বলিঃ।
"এতেব্যর্থ ফলা ভবন্তি নিয়তং যস্যোপদেশং বিনা,
"তং বন্দে শিবরূপিণং নিজ গুরুং সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদং ॥"

অর্থাৎ ধ্যান, দেবতা-পূজা, জপ, তপস্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগ যজ্ঞ, স্তোত্রাদি পাঠ, যোগ সেবা, পিতৃ পূজা, পিতৃ যজ্ঞ, অতিথি সৎকার ও বলি-প্রদান, যাঁহার উপদেশ ব্যতিরেকে এ সমস্তই ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয়, সেই শিব-রূপী অভীষ্টদাতা গুরুদেবকে আমি নিত্য নিত্য বন্দনা করি। আরও যথা,

"গুরু বক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎ প্রসাদতঃ।
"স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনাং।
"অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুবদনস্থিত পরমব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীগুরু প্রসাদেই লাভ হয়, অতএব স্বাশ্রমোক্ত বর্ণ ধর্ম্ম এবং পুষ্টি বর্দ্ধিনী স্বীয় কীর্ত্তি প্রভৃতিকে বরং পরিত্যাগ করিবে, তথাপি গুরু ভিন্ন অন্য ভবনা ভাবিবে না। পুনশ্চ শ্রীভগবদুক্তৌ যথা—

"আচার্য্যং মাং বিজনীয়ান্নাব মন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্ব-দেবময়ো গুরুঃ ॥"

অর্থাৎ আমাকেই (ভগবানকে) আচার্য্য জ্ঞান করিবে, কদাচ মৃত্যু সমাকুল মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না। কেননা, গুরু সর্ব্ব-দেবময়।

বিশেষতঃ কলিকালে শ্রুতি সকল পাষণ্ড ভয়ে গুপ্তা হইয়াছেন, আচার্য্য বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অন্যত্র বিশ্বাস স্থাপনা করিলে আমরা আমাদের অভীষ্ট-সাধন করিতে সক্ষম হইতে পারিব না। গুরুতে বিশ্বাস করিতে না পারিলে চিরকালই অসুখী থাকিতে হইবে, সংসাররূপ কূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গুরু ভিন্ন ত্রিজগতে আর কেহ নাই—

"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।

অর্থাৎ গুরু বিদ্বান হউন আর নাই হউন, স্বপথে চলুন আর বিপথেই চলুন গুরুদেবই সদাকাল গতি হইয়া থাকেন। অন্যত্র চ—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে নকশ্চন।
"তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুরেব প্রসাদয়েৎ॥"

অর্থাৎ হরি রোষ করিলে গুরু ত্রাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রযত্ন সহ শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে।

আমার কিন্তু গুরুতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। হরি স্মৃতির কোন ক্রমও অবগত নহি। এমতাবস্থায় দিন যায় রাত্রি আইসে, আবার রাত্রি যায় দিন আইসে, কত দিন কত রাত্রি চলিয়া গেল, আমি যে অসুখী, সেই অসুখী; এমতাবস্থায় একদিন মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মন! তুমিত দেহেন্দ্রিয় সকলের রাজা, কৃপা করিয়া আমায় হরি দেখাইতে পার? তখন মন আমাকে সঙ্গে লইয়া জগতীস্থ নানা স্থানে লইয়া গিয়া নানা মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল, কিন্তু কোন মূর্ত্তিই আমার মন ভুলান না হওয়ায় পুনরায় মনকে বলিলাম, মন! তুমি আমাকে অনর্থক ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াও কেন? বঞ্চনার ফল কি? তখন মন বলিল, তুমি যাহাকে দেখিতে চাও, তাহাকে কি এই প্রথম দেখিতে যাও, না আর কখন দেখিয়াছ? কেননা যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে, পূর্ব্বে সে বিষয়ের অন্যবিধ জ্ঞান চাই; প্রত্যক্ষ হউক, অনুমান হউক, আর শব্দ বোধই হউক, এই জাতীয় জ্ঞান না থাকিলে স্মরণ হইতেই পারেনা। প্রথম অনুভব, প্রত্যক্ষাদি তাহার পর, তাহার পর সংস্কার, তাহার পর স্মৃতি, তাহারই ফল ধর্ম্মশাস্ত্র, এই জন্যই উহার নাম স্মৃতি না এই প্রথম দেখিতে চাও? আমি বলিলাম আমার মনে হয়, যখন আমি মাতৃগর্ভে নিহিত ছিলাম, তখন একবার দেখিয়াছিলাম; মাতৃগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া আর দেখিতে না পাইয়া কাহা কাহা করিয়া কান্দিয়া উঠিলে জননী মুখে স্তন্য দিলেন। স্তন্য পান করিবা মাত্র সেই মন, প্রাণ নয়ন ভুলান রূপ আর দেখিতে বা দেখিবার চেষ্টা পাইলামনা। ভাই মন! আমায় কে ভুলাইল? তখন মন বলিল, তুমি যাঁহার রাজ্যে আসিয়াছ, তিনিই তোমাকে তোমার হরি ভুলাইয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কে? কোথায় থাকেন? তখন মন বলিল, তিনি মায়া, সর্ব্বত্রই বিরাজমান্। আমি

লইয়া আমার চক্ষুদ্বয়ে সেচন করিবা মাত্র দেখিলাম, এক তপ্ত কাঞ্চন বরণা সুন্দরী যুবতী আলুলায়িত কেশে দিগ্‌বসন পরিধান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তাঁহার কপালে অরুণ-বিনিন্দিত সিন্দূর বিন্দু, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে কমণ্ডলু, অধর ফলকে মৃদু মন্দ হাসি ও তাহাতে এমনি প্রকাশ, যেন প্রার্থিগণকে বরাভয় প্রদান করিতে সদাই উদ্যতা।

আমি দেখিয়াই প্রণতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো! তোমার রাজ্যের ব্যবহার ও নিয়ম কি? বলিলেন

আপনার বল যারে, সেতো তোমার মন্দ করে,
আপনারে জানায়ে তোমার
আর, পুত্র, পৌত্র, পরিবার আর শত শত,
আমার রাজ্যের ধন তারে বিধিমত;
প্রদান করিয়া নিত্য তাহারে ভুলাই,
আমার আমার মাত্র তাহারে শিখাই;
সে যে কার, কে তাহার নাহি দিই অন্ত,
সর্ব্বদা তাহারে রাখি এই মতে ভ্রান্ত;
মৃত্যুকালে মম বশে আমারে ধেয়ায়,
পুনর্ব্বার জন্ম হয় আমাতে বেড়ায়।

তখন আমি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাগো! তোমার রাজ্যে আসিয়া পড়িলে নিস্তারের কি কোন উপায় নাই? উপদেশিলেন

ত্যজ, ত্যজ, রে বৎস ঘৃণা লজ্জা ভয়,
আর নিন্দা জাতিকুল শীল কর ক্ষয়;
আদি, মধ্য অন্ত্য বৎস কররে বর্জ্জন,
সর্ব্বদা আনন্দে তুমে কররে স্থাপন;
রহ, বহ, রে বৎস, নিত্যতত্ত্ব স্থানে,
তা হলে কি ভব ভয় আছে কোন স্থানে;
নির্ব্বিকার হবে তবে, সাধুজন সঙ্গ পাবে,
হবে তব সুকৃতি উদয়।
হবে সৎপথে ভক্তি, অনায়াসে পাবে মুক্তি,
সংসারের আর কিবা ভয়;

এই স্থলে বল হরি, পুনরে বদন ভরি,
হরি, হরি, হরি কর সার,
সুভক্তি উদিত হবে, পুন নাহি জন্ম পাবে,
এড়াবে সংসার কারাগার।

বলিলেন বৎস ! শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাক্যে অটল বিশ্বাস করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া অগ্রসর হও। বস্তুত কোন অভাব থাকিবে না, সকল কামনাই পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া কি জানি কোন্ পথ দিয়া কোন্ নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন—আর দেখিতে পাইলাম না, আমি আবার যে কে সেই—সেই অসুখী এবং না হইবই কেন? গুরু ও হরিতে অভেদ জ্ঞান স্থাপনা করিতে না পারিলে ত আর কোন উপায় নাই—যথা ব্রহ্মণোবাক্যং

"যোমন্ত্রঃ সগুরুঃ সাক্ষাৎ, যো গুরুঃ সহরিঃ স্মৃতঃ ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ।

ফুল ও ফুলের ভাষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিলাতী পুষ্পের জন্য যে প্রকার যত্ন, পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয়িত হয়, দেশীয়ের জন্য তাহার কণাংশ মাত্র হইলেও যে বিশেষ উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি হইতে একথা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইবে। 'স্থলপদ্ম আশ্বিন মাসে ফুটিতে আরম্ভ হয় ও ফাল্গুন চৈত্র পর্য্যন্ত ফুটিয়া উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করে, ইহার বড় বড় ফুল হয় দেখিয়াই সকলে মুগ্ধ হয়; কিন্তু আমরা ইহার আর একটি গুণ দেখিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বর্ষারম্ভের কিছু পূর্ব্বে ইহার মোটা শাখা ছাটিয়া দিলে সেখানে অনেক গুলি শাখা বাহির হয়। এই নবীন শাখাগুলি অতি অল্প দিনেই পাটের গাছ হইতেও লম্বা হয়। যে সময়ে পাট কাচিয়া পচান হয়, সেই সময়ে এই ডাল গুলি কাটিয়া সেইরূপ পচাইয়া ধুইয়া লইলে অতি উৎকৃষ্ট পাট হয়, যেমন শক্ত তেমনি দীর্ঘ ও পরিষ্কার। যদি ইহার রীতিমত চাষ করা হয়, তাহা হইলে আরও সুন্দর ও অধিক পরিমাণে জন্মে,

আর একটি কথা, পাটের ন্যায় ইহার গাছ বৎসর বৎসর সমূলে নষ্ট করিতে হয় না। একবার হইলে বহু বৎসর থাকে। ... গবাদির উৎপাত, বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি দ্বারা ইহার নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। কার্ত্তিক মাসের শেষে, অর্থাৎ বর্ষা ক্ষান্ত হইলেই, ইহার ছোট শাখা বিতস্তি প্রমাণ করিয়া পুতিলে দুই বৎসর মধ্যেই আশানুরূপ বৃক্ষ হয়, তখন কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে।" * অধিক কি এক ভারত ক্ষেত্রে চেষ্টা করিলে ২৫৪ প্রকার গোলাপ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। †

পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে অধুনা পুষ্প ও পুষ্পোদ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য অবসর কালে বা সময় অসময়ে মনের একটু শান্তি লাভ করা,—ক্ষুণ্ণ মনে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তির বিকাশ করা। দুর্লভ মানসিক শান্তি ও স্ফূর্ত্তির জন্য এত যত্ন, এত আয়াস ও এত অর্থব্যয়। কিন্তু বহু কষ্টে রচিত সেই বিচিত্র শোভাময়ী bower এ বসিয়া, আশানুরূপ হৃদয়ের শান্তি কয়জনে লাভ করিয়া থাকেন?

যে কবি?

'প্রকৃত তাহার সব অধিকার
আকাশ কানন কন্দর গিরি,
তার অন্তর্গত রাজ্য দেশ কত
সকলি তাহার আনন্দ পুরি।'

তাহার আবার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পুষ্পোদ্যানের আবশ্যক কি? সে—

'আসিলে বৃক্ষের পত্র
অনিমেষে চেয়ে রয়—
বনের পাখীর রবে
বিমুগ্ধ।'

তাহার আবার bower এর দরকার কি, তাহার আবার হার্ম্মনিয়ম্ ফ্লুটের কি কাজ? ভাবুক প্রকৃতি প্রেমে বিভোর, সে বলে

'যা দেখি যা বুঝি, সতি
তাই যেন নিয়মিত
ভুলাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণ'

* হিতবাদী ৩০ ভাদ্র ১৩০১।
† The Indian amateur Rese gardener—ch xI.

তাহার আবার দেশী বিদেশী ভালমন্দ বিচার কি? তাহার নিকট

"যার পানে চাই   সেই মধুময়
সরলতা গুণে ভুলিয়ে রই।'
'জল নিরমল   যা কিছু সরল
সকলি আমার সুখের মূল।'
'চাঁদের কিরণ   কাননের ফুল
যখন যে ভাবে যেখানে দেখি।'
'ভুলে যাই দুঃখ   ভুলে যাই জ্বালা
আপনা ভুলিয়ে চাহিয়ে থাকি।"

প্রকৃতির সর্ব্বত্রই মধুময়, প্রতি অনুপরমাণু উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ-ঠল্ ঠল্ করিতেছে; তবে প্রবেশ করা চাই, নচেৎ অন্ধের মত সকলই শূন্য এবং অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহার একটি মাত্র চক্ষু আছে, সে চর্ম্মচক্ষে সমগ্র বাহ্যপ্রকৃতি দেখিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারে কয় জন? আর এক কথা, প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের এমনই গুণ যে, যতই আলোচনা করি, ততই অভিনব সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে। সেই জন্য কবি, শুদ্ধ প্রকৃতি লইয়াই সুখী, প্রকৃতি পাঠেই মাতোয়ারা। কিন্তু এইরূপ কবি হইতে পারে কয়জন,—এই সুখ কয়-জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে?

জগদীশ্বরের বিশাল রাজ্যে সকলে সমান নহে—সকলে সমভাবে সুখী হইবে কোথা হইতে, সকলে কবি হইবে কেমন করিয়া। সুখ দুঃখ ভাগ্যা-ভাগ্য সকলেরই তারতম্য আছে। কবি প্রকৃতিরাজ্যে যাহা দেখে, তাহা-তেই উন্মত্ত; আমি একজন সাধারণ সঙ্কীর্ণচিত্ত ক্ষুদ্র মানব, বিচিত্র কৃত্রিম শোভাযুক্ত বিবিধ বর্ণের পত্র পুষ্প পরিপূরিত সীমাবদ্ধ অল্লায়ব উদ্যান ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর কি।

ভাল কথা;—কিন্তু আমরা বিষয়ান্তরে নিযুক্ত ছিলাম। বলিতেছিলাম, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে মনোরম পুষ্পোদ্যান অত্যাবশ্যক বটে, তবে উদ্যান রচনা সম্বন্ধে দেশীয় পুষ্পের প্রতি একটু নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হইতেছে। উদ্যানে বিদেশী পুষ্পের আমদানী হওয়ার পক্ষে, আমরা বিরোধী নহি; বরং ইহার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, ততই আমরা সুখের বিষয় বিবেচনা করি।

কিন্তু, এটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক, যেন দেশীয় পুষ্পের প্রতি কোন মতে গর্হিতাচরণ করা না হয়।

সুখের ও গৌরবের কথা, যে ইদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে উদ্যান-রচনা, কৃষিকার্য্য প্রভৃতির প্রতি কিঞ্চিৎ শুভদৃষ্টি পতিত হইতেছে। এই সকল সম্বন্ধে আলোচনা একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছিল; পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং তাহাদিগের অপরাপর বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যার প্রতি অতিশয় অনুরাগ দেখিয়া—কত গ্রন্থকার এ বিষয়ে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন—আমাদেরও অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়ে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। তবে, পুর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশীয়ের প্রতি টান্ একটু বেশী। তা হইবারই কথা; আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষার প্রতি একবারে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন,—বাঙ্গালার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। কিন্তু ক্রমে এক্ষণ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?—ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়া অনেক মহাত্মা এক্ষণ বাঙ্গালা ভাষা ও বিজ্ঞানের পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গালায় যাহা কিছু অভাব আছে, পূরণ করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। সেই জন্য পুষ্পোদ্যান রচনা সম্বন্ধে বিদেশীয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ বেশী টান্ দেখিলে তত দুঃখিত হইবার কারণ নাই—দেশীয়ের উন্নতির আশা করিবার সময় অতিবাহিত হয় নাই, এমন কি উন্নতির আশা করিবার সময় হয় ত এক্ষণে বহুদূরে অবস্থিত।

পুষ্প ও পুষ্প বৃক্ষের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুষ্পের উৎকর্ষসাধন করা সামান্য কথা নহে; এ সকল বিষয়ের জটিল বিজ্ঞানশাস্ত্র আছে, বহু যত্ন এবং আয়াসে শিক্ষা করিতে হয়। কে বলিবে, যে বিদেশীয়দিগের নিকট বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে দেশীয় পুষ্প-বৃক্ষাদির উন্নতিকল্পে এবং দেশীয় বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের সম্যক্ আলোচনায়, অনেকেই বিশেষ যত্নপর না হইবেন।

এক্ষণে আমরা পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে ফুলের যে ভাষা সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা এবং উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

নিম্নাবস্থায় অবস্থান করিয়া যিনি যত যত্ন ও পরিশ্রম করিবেন, তিনি ততই ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। এ কথার যাথার্থ্য

ব্যষ্টিগত অথবা জাতিগত, উভয় অবস্থায় সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক অথবা পরমার্থিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এ বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইবেন, আমরা তাহাকে ততই ভালবাসা হইতে সম্মান এবং সম্মান হইতে ভক্তি করিতে আরম্ভ করি। সেই জন্য আমরা বাল্মীকি ব্যাসকে শুদ্ধ কবি বলিয়া ক্ষান্ত হই না,—দেবতা তুল্য জ্ঞান করি। ইংরাজগণও Milton ও Shakespearকে Divine শব্দে অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেইরূপ আবার দাম্পত্য প্রণয় এবং ভালবাসা হইতে ঈশ্বর প্রীতি ও প্রেম প্রাপ্ত হইবার সম্ভব, তবে যিনি যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই হেতু পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা আমরা আপনাদিগকে অধিকতর উন্নত মনে করি। 'পুষ্প' শব্দটি উচ্চারণ করিলে, হিন্দুহৃদয়ে দেবভাবেরই সমধিক স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তদেতর ভাব বড় একটা মনকে অধিকার করিয়া বসিতে পারে না। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে এখনও ইতর ভাবই প্রবল; অধিকাংশ স্থলেই পুষ্প, শুদ্ধ প্রণয়ীর ভালবাসা দেখাইবার নিদর্শন মাত্র—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিলাস সামগ্রী। কিঞ্চিৎ পরে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যদি কোন প্রকার পুষ্পের ভাষা প্রচলিত থাকে, তবে তাহা নীরব ও অব্যক্ত। নীরবে ও নির্জ্জনে, প্রাণভরা প্রাণের ভাষা, পুষ্পের অব্যক্ত গভীর ভাষায় বিমিশ্রিত হইয়া, হৃদয়ের প্রেম-অশ্রুতে লিখিত হইলে, তাহাই বাগ্মী প্রবরের অকাট্য বাক্‌প্রপঞ্চের ন্যায় ক্রিয়া করিতে থাকে; শুদ্ধ পুষ্প অথবা বৃক্ষপত্র, কথিত ভাষার ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিতে পাই না। শকুন্তলাকে শুকোদর সুকুমার নলিনী পত্রে নখ দ্বারা বর্ণ অঙ্কিত করিয়া 'মদন লেখ' প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল; সুন্দরকে রতির ফুলময় তনু গড়িয়া, কেঁয়া পত্রে চিত্র শ্লোক লিখিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিতে হইয়াছিল —পরিশ্রমের এক শেষ! পাশ্চাত্যগণের কিন্তু এইরূপ স্থলে বিশেষ সুবিধা।

ইংলণ্ডে ফুলের ভাষা বহুদিবসাবধি প্রচলিত আছে। Spencer, Ben Jonson হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবিদিগের গ্রন্থে পর্য্যন্ত, ইহার বিস্তর আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা যেস্থলে হৃদ্গত বা মনোগত ভাব সমুহ বাক্য দ্বারা পূর্ণ বিকশিত করিতে অসমর্থ হয়, তথায় পুষ্পের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

"All those token-flowers which tell
What words could ne'er express so well."

Mary Worthy Montague তুরস্ক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই প্রথা ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তুর্কেরা নাকি এ বিষয়ে সমধিক পটু।

লিখিত ভাষা মাত্রেরই যেমন ব্যাকরণ প্রচলিত আছে এবং স্থলবিশেষে তাহার ও আবার সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট থাকে, ফুলের ভাষা সম্বন্ধেও ঠিক্ সেই প্রথা অবলম্বন করিবার যত্ন করা হইয়াছে।

সর্ব্বনাম সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কেত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কোন বিশিষ্ট ফুলকে বাম দিকে নত করিলে ক্ষেত্রানুসারে 'আমি' অথবা 'আমাকে' বুঝিতে হইবে এবং দক্ষিণ দিক নত করিলে 'তুমি' অথবা 'তোমাকে' বুঝিতে হইবে। কিন্তু যখন প্রকৃত ফুল না দিয়া, কেবল মাত্র তাহার চিত্র প্রেরণ করা হয়, তখন ঐ ফুল পূর্ব্বোক্ত সঙ্কেতের বিপরীত ভাবে অঙ্কিত করিতে-হয় 'তুমি' ও 'তোমাকে' বুঝাইতে হইলে, বাম দিকে নত করিয়া চিত্রিত করিতে হয়।

যে ফুল যে ভাব পরিস্ফুট করে, সেই ফুলটিকে উল্টাইয়া ধরিলে, অর্থাৎ বোঁটাধার উপর করিয়া ধরিলে, ঠিক্ তাহার বিপরীত ভাব বিজ্ঞাপিত হয়। পত্র ও কণ্টক সহ গোলাপ কোরক প্রেরিত হইলে, বুঝিতে হইবে, যে আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে, কিন্তু আশাও করিতে পারি; কোরকটি উন্নতানত করিয়া প্রেরিত হইলে "তোমার আশা বা শঙ্কা কিছুই করিবার দরকার নাই।" আবার কোরকটি কণ্টক বিবর্জ্জিত করিলে, 'আশা করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে' ('There is everything to hope') এইরূপ এবং পত্র শূন্য করিলে শঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে (There is everything to fear) এইরূপ বুঝিতে হইবে। কোন এক প্রকার ফুল (Pausy) সোজাভাবে ধরিলে 'হৃদয়ের শান্তি' (Heart's ease) এবং উচ্চ ভাবে ধরিলে তাহার বিপরীত অর্থ বুঝায়। আবার এই ফুল যখন কাহাকেও হাতে হাতে সোজাভাবে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তখন সে ব্যক্তি' আমায় মনে রেখো ('Think of me') এইরূপ এবং উল্টাভাবে প্রদত্ত হইলে 'আমায় ভুলিয়া যাও' (Forget me), এইরূপ বুঝে। Amaryllis নামক এক প্রকার ফুল, অহঙ্কারের সংজ্ঞা বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট; পূর্ব্বোক্ত প্রথা অনুসারে 'my pride is humbled', 'your pride is checked' এই দুই ভাব উর্দ্ধাধঃ এবং বামদক্ষিণ দিকে নত করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

Wall-flower দুর্ভাগ্যের সময় অনুরক্ত থাকার চিহ্ন (Fidility in misfortune) বোঁটা ধরে উন্নত করিয়া কাহাকেও প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি দুঃখের সময় অবিশ্বাসের (unfaithful in trouble) কার্য্য করিয়াছিল, এই রূপ সূচিত হয়। আবার mary gold Flower হস্তে রাখিলে 'মনের কষ্ট (Trouble of mind) হৃদয়ে ধারণ করিলে বিপত্তি অথবা প্রীতি '(trouble or love) এবং বক্ষে ধারণ করিলে ক্লান্তি (weariness) বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

A, An এবং The এই তিনটি ইংরাজী (Article) শব্দ এক, দুই ও তিন শাখা বিশিষ্ট লতাগ্র ভাগ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিবারও সহজ উপায় আছে। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা, যথাক্রমে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যক পত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এগার হইতে উনবিংশ সংখ্যা পর্য্যন্ত বুঝাইতে হইলে,দশটি পাতায় অতিরিক্ত ফল সংযুক্ত করিতে হয়; যথা ১৩ তের বুঝাইতে হইলে, দশটি পত্র যুক্ত শাখায় তিনটি ফল সংযুক্ত করিতে হয়। ২০ হইতে ৯৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত ভিন্ন নিয়ম; যত দশক হইবে, দশ সংখ্যা পত্র বিশিষ্ট শাখায় ততটি যুক্ত পত্র সংলগ্ন করিতে হয়, বক্রী সংখ্যা ফলের দ্বারা জ্ঞাপিত করিতে হয়। যথা ৫৫ বুঝাইতে হইলে, দশ পত্র বিশিষ্ট শাখার অগ্রভাগে পাচটী যুক্ত পত্র সংশ্লিষ্ট করিলে পঞ্চাশ হইল, তাহাতে পূর্ব্বকার মত পাঁচটি ফলযুক্ত করিলে সর্ব্ব সমেত ৫৫ হইল। একশত হইলে দশটি দশপত্র বিশিষ্ট শাখা একটি বৃহৎ শাখায় সংযুক্ত থাকে, তাহাতে আবার যতটি পৃথক পত্র থাকিবে, তত শত বুঝিতে হইবে। খুচরা সংখ্যার নিয়ম পূর্ব্বকার মত। এই প্রকারে এক শত হইতে নয় শত নিরানব্বই; সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দশটি কারণ পত্র থাকিলে সহস্র এবং তাহাতে যতটি অপর অপর পত্র সংলগ্ন থাকিবে, ততগুণ সহস্র বুঝিয়া লইতে হয়। এইরূপ ফল ও পত্রের দ্বারা, বয়স, জন্ম তারিখ প্রভৃতি অনায়াসেই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

কোন প্রণয়ী নিজ প্রণয়িনার অষ্টাদশ জন্মোৎসবে পুষ্প ও পত্রের দ্বারা কিরূপ মনের অস্ফুটভাব, জলন্ত ও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। একটি চির সবুজ (চির ভালবাসার নিদর্শন) পত্রে, মাল্যের ভিতর দশটি পত্র বিশিষ্ট শাখায় আটটি ফল সন্নিবেশিত করিয়া (অষ্টাদশ প্রণয়িণীর বয়ঃক্রম), তাহাতে একটি লাল গোলাপ

কোরক (নির্ম্মল এবং সুন্দর) অথবা শ্বেত-পদ্ম (পবিত্র ও বিনীত) স্থাপিত করিবে ; ইচ্ছা হইলে তাহাতে আরও পীচ মুকুল (=আমি তোমার বন্দী), কারণ (=সরলতা) প্রদান করা যাইতে পারে।

সপ্তাহের সপ্ত বার ও বৎসরের দ্বাদশ মাস জ্ঞাপন করিবার ভিন্ন ব্যবস্থা আছে ; সপ্তাহ যথা—সোমবারঃ—পদ্ম পত্র ; সোমবার হইতে সৃষ্টির আরম্ভ, পদ্মপত্র সূর্য্যোদয়ে দিবারম্ভে প্রস্ফুটিত হয়।

মঙ্গলবার ঃ—অর্দ্ধ শুভ্র ও অর্দ্ধনীল বর্ণ পত্র ; শুভ্র ভাগ স্বর্গ এবং নীল অংশ সমুদ্রের চিহ্ন। সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

বুধবার ঃ—ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পত্র ; শুভ্রাংশে স্বর্গ, নীলাংশে জল এবং হরিতাংশে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিবসে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

বৃহস্পতিবার ঃ—হরিদ্বর্ণ পত্রের উপর একটি পুষ্প ; কারণ সৃষ্টির চতুর্থ দিবসের কার্য্য Luminary

শুক্রবার ঃ—একটি কীট অধিষ্ঠিত একটি পত্র, শুক্রবার হইতে জীবের সৃষ্টি।

শনিবার ঃ—ফলযুক্ত পত্র ; শনিবার দিবস শাক্ সব্জী ও ফল মূলের সৃষ্টি হয়।

রবিবার ঃ—একটি অলিভ (Olive) পত্র ; বিশ্রাম ও পবিত্রতার চিহ্ন।

মাস যথা ঃ—

জানুয়ারী ঃ—সাময়িক পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত একটি রবিন্ পক্ষী ; এই সময় রবিন্ পক্ষীর আবির্ভাব হয় এবং সাময়িক পুষ্প সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠে।

ফেব্রুয়ারী ঃ—সাময়িক পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত, একটি (Gold-finch) পক্ষী ; এই সময় এই সকল পক্ষী সঙ্গমে রত হয়।

মার্চ্চ ঃ—বাদাম শাখা সমন্বিত একটি পক্ষীর বাসা।

এপ্রেল ঃ—ঝোপের মধ্যে একটি লিনেট পক্ষীর কুলায়।

মে ঃ—পুষ্পবিশিষ্ট একটি ঝোপে কুলায়, আহার-লোলুপ পক্ষী শাবকের চিত্র।

জুন ঃ—অঙ্কুর জনিত পরিপক্ব Stradberry ফল।

জুলাই ঃ—সুগন্ধী বেগুনে Thyme জড়িত, লাল রঙের cherry গুচ্ছ।

আগষ্ট ঃ—পক্ক বদরী সংলগ্ন যব ও গমের গুচ্ছ।

সেপ্টেম্বর :—অঙ্কুর সংযুক্ত hops নামক বৃক্ষপত্রের মাল্য।

অক্টোবর :—বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট টীন Asters এবং hazel-nuts গুচ্ছ।

নভেম্বর :—গাজর ও সালগম সংশ্লিষ্ট আইবি লতার মাল্য।

ডিসেম্বর :—Holly পুষ্পমাল্যে চাকচিক্যময় সবুজ পাতা এবং সিন্দূর বর্ণ ফল ও তাহার মধ্যে আনন্দপ্রদ mistaletoe এতগুলি একত্র রহিলে ডিসেম্বর মাস বুঝিতে হয়।

প্রবন্ধটি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতে চলিল। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভব; বিশেষতঃ এইবার ক্ষান্ত না হইলে বীরভূমির বহুমূল্য স্থানের অপ-ব্যবহার করা হইবে। এই জন্য আমরা আপাততঃ আরও কয়েকটি বিলাতী ফুল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া অদ্যকার মত বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

Chamomile :—'দুঃখে সাহস,' এই পুষ্প যতই নিষ্পেষিত হয়, ততই মনোরম ঘ্রাণ উৎপাদন করে।

Dodder :—"নীচতা"; এই পুষ্পলতা সাধারণ মৃত্তিকায় আগাছার মত জন্মায়। অন্য বৃক্ষ বা গুল্মে সংলগ্ন হইলে তাহাতেই জড়াইয়া থাকে; তখন ইহার মূল নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ বৃক্ষ বা গুল্ম হইতেই পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

Buckbean :—"স্থির ও শান্তি"; যখন আকাশ নির্ম্মল হয় এবং সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিতে থাকে, তখন এই শ্বেত পুষ্প সকল গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত হয়। সচরাচর এই পুষ্প জলাশয়ের নিকট জন্মে, এই জন্য ইহার শ্বেত পুষ্প নির্ম্মল জলে প্রতিফলিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখায়।

Darnel :—"পাপ"; মানবের মনে পাপ প্রবেশ করিলে যেরূপ সদ্বৃত্তি নিচয় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই পুষ্প, শস্যক্ষেত্রে জন্মিয়া শস্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। ইত্যাদি

শ্রীশিবরতন মিত্র।

কোথা শান্তি ?

হেথা, সদা জ্বলে শোকানলে, এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর,
সদা উঠে হাহাকার ;
হেথা, বিষে হৃদি জর্ জর্ হয়ে আছি মর্ম্মাহত
হৃদি পুড়ে ছারখার ;
হেথা, কিবা নিশি দিনমান সদা বহে এক টান
দুঃখ-স্রোতে হৃদি ভাসে,
হেথা, কোথা হ'তে অলক্ষিতে অশান্তি যাতনা আসি,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় গ্রাসে ;
হেথা, সদাই আকুল প্রাণ, হৃদে তৃষ্ণা বলবান,
শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায় ;
হেথা, প্রবল অশান্তি বাতে উৎপাটিত শান্তি তরু
ফুলে ফল ঝরে যায় ;
হেথা, সংসার-বিটপী তলে, খুঁজিয়াছি যতবার
শান্তির শীতল ছায় ;
শেষে, হতাশে ভেঙ্গেছে বুক, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহি
ফিরিয়াছি পায় পায়,
তাই, বিষম বিপাকে পড়ি, ডাকিতেছি বার বার
ওগো দেবি শান্তি রাণি !
ওমা, তোর আশে সযতনে রেখেছি আপন মনে
এ হৃদি আসন খানি ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।
বালী ।

জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ব।

অনন্ত-শক্তির অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডল অন্যতম। প্রভাতে রক্তরাগ রঞ্জিত পূর্ব্ব গগনে 'জবাকুসুম সঙ্কাশ' তপন দেবের উদয়, পৌর্ণমাসীর সান্ধ্য নিশায় জগৎ-মনোহর রূপে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ, অমা-নিশার তামসী রজনীতে সুনীল নির্ম্মল আকাশে সুরবালা দীপরাজি সদৃশ তারকাবলীর আবির্ভাব আমরা আজন্ম প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই এই জ্যোতিষ্কমণ্ডল বিদ্যমান আছে। সমুদ্র-সৈকতের ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সুবিশাল মহীধর, প্রভাত তৃণদল সংযুক্ত ক্ষুদ্র শিশির কণা হইতে অনন্ত অসীম নীল অম্বুধি, চক্ষুর অগোচর সামান্য কীটাণু হইতে জীবকুলশীর্ষ মানব প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থই যাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক, গণনাতীত জ্যোতিষ্কমণ্ডলও এই বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা যুগযুগান্তর ঘোষণা করিতেছে। সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মহাতেজা তপনদেবই সর্ব্ব প্রথমেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কোটী ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত রাজ্যে তপনদেবের ন্যায় বা তাঁহা অপেক্ষা মহীয়ান কোটী কোটী জ্যোতিষ্ক বিদ্যমান থাকিলেও নৈকট্য নিবন্ধন, বাল্যকাল হইতেই তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া তিনি আমাদের চক্ষে মহান। শৈশবে 'দিদিমার' মুখে তাঁহার বৃদ্ধ সারথি পরিচালিত অষ্টাশ্ব যোজিত বিশাল স্যন্দনের কথা শ্রবণ করিয়াছি, পৌষের দারুণ শীতে সতৃষ্ণ নয়নে পূর্ব্ব গগনে তাঁহার উদয়ের প্রতীক্ষা করিয়াছি, কখনও বা তাঁহাকে মাতুল সম্বোধনে, কখনও বা তাঁহার অতি বৃদ্ধা মাতাকে উৎকোচ-প্রদান প্রলোভনে তাঁহার শীতাপহারক প্রখর কর-প্রার্থী হইয়াছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রকার-মুখে তাঁহার দেবত্বের কথা শুনিয়াছি, পৌরাণিক মুখে তাঁহার অমিত পরাক্রমশালী বিস্তৃত বংশের বিষয় অবগত হইয়াছি, আর সেই অনন্ত শক্তিমান মহান্ জ্যোতিষ্মানের চক্ষু স্বরূপ এই অমিত-তেজা জ্যোতিষ্ক-পুঙ্গবের অনুপম রূপে ও অপার শক্তি দর্শনে আত্মহারা হইয়া 'জবা-কুসুম সঙ্কাশং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভক্তিভরে শত সহস্র বার তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়াছি। এই

তপন দেব হইতেই জগতের উদ্ভব, তাঁহা ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব, সেইজন্য তিনি 'সবিতা' বা 'জগৎ প্রসবিতা'। সুতরাং জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের আলোচনা করা অসম্ভব। তাঁহার বিষয় যথাশক্তি আলোচনা করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মানব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যদেবকে বিভিন্ন চক্ষে দর্শন করিয়াছে, সে সমুদয়ের অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতিকালে বিজ্ঞান শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া সূর্য্যের ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা পৌত্তলিকতা মাত্র। সুতরাং আমিও বিজ্ঞানবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক-চক্ষে সূর্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা চর্ম্মচক্ষে সূর্য্যকে একখানি গোলাকার রৌপ্য থালার ন্যায় ক্ষুদ্র ও সমতল দেখিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড ও পৃথিবীর ন্যায় বর্ত্তুলাকার। যেমন কোন গোলকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে উহার এক অংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, অপর সমুদয় অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে, সেইরূপ আমরা সূর্য্যেরও অংশমাত্র দেখিতে পাই। প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যের আয়তন এত প্রকাণ্ড যে, উহার পরিমাণের বিষয় সম্যক ধারণা করা এক প্রকার অসম্ভব। বহু দিন পরে পুত্র-কন্যার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণেচ্ছু বা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর প্রণয়-সম্ভাষণ-লিপ্সু প্রবাসী পাঠক বোম্বে বা পঞ্জাব মেলের বেগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। "ছয় দণ্ডে ছয় দিনের পথ" অতিক্রম করিয়া সুদূর ব্যবধানস্থিত প্রিয়তম-পুত্রের সুখ-সংস্পর্শে আত্মহারা হইয়া বা প্রণয়িণীর সুকোমল বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া বাষ্পীয় শকটের ঐশশক্তি সম্পন্ন আবিষ্কারকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার দ্রুতগামী যানে আরোহণ করিয়া যদি একবার সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতে হয় তাহা হইলে দিবারাত্রির মধ্যে একবার বিশ্রাম না করিলেও দশ বৎসর লাগিবে! পৃথিবীর আয়তনকেই আমরা অতি প্রকাণ্ড বলিয়া জানি কিন্তু সূর্য্যকে দশ লক্ষ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগও পৃথিবী অপেক্ষা বড়! সূর্য্যের তাপ পরিমাণও আয়তনেরই অনুরূপ, বৈজ্ঞানিক রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে, কৃত্রিম উপায়ে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করিতে পারেন, তাহা সূর্য্যতাপের সামান্যাংশ মাত্র প্ল্যাটিনম,

নামক ধাতুখণ্ডে তাড়িৎপ্রবাহ চালিত করিলে উহা অত্যুত্তপ্ত ও অত্যুজ্জ্বল হইয়া দ্রব হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত যাবতীয় তাপের মধ্যে এই গলনশীল প্ল্যাটিনমের তাপ পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু সূর্য্যতাপের সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সূর্য্য এত প্রকাণ্ড হইলেও আমাদের চক্ষে এত ক্ষুদ্র কেন? সূর্য্যতাপ এত অধিক হইলেও আমরা তাহাতে ভস্মীভূত হই না কেন? পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বই ইহার কারণ। সূর্য্য আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই দূরত্ব নিবন্ধনই আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি, এই দূরত্ব নিবন্ধনেই সূর্য্যতাপের অতি সামান্যাংশ মাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছছে। কোন প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই আমরা উহার তাপ অধিক অনুভব করি এবং উহা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, উহার তাপও তত হ্রাস হয়, আমরা এই অসীম তাপরাশি হইতে ৯ কোটীরও অধিক মাইল দূরে অবস্থান করিতেছি বলিয়া সেই অনমুমেয় তাপের প্রভাব অনুভব করিতে পারি না। যদি কোন উপায়ে সূর্য্যের সন্নিহিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ভীষণ দাবানলে ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত বা বাষ্প-পুঞ্জ মাত্রে পরিণত হইতাম, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে উঠিব, ততই সূর্য্যের সন্নিহিত হইব, সুতরাং তাপ পরিমাণও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা ঘটে না। যাঁহারা কখন শৈলারোহণ করিয়াছেন, যাঁহারা কখন হিমাদ্রির উচ্চ-চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে আরোহণ করা যায়, তাপের পরিমাণ সেই পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। সাগরতল হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত দার্জ্জিলিংএ সমস্ত বর্ষব্যাপী ঘোর শীত, পৃথিবীস্থ যাবতীয় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ চিরনিহারাচ্ছন্ন। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে এই ব্যাপারটী তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা সূর্য্য হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে তাপ প্রাপ্ত হই, তাহার পরিমাণ এত অল্প যে, উক্ত তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইবার কোন উপায় না থাকিলে পৃথিবী চিরবরফাচ্ছন্ন হইয়া প্রাণীবাসের অযোগ্য হইত। কথাটা একটু বিশদরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রখর রবি-করোজ্জ্বল দিবা-

ভাগে কোন দেওয়াল শূন্য কাচনির্ম্মিত সাসী পরিবেষ্টিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে গৃহের মধ্যভাগ বহির্দ্দেশ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত বোধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, যে পরিমাণ তাপ কাচ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সে পরিমাণ তাপ আর বাহির হইতে পারে না, সুতরাং তথায় তাপ ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে। এইরূপে ক্ষুদ্র গৃহে অধিক পরিমাণে তাপ সঞ্চিত হওয়ায়, গৃহের অভ্যন্তরভাগ বহির্দ্দেশ অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়। পৃথিবীতল সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। যে পরিমাণ সূর্য্যতাপ বায়ুরাশি ভেদ করিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিয়া পেঁছিছে, সেই পরিমাণ তাপ আর বায়ুভেদ করিয়া শূন্য দেশে বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। ভূভাগ উক্ত তাপ গ্রহণ করিয়া উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে থাকে ও তন্নিকটবর্ত্তী বায়ুরাশিও উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ সংস্পর্শে উপরিস্থিত বায়ুরাশি অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়। এখানে বায়ু-রাশিকে কাচ নির্ম্মিত সাসী ও পৃথিবীপৃষ্ঠকে গৃহাভ্যন্তর বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। আমরা এই সাসীরূপী বায়ুভেদ করিয়া যতই উর্দ্ধে উঠিতে থাকিব, ততই অধিক শৈত্য অনুভব করিব। যদি কোন প্রকারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠে চিরহিমানী বিরাজ করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

"শশাঙ্ক কলঙ্কী" বলিয়া ভুবনবিখ্যাত। চন্দ্রের নিজের রূপ নাই—পরের রূপ লইয়া তাঁহার রূপ, সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণই তাঁহার মধুর রূপের মূলীভূত, তাই তিনি ধার করা রূপে আপন কলঙ্ক গোপনে অক্ষম। সেই জন্য আমরা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পল্লবিত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট 'কদম্ব বৃক্ষ':তলদেশে রজ্জুবদ্ধ "হরিণ শাবক" ও সকার্য্য তৎপরা অশীতি-পরা "বৃদ্ধার সূত্র নির্ম্মাণ" প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সূর্য্যের কলঙ্কের কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছাড়িবার পাত্র নহেন, যন্ত্রদৃষ্টিতে সূর্য্যের এই ভুবন আলোকরা রূপের মধ্যেও কলঙ্ক আবিষ্কার করিয়াছেন, দুরবীক্ষণ সাহায্যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যেও কৃষ্ণবর্ণ কিছু দেখি-য়াছেন। যিনি সূচাগ্রস্থিত রক্তবিন্দুতে দশ লক্ষ কীটাণুর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি যে সূর্য্যে কলঙ্ক দেখিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি! ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক দিয়াছেন, সুকোমল জনমনোহর কুসুম-কোরকে কীট দিয়াছেন, সূর্য্যও তাঁহার সৃষ্টি, সুতরাং সূর্য্য নিখুঁত হইবে কেন? ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নই সূর্য্যের কলঙ্ক। বিশ্বচক্ষুর চক্ষুরোগ বড়ই বিচিত্র

কথা! কিন্তু সূর্য্যের পক্ষে যাহা কলঙ্ক, বিজ্ঞানবিদের পক্ষে উহা অমূল্য কৃষ্ণমণি, কারণ ঐ সকল কৃষ্ণ চিহ্নের সাহায্যেই তিনি সূর্য্য সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা লেখকের সাধ্যাতীত, তবে এই চিহ্ন সম্বন্ধে যথাশক্তি দুই একটী কথা বলিয়া এ অংশের উপসংহার করিব।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যমধ্যস্থ এই সকল কৃষ্ণচিহ্নের মধ্যভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও চতুঃপ্রান্ত ঈষদুজ্জ্বল এবং এই সকল চিহ্ন একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না। পরন্তু কোন একটী চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, উহা সূর্য্যের একপ্রান্তে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ অপর প্রান্তে গমন করিয়া অন্তর্হিত হয় এবং এইরূপে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতে যে সময় লাগে, ঠিক সেই সময় পরিমিত সময় দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রান্তভাগে প্রকাশ পায়। স্থানভেদে ইহার আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রান্তদেশে প্রথম আবির্ভাব কালে ইহা রেখাকৃতি প্রতীয়মান হয়, ক্রমশঃ যত মধ্যে দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যের কেন্দ্র প্রদেশে অর্থাৎ দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখভাগে আসিলে পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এবং আবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অপর প্রান্তে অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ সমুদয় কৃষ্ণ চিহ্নের এইরূপ গতি একই দিকে এবং একই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্নের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না, কখন অধিক, কখন অল্প, কখনও বা একবারে কিছুই থাকে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সকল কৃষ্ণ চিহ্ন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত বস্তু বিশেষ মাত্র। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, এ মত সমীচীন নহে। অনেকে এই সমস্ত কৃষ্ণ চিহ্নকে সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ গভীর গহ্বর বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ফলতঃ এরূপ অনুমান করিলে বিষয়টী কিছু সহজ হইয়া যায়। সূর্য্যপৃষ্ঠ অত্যুজ্জ্বল হইলেও উহার অন্তর্দ্দেশ অন্ধকারময় হইতে পারে। কোন গভীর গহ্বরের পার্শ্বদেশ সমূহ আলোকময় করিলে দেখা যায়, উপরিস্থ আলোক গহ্বরে প্রবৃষ্ট হইয়া উহার চতুর্দ্দিকের কিয়দংশ কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করে, কিন্তু তলভাগ অন্ধকারময় থাকিয়া যায়। সেইরূপ সূর্য্যের উপরিভাগে কোন গর্ত্ত থাকিলে সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ আলোকরাশি উক্ত গহ্বরে প্রবৃষ্ট হইয়া চতু-

দিকের কিয়ৎ অংশ কথঞ্চিৎ উজ্জ্বল করিতে পারে, কিন্তু উহার তলভাগ অন্ধকারময় থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে।

মনে করুন এক প্রকাণ্ড ভুগোলকের উপরিভাগে বিষুবরেখার নিকটে একটী গর্ত্ত খনন করা আছে। যদি ঐ গোলকের সম্মুখে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্দ্ধাংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং অপরাংশ দৃষ্টির অগোচর থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তটী যদি আমোদের দৃষ্টির অগোচর থাকে ও গোলকটীকে নিয়মিত বেগে আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করান যায়, তাহা হইলে উক্ত গর্ত্ত দৃষ্টিসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশের প্রান্তভাগে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় অপরপ্রান্তে অন্তর্হিত হইবে এবং যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল, ঠিক ততক্ষণ দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া আবার পূর্ব্ববৎ দৃষ্টিপথে আসিবে। আরও দেখা যাইবে যে, গর্ত্তটী যখন প্রথম দৃষ্টিগোচরে আইসে, তখন আমরা উহার এক প্রান্ত মাত্র দেখিতে পাই, ক্রমশঃ যত সম্মুখবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহার অধিক হইতে অধিকতর অংশ দেখিতে পাই, এবং আমাদের ঠিক সম্মুখভাগে উহা পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় ও আবার অসম্পূর্ণ হইতে অসম্পূর্ণতর ভাবে দৃষ্ট হইয়া পরিশেষে অন্তর্হিত হয়। গোলকের যে অংশেই গর্ত্তটী থাকুক না কেন, ঠিক ঐরূপই ঘটিবে, একের অধিক গর্ত্ত থাকিলে বা কোন অংশে অধিক সংখ্যক ও কোন অংশে অল্প সংখ্যক থাকিলে ঐ গুলি পর্য্যায়ক্রমে আমাদের নয়নপথে আসিবে—আমরা কখন অধিক দেখিব কখন অল্প দেখিব। পূর্ব্বে বলা যাহা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ কৃষ্ণ চিহ্নগুলি সম্বন্ধেও প্রায়ই ঐরূপ ঘটে এবং সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় বর্ত্তুলাকার। এক্ষণে যদি কল্পনা করা যায় যে, সূর্য্যও পৃথিবীর ন্যায় আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, তাহা হইলে উহার উপরিস্থিত কৃষ্ণ-চিহ্নগুলির আবির্ভাব, গতি ও তিরোভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা আর কঠিন হয় না। যেমন কোন বেগে ঘূর্ণিত লাটিম হইতে দূরে দণ্ডায়মান হইলে উহা নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার উপরিভাগে কোন চিহ্ন থাকিলে সেটী গতিশীল প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আমরাও দূরত্ব নিবন্ধন সূর্য্যের আবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি না, কেবল উহার উপরিস্থ কৃষ্ণ চিহ্নগুলিকেই গতিবিশিষ্ট মনে করি। বস্তুতঃ চিহ্নগুলি সূর্য্যের অংশরূপে উহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া উহার সহিত আবর্ত্তন করে।

পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, সূর্য্যের বিষুবরেখার নিকটস্থ চিহ্নগুলি প্রায় ১৩ দিন দৃষ্টিগোচর থাকিয়া অদৃশ্য হয়। কিন্তু ৩০ অক্ষাংশ সন্নিহিত চিহ্নসমূহ তাহা অপেক্ষা প্রায় ১২ ঘণ্টা অধিক দৃষ্টিগোচর থাকে। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থ নহে; কারণ তাহা হইলে ঐরূপ সময়ের বিভিন্নতা অসম্ভব। ফলতঃ ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্য কঠিন বা তরল নহে, জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীআদ্যনাথ রায় বি, এ।

অমৃত তুসনিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রকট বিহার রূপে বিলাস জাহার।
তেহোর সফলা এই শাস্ত্রের বিচার॥
ইহো পুর্ন নহে কভুহএ পুর্নত্তর।
নহে কেনে গতায়াতে ফিরে নিরন্তর॥
কার্জ্যস্বভাবর্ত্তে লোকে কক্ষ স্থানে জনময়
এই মত পুর্নত্তর সর্ব্ব ক্ষণে বিলসয়॥
জেহো পুর্ন ভগবান তিহো পুরুরূপ।
স্থলেতে তাহার বিলাস গুণ অপরূপ॥
কার্জ্যাদি স্বরির এই স্থুল রূপ বলি।
এই দেহে যুণিত যুক্ত দুই করে কেলি॥
নিত্ত স্বরির যুণিত যুক্ত নিত্ত কৌসর হয়।
ইস্বর গোচর নহে সাস্তে কিবা কয়॥
আর কহি শুন সর্ব্ব সাস্ত্র মনুভব।
অপ্রাকৃত ধাম বৃন্দাবন কহে সব॥
প্রাকিত কাহারে বলি অপ্রাকিত যার।
সাস্তবেদ বহি মরে বলদ আকার॥
ষোল ক্রোস বৃন্দাবন সর্ব্ব সাস্তে জান।
বৈকুণ্ঠের পর হয় কহি এ কারণ॥

ক্রোসকে অঙ্গুলি বলি করিলা সিদ্ধান্ত।
গর্গবাক্য এই কথা জানিবে য়েকান্ত ॥
ইহার পরেতে জেই সেই নিত্যস্থান।
নিত্য লিলা তোথা করে স্বয়ং ভগবান ॥
দিগ মধ্যে সেই নিত্য কোন দিগ নয়।
সিদ্ধান্ত করিয়া বুঝ ইসান কুণ হয় ॥
বেদ বিধিয়গোচর সেই নিত্য ধাম।
কন্দপ্প মোহন স্থান য়তি অনুপাম ॥
স্বরসেতে রস হয় নিরসেতে রস।
সেই রসোদিপ্ত করে জগত করে বস ॥
দিবা নিসি নাহি তথা চন্দ্র সুর্য্যের গতি।
ক্রোটি থনি নিরাকার করি স্থানের হয় র্জুতি ॥
জদি কহ নিভিত কুঞ্জে স্থান বিলক্ষণ।
তোথা সেবা করে কেবা সেই কোন জন ॥
তাহার বিসেস কথা সুন এক মনে।
রূপবতি রস স্রেবা করে তিন জনে ॥
সেই নিত্য সির্দ্ধ সর্ব্বসক্তি ধরে।
অভিমত জানি ইহার মন হিত করে ॥
জথন জেমত রূপে মদন বিহরে।
সেই ভাবে তিণ জন পরিতোস করে ॥
জথন স্রিজিল স্রিষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ইশ্বর।
রাত্রি দিন নাহি ছিল ঘোর অন্ধকার ॥
তথন য়াছিল নির্ত্ত কেমন প্রকারে।
কেমনে য়াছিল মদন কহিবে য়ামারে ॥
কোন রূপে ছিলা তোমা সক্তি নিত্য স্বরি।
এই সব তত্ত্ব মোরে কহিবে বিচারি ॥
সুনহ একান্ত করি য়াগম বচন।
ইহাতে করহ সব সন্দেহ ভঞ্জন।
সুন ২ সর্ব্বজন হঞা একজন।
ইহার শ্রবণে সুদ্ধ সর্ত্ত হয় মন ॥

কহিলে ব্রহ্মাণ্ড জবে অন্ধকার ছিল।
কেবা তাহে আসি ঘোর সব দুর কৈল॥
সে সব সিদ্ধান্ত কথা সুণ এক মনে।
ঘুচিবে সংসার ফাস হবে তত্ত্ব জ্ঞানে॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত পঞ্চাসঃ সত ক্রোটি হয়।
তার মধ্যে চৌরাসিতে জিবের উদ্ভব নিশ্চয়।
সুনহ অপূর্ব্ব কথা বচন আমার॥
সোল ক্রোস খণ্ড ভিতর হয় সর্ব্বসার॥
তার মধ্যে ষষ্ট ক্রোস দেখ বিচারিঞা।
অষ্ট পদ্ম আছে তথা মুদিত হইঞা॥
তার উর্দ্ধে এক পদ্ম জ্যোতির্ম্ময় হয়।
তাহাতে মদন স্থির জানিহ নিশ্রয়॥
সেই পদ্ম বিকসিত হৈল জেই কালে।
অন্ধকার দুরে গেল দিপ্ত সর্ব্ব স্থলে॥
তথাহি গর্গ বাক্যঃ॥
আব্রহ্মঃ ব্রহ্ম লক্ষ জোজন্নিক্ত।
পরৎপরে উদিত ভানু ঘোর সর্ব্ব বিনাসিত॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরে সূর্য্য লক্ষ যোজন গুণি।
তোমা উদয় হঞা দিপ্ত করয়ে অবনি॥
এই মত পদ্ম জ্যুতি সুন সর্ব্বজন।
বিকসিত হঞা আলা করে ত্রিভুবন॥
পূর্ব্বে জে কহিলাম জত সব ফাকি জান।
ঘোর অন্ধকার কেবল মনের করণ॥
অজ্ঞান পাষণ্ড মায়া মুগ্ধ জত জন।
ঘোর অন্ধকারে তারা থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
জেমত কুলুর বলদ ফেরে চক্ষে নঞা ঠুসি।
পাকে পাকে ফিরে,সেহ গলে নঞা ফাঁসি॥
এইরূপে জিবের ফাঁসি কন্যা পুত্র গলে।
চক্ষ্যে ঠুলি দিল নারি নানা দিগে বুলে॥
এই সব জিবের দেখ ঘোর অন্ধকার।

সুর্য্যের কিরণে দিপ্ত না হয় তাহার ॥
আর কহি সুন প্রাণি হঞা একমন।
উদ্ধে কেনা দেখে জেন সুর্য্যের কিরণ ॥
এই সব জিব জিবের হয় অদিষ্ট নিত্য স্থান।
বিনা সাধু সঙ্গে ইহার নাহি হয় গ্গান।
তথাহিঃ ॥
সেবা সাধক রূপেন সিদ্ধরূপেন চাত্রি হি।
তদ্ভাব নিপ্সণা কার্য্যঃ ব্রজলোকানুসারদ ॥ ইতি ॥
ব্রজ জনের সাত্রিসি সাধু এক সঙ্গ ধরে।
এক স্বাত্মা এক প্রাণ ফিরয়ে সংসারে ॥
সহজ ভাবেতে তেহো সহজ মানুষ হঞা।
ভ্রমণ করয়ে খেতি তলে বিলসিঞা ॥
তাহার করহ সেবা আত্ম সমর্প্পণ।
তবে খোর অন্ধকার হইবে মোচন ॥
তবে নিত্য দেখিতে পাবে নিকুঞ্জ ভুবন।
তবে জ্যোতির্ম্ময় সেই করিবে দরসন।
গোপি ভাবগ্রাহি হঞা সাধে সেই কর্ম্ম।
সেই জন চাহিবে ব্রেজে যুনে যার মর্ম্ম ॥
লিলা নির্ত্ত দুই গোপি ক্ষম তাহা বলি।
অন্তর বাহ্ দুই ইসত বুঝহ সকলি।
লিলাকারি গোপি সেবি লিলা সুখ রসে।
নিত্য গোপি লিঙ্গ পুজি নিত্য রস সোষে ॥
নিস্পন্না সাধকে ভাব এই কার্য্য মত।
নির্গুন নিষ্কামি হঞা সুখ ভুঞ্জে কত ॥
অস্যার্থ ॥ তথাহি ॥ লিঙ্গপুরাণে অস্র না ॥
জোতির্লিঙ্গ কাম্যলিঙ্গ দিব্ব্য লিঙ্গ ব্রহ্ম
কৈলাস দিষ্ট বাসুদেবঃ দিব্ব্য রতন মুনি ॥
অনাদি অনন্তঃ মধ্য পরিবেদ ভেদঃ বর্ণ্নঃ
শ্রীহৃৎ লিঙ্গ পুর্ন্ন ব্রহ্ম সক্তি আদ্যা সেবনঃ ॥ ইতি ॥
এই মত নিত্য গোপি লিঙ্গ আরাধিঞা।

জ্যোতির্ম্ময় নিকট জায় বসে মিসাইঞা॥
আর কহি ভগবাণের অপার মহিমা।
ভব বিরিঞ্চিত জার নাহি পায় সিমা॥
ভগের নিকটে নিত্য আইসে য়ার জায়।
তব স্তুতি করি বলে তুমি সর্ব্বময়॥
ভবভয় ভঞ্জন তুমি জগত ইশ্বরি।
কি জানি তোমার অন্ত কি বলিতে পারি॥
সত্য গুণে বিষ্ণু ভজে রজগুণে ব্রহ্মা।
তমগুণে ভজি হর না পাইল সিমা॥
তমাতে প্রলয় হয় তোমাতে জিবন।
এত কহি ভগ পূজা করে ভগবান॥
তথাহি॥
ত্রিকুণ মণ্ডলাকারঃ ব্যাপ্ত লোক চরাচরঃ
তৎরূপ দর্সন সর্ব্ব শ্রজ´ নিত্য বিলাসনঃ॥ ইতি॥
তোমার দর্শনে স্থির নারে হৈতে নরে।
পর্ষ´ করি সেই জন জায় ক্ষম ঘরে॥
তোমার যন্দর্য্যরূপ বিদ্যুত য়াকার।
চক্রে আশ্ছাদন আছে বাহিরে চর্ম্মাকার॥
তথাহি॥ জাদ্রিসি ভাবনাশ্চৈবঃ তাদ্রিসি প্রাপ্তি সংভ্বঃ
জগত বঞ্চণা হেতু তোমার এই কায়।
জিবের নাহিক সক্তি স্থির হবে তায়॥
তুমি তো জগতের মাতা পুন জে রমণি।
এ কথা নাহিক জানি দেব সিরোমণি॥
মোহিনি হঞা তুমি মহিলে তিনলোকে।
অগ্নি সিখা দেখি জেন পুড়ে ক্ষুদ্র পোঁকে॥
যথা রাগ॥
অগ্নি জৈছে নিজধামঃ দেখাইঞা অভিরামঃ
পতঙ্গেরে আকর্ষিঞা মারেঃ।
ঐ হে তব নিজগুণঃ দেখাইঞা হরো মনঃ
পাছে দুখ ভবকুপে ভারে॥ ইতি॥

এ সব তোমার লিলা জানে মহেশ্বর।
জোগেতে জানিঞা গলে করে' নিল হার॥
কথন অধরে ধরি করে রস পান।
কখন মস্তকে করি করে জপ ধ্যান॥
কখন গলায় দেয় আনন্দিত হঞা।
লোমাঞ্চ পুলক কম্প সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিঞা॥
তদপরে রাখে বুকে সেই পঞ্চানন।
উষ্টে ধরি করে জুড়ায় রস আস্বাদন॥
সেই সদা সিব তোমার বিষ পান করি।
নিত্য মধ্যে বৈসে এবে লিঙ্গরূপ ধরি॥
নিত্যের ঐসানে স্থিতি জোনি পদ্মের মধ্য স্থানে॥
ছুয়ার উপরে স্থিতি কটিকা আক্ষ্যাণে॥
সেই সম রস অমৃত ফেলি নাম।
চুসিতে চুসিতে সেই পায় নিত্য ধাম॥
বিকসিকা পদ্মে জৈছে ভ্রমর পসি রয়।
সেই মত মুর জুহ্বা স্থিত গতি তায়॥
এত কহি বর্ন বাস করিল থদন।
স্তব স্তুতি করে য়ার করে দরসন॥
তবে সক্তি দেখি ভক্তি নির্ব্ত অভিলাস।
অনুগত দেখি পদ্ম করিলা প্রকাস॥
সর্ব্ব জ্যোতি ধরে পদ্ম রত্ন ক্রোটি জিনি।
অমৃত পুরিঞা জৈছে রসের ছাহনি॥
তাহা দেখি পুর্ন ব্রহ্ম লিলা সুখ রসে।
পুর্ন দিষ্টি রস দুরে জায়ঃ আর য়াইসে॥
কৃতাঞ্জলি করি কহে যুন রসকারি।
দয়া করি নিজ দাসে কর সহচারি॥
তোমার বিলাস সখি এই তিন জন।
রূপ রস রতি মোরে করুক আকর্ষণ॥
জেরূপে ত্রৈলক্ষ ভুলাইঞা কৈলে ক্ষেপা।
সেইরূপ ধরি এবে য়ামারে দেখাইবা॥

গোলক পর ব্যোমে জেহি নাহি দেখি যুনি।
কৃপা করি এবে তাহা দেখাইবা আপনি ॥
কাম গাত্রি কাম বিজ বিধি নাহি জানে।
রতি রসে প্রকাশিলা নিত্য বৃন্দাবনে ॥
রতিতে বিজের জন্ম রসে গাত্রি বলি।
মুর উপাসনা তাহা দেখাইলা সকলি ॥
দস ইন্দ্র ছয় রিপু আর পঞ্চ জন।
তাহা দেখি স্তব্ধ থকিত হয় সর্ব্বক্ষণ ॥
এত কহি নিত্য স্বর আর দলে জায়।
কারণ্য দলেতে জাঞা দাণ্ডাইঞা কয় ॥
তুমি ব্রহ্ম সনাতনিঃ   সকল পুরাণে কুনিঃ
তুমি সর্ব্ব বেদ বিধি সার।
তুমার অংসের রংসে   ব্রহ্মা বিষ্ণু অবতংসে
তিতিয়ে সিবের জন্ম যার ॥
সেই তিন পদ্ম এবে আমারে দেখাইবা।
তবে সেত বর্ণ নিল রক্ত জে উৎপল।
জোনি উদ্দ নাভি য়ধ করে ঝলমল ॥

ক্রমশঃ।

ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ।

কেহ কেহ মনে করেন, জীব ঈশ্বরের অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অপর কেহ কেহ বলেন, জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ। প্রথমোক্ত মতে সূর্য্যকিরণের সহিত সূর্য্যের যে প্রকার অংশাংশিভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশিভাব। সুতরাং জীবও ঈশ্বরের মত নিত্য বস্তু। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয় এবং জীব তন্নিঃসৃত অংশুস্থানীয়। দ্বিতীয় মতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবও ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। অন্যে বলেন, প্রলয় ও মোক্ষকাল উপস্থিত হইলে জীব ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। এইরূপ মুক্তিকেই